মাসুদ রানা





কাজী আনোয়ার হোসেন

রক্তের রঙ

দুইখণ্ড একত্রে

মাসুদ রানা

রক্তের রঙ

[দুইখণ্ড একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেন

ভারত-বাংলাদেশ-বর্মা সীমান্তের কাছাকাছি
কোথাও জটিল এক ষড়যন্ত্রের আভাস পেয়েছেন
মেজর জেনারেল রাহাত খান। তবে কি 'মুসলিম
বাংলা' সংক্রান্ত গুজবের মধ্যে কিছু সত্যতা আছে?

বিশাল সমুদ্রের বুকে চিনেবাদামের খোসার মত
একটা ছোট্ট ইয়টে করে পাড়ি দিল
রানা দীর্ঘ নয়শো মাইল। গন্তব্য—ইয়ান গন।

প্রাচ্যের দুর্ধর্ষতম দস্যু উ সেন মারা যায়নি প্লেন-ক্র্যাশে।
বাংলাদেশের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলার
এক ভয়ঙ্কর চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে সে।
রানা চলেছে ছদ্ম-পরিচয়ে তারই দলে যোগ দিতে।

কিভাবে বানচাল করবে রানা এই ষড়যন্ত্র? আট হাজার
ট্রেইন্‌ড্ গেরিলার তুলনায় রানার শক্তি ও সামর্থ্য কতটুকু?



সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রূম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ISBN 984 16 7029-1

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ. ১৯৯৯

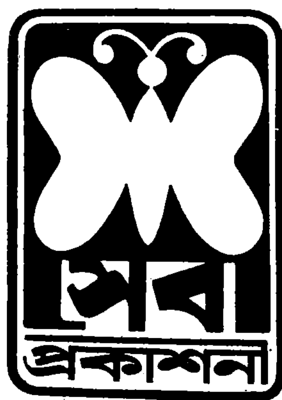
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: আলীম আজিজ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রূম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০



আটাশ টাকা

Masud Rana
ROKTER RONG
[Part I & II]
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain



এক নজরে মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় *ভারতনাট্যম *স্বর্ণমৃগ *দুঃসাহসিক* মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা*দুর্গম দুর্গ শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ *রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র*মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন মৃত্যুর ঠিকানা *ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত *এখনও ষড়যন্ত্র *প্রমাণ কই? বিপদজনক*রক্তের রঙ*অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ *বিদেশী গুপ্তচর *ব্ল্যাক স্পাইডার গুপ্তহত্যা*তিনশত্রু *অকস্মাৎ সীমান্ত *সতর্ক শয়তান *নীলছবি *প্রবেশ নিষেধ পাগল বৈজ্ঞানিক *এসপিওনাজ*লাল পাহাড় *হৃৎকম্পন *প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট কুউউ*বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস*স্বর্ণতরী*পপি*জিপসী*আমিই রানা। সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা *হাইজ্যাক * আই লাভ ইউ, ম্যান * সাগর কন্যা পালাবে কোথায় *টার্গেট নাইন * বিষ নিঃশ্বাস *প্রেতাত্মা *বন্দী গগল *জিম্মি তুষার যাত্রা *স্বর্ণ সংকট *সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার *স্বর্গরাজ্য উদ্ধার *হামলা* প্রতিশোধ*মেজর রাহাত *লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা বেনামী বন্দর *নকল রানা *রিপোর্টার *মরুযাত্রা *বন্ধু *সংকেত*স্পর্ধা *চ্যালেঞ্জ শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণ কামড়*মরণ খেলা অপহরণ*আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস *ছদ্মবেশী *কালপ্রিট মৃত্যু আলিঙ্গন *সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন *বুমেরাং *কে কেন কিভাবে মুক্ত বিহঙ্গ *কুচক্র *চাই সাম্রাজ্য *অনুপ্রবেশ *যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী *কালো টাকা কোকেন সম্রাট *বিষকন্যা *সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার *অপারেশন চিতা আক্রমণ '৮৯ *অশান্ত সাগর *শ্বাপদ সংকুল* দংশন*প্রলয় সঙ্কেত *ব্ল্যাক ম্যাজিক তিক্ত অবকাশ *ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা *অগ্নিশপথ *জাপানী ফ্যানাটিক সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক *নরপিশাচ *শত্রুবিভীষণ*অন্ধ শিকারী *দুই নম্বর কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া *নকল বিজ্ঞানী*বড় ক্ষুধা*স্বর্ণদ্বীপ*রক্তপিপাসা *অপচ্ছায়া ব্যর্থ মিশন *নীল দংশন *সাউদিয়া ১০৩ *কালপুরু *নীল বজ্র *মৃত্যুর প্রতিনিধি কালকূট *অমানিশা*সবাই চলে গেছে *অনন্ত যাত্রা *রক্তচোষা *কালো ফাইল মাফিয়া*হীরকসম্রাট*সাত রাজার ধন*শেষ চাল* বিগব্যাঙ*অপারেশন বসনিয়া টার্গেট বাংলাদেশ *মহাপ্রলয় *যুদ্ধবাজ* প্রিন্সেস হিয়া*মৃত্যুফাঁদ*শয়তানের ঘাঁটি *ধ্বংসের নকশা *মায়ান ট্রেজার *ঝড়ের পূর্বাভাস*আক্রান্ত দূতাবাস*জন্মভূমি দুর্গম গিরি *মরণযাত্রা *মাদকচক্র।

রক্তের রঙ-১

প্রথম প্রকাশ : মার্চ ১৯৭৩

এক

জলকল্লোল।

সাঁঝ হয়ে আসছে।

একা।

ডেকে বসে নিজের একাকীত্বকে অদ্ভুত নিবিড়ভাবে অনুভব করছে রানা। সূর্যাস্ত দেখে সবসময় কেমন যেন বিষাদে ছেয়ে যায় ওর মন। একা থাকলে আরও। একটা দিন খসে গেল রানার জীবন থেকে—আরও একটা দিন। বড় অসহায়, ক্ষুদ্র মনে হয় নিজেকে। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বিশাল বিপুল আয়োজনের মধ্যে ওর স্থান কোথায়, মূল্যই বা কি? অথচ নিজেকে কত বড় করে দেখতে ভালবাসে মানুষ। সব অর্থহীন, সব ঝুটা।

ছোট্ট অ্যালিসক্যাফোর (ইয়ট) অ্যালুমিনিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম অ্যালয়ের তৈরি খোলের গায়ে মৃদু চাপড় দিচ্ছে বঙ্গোপসাগরের ঢেউ—কুল কুল ছলাৎ।

স্পীড বাইশ নট।

বিকেল থেকে সামান্য হাওয়া দিয়েছে উত্তর-পশ্চিম থেকে। সামান্য হাওয়াতেই চারফুটি ঢেউয়ের মাথায় সাদা ফেনা উঠে গেছে। রাতে ফসফরাসের আলো জ্বলবে সারা সমুদ্র জুড়ে। বেশ লাগবে দেখতে।

রোল করছে ইয়টটা—ভালই লাগছে রানার। আলস্য আসছে দোল দোল দুলুনিতে।

টুইন ব্রাউন-বেভারি টার্বো সুপারচার্জার ফিট করা ফোরস্ট্রোক ডেইমলার বেঞ্জ ডিজেল ইঞ্জিনের মৃদু-গম্ভীর গর্জন, ঢেউয়ের ছল-ছলাৎ অবিরাম কলধ্বনি। আর সব চুপ। আশপাশে দুশো মাইলের মধ্যে একটি জনমানুষ নেই। একা।

বিশাল সমুদ্রের বুকে রানা একা। চারদিকে যতদূর চোখ যায়, শুধু জল। সামুদ্রিক সোঁদা গন্ধ। ঢেউ। দূর সমুদ্রে হালকা কুয়াশার আভাস।

শীত শীত করছে ঠাণ্ডা হাওয়ায়। জ্যাকেটটা গায়ে জড়িয়ে নিল রানা।

হাওয়াটা বাড়বে নাকি আবার? আকাশের দিকে চাইল রানা। বোঝা যাচ্ছে না ঠিক। অবশ্য ভয়ের কিছুই নেই। লিওপোল্ড রডরিক্সের তৈরি ইয়ট ডোবেনি আজ পর্যন্ত—তা সে যত বড় ঝড়ই উঠুক। তাছাড়া 'ব্যালাস্ট'-এর কাজ করবে ইয়টের হোল্ডে ঠাসা কয়েক টন অস্ত্রশস্ত্র আর গোলা বারুদের বাক্স। তাছাড়া বাংকারভর্তি আছে ডিজেল—চিন্তা কি?

ব্ল্যাক ডগের বোতল থেকে আরও দু'আউন্স তরল পদার্থ ঢালল রানা গ্লাসে। বরফ তুলে নিল কয়েক টুকরো। মনে মনে ধন্যবাদ দিল সোহেলকে। শালা ভোলেনি। এত অল্প সময়ে সবকিছু জোগাড়-যন্ত্র ব্যবস্থা করতেই জান বেরিয়ে যাবার কথা, এরই মধ্যে এক বোতল ব্ল্যাক ডগ ম্যানেজ করে দিয়েছে ও বুদ্ধি করে। এটা ছাড়া মুশকিলই হয়ে যেত রানার সময় কাটানো। অদ্ভুত নিঃসঙ্গ বোধ করছে সে, দম আটকে আসতে চাইছে থেকে থেকে। একেবারে একা।

অবশ্য সত্যিকার অর্থে একা ঠিক বলা যায় না। এক আশ্চর্য সঙ্গী জুটে গেছে ওর সাথে খুলনা থেকে শ'দুয়েক মাইল দক্ষিণে আসতেই। অ্যালব্যাট্রস পাখি একটা। পাখি না বলে আসলে উড়োজাহাজ বলা উচিত। একটা অস্টার প্লেনের সমান ওটার পাখার বিস্তার—কমপক্ষে ষোলো সতেরো ফিট। প্রকাণ্ড।

পৃথিবীর বৃহত্তম সামুদ্রিক পাখি এই অ্যালব্যাট্রস। সাদা গায়ে ঢেউ খেলানো খয়েরি দাগ, ডানা দুটো গাঢ় খয়েরি, পা দুটো হাঁসের পায়ের মত। সেই সকাল থেকে পিছু নিয়েছে, গ্লাইডারের মত নিঃশব্দে উড়ে চলেছে প্রকাণ্ড পাখিটা ইয়টের সাথে সাথে। ডানা ঝাপটানো নেই, শুধু পাখাদুটো মেলে দিয়ে ভেসে রয়েছে শূন্যে। মাঝে মাঝে ঝুপ করে ডাইভ দিয়ে নামছে সাগরজলে, এঁকেবেঁকে ছটফট করছে ওর ছুঁচোল ঠোঁটে ধরা সামুদ্রিক মাছ। খাওয়া সেরে ম্যালার্ডের মত পা টেনে টেনে খানিক সাঁতার কাটছে, ডিগবাজি খাচ্ছে, আবার উঠছে আকাশে।

ওঠাটা বড় অদ্ভুত। দুই ডানা মেলে ধরে পানির উপর থপ থপ পা ফেলে দৌড়ে চলে যাচ্ছে সত্তর আশি গজ, পা গুটিয়ে নিয়ে ভেসে পড়ছে বাতাসে, বারকয়েক পাক খেয়ে আকাশে উঠছে, তারপর আবার নিঃশব্দে অনুসরণ করছে ইয়টটাকে। বেশ ভাব হয়ে গেছে রানার সাথে।

শুনেছে রানা, একবারও পানিতে না নেমে শত শত মাইল উড়তে পারে এই পাখি জাহাজের পিছু পিছু। মারতে নেই, অমঙ্গল হয়। অ্যালব্যাট্রস নাকি সৌভাগ্যের প্রতীক। কথাটা সত্যি হলেই ভাল। সৌভাগ্যের প্রতিটা বিন্দু প্রয়োজন পড়বে এবার ওর সফল হতে হলে।

সূর্যটা অনেকক্ষণ আগেই ডুবে গেছে সমুদ্রে। এবার লাল আভাটাও মুছে যাচ্ছে দ্রুত আকাশ থেকে। সাদা মেঘের গায়ের রঙগুলো কালচে হয়ে এসেছে। সন্ধ্যা নামছে বঙ্গোপসাগরে নিঃশব্দ পায়ে।

নেভিগেশন লাইট জ্বেলে দিল রানা। পোর্ট সাইড, অর্থাৎ সামনের বামদিকে লাল আলো; আর স্টারবোর্ড সাইড, অর্থাৎ সামনের ডানদিকে সবুজ আলো; আর মাস্তুলের মাথায় সাদা আলো। কম্পাস দেখে কোর্সটা সামান্য একটু পরিবর্তন করে দিয়ে আবার এসে বসল ডেক চেয়ারে। আকাশে জ্বলে উঠেছে অসংখ্য তারা। একাদশীর ম্লান চাঁদটা উজ্জ্বলতর হচ্ছে ক্রমেই। সিগারেট ধরাল রানা। সমুদ্রের নীল জলরাশি এখন পেলিক্যান জেট ব্ল্যাক কালির মত দেখাচ্ছে।

আবছা আঁধার কেটে সমান গতিতে এগিয়ে চলেছে তিরিশ ফুট লম্বা অ্যালিসক্যাফো। ঢাকার কর্মচাঞ্চল্য থেকে ঘণ্টায় পঁচিশ মাইল বেগে দূরে সরে যাচ্ছে রানা গত আঠারো ঘণ্টা ধরে। ঠিক একই বেগে এগিয়ে যাচ্ছে সে কোন্ বিপদের মুখে কে জানে! মাঝপথে ও এখন। আরও আঠারো ঘণ্টা–তারপর 'ইয়ানগন'। ১৭৫৩ সালে ব্রহ্মদেশের রাজা আলোম্প্রার তৈরি তাঁর সাধের রাজধানী, ইয়ানগন। মানে, রেঙ্গুন।

হ্যাঁ, রেঙ্গুন। বিশ্ববিখ্যাত রহস্যময়ী বন্দরনগরী, রেঙ্গুন। বার্মার রাজধানী, প্যাগোড়া নগরী রেঙ্গুন। এককালের ভয়ঙ্কর দস্যু উ-সেনের প্রধান ঘাঁটি, রেঙ্গুন।

মেজর জেনারেল রাহাত খানের ধারণা ওখানেই জমে উঠেছে বাংলাদেশের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলার জন্যে এক বিচিত্র নাটক। এ নাটকের মাঝখানেই যবনিকা টানতে হবে রানাকে। একা। যে করে হোক ধ্বংস করে দিতে হবে এই আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র। কিন্তু কি করে? জবাব দিতে পারেননি মেজর জেনারেল, বলেছেন, সে আমি জানি না।

মুচকি হাসল রানা। ওর ওপর অগাধ বিশ্বাস বুড়োর। কিন্তু এবার আদেশ দিতে গিয়ে কেঁপে গিয়েছিল বুড়োর কণ্ঠস্বর। ভাঙন ধরেছে বুড়োর আত্মবিশ্বাসে। কাঁচা-পাকা ভুরু জোড়ার নিচে শান দেয়া ছুরির মত চকচকে চোখ দুটোতে উদ্বেগ আর আশঙ্কার ছায়া দেখতে পেয়েছে রানা। ঘাবড়ে গেছে আসলে বুড়ো।

গতকাল বিকেল চারটে পর্যন্ত কিছুই জানত না রানা। বি.সি.আই-এর ছায়াও মাড়ায়নি সে কয়েকমাস। দিব্যি আছে নিজের গোয়েন্দাগিরি নিয়ে। একটার পর একটা কেস সমাধান করে চলেছে দ্রুতবেগে। বেশির ভাগই সহজ সব কেস। ওগুলোর মোটামুটি একটা ছক তৈরি করে কাজের ভার চাপিয়ে দেয় সে সালমা আর গিলটি মিঞার উপর–ওরাই করে। দু'একটা জটিল আর বিপজ্জনক কেস হাতে এলে একটু তাজা হয়ে ওঠে রানা, উৎসাহ নিয়ে কাজ করে। ক'দিন বেশ আনন্দেই কাটে, তারপর আবার যে কে সেই, কুঁড়ের বাদশা। সপ্তাহে তিনদিনের বেশি অফিসেই যায় না সে। কোনরকম বিজ্ঞাপন নেই, খরিদ্দার আকর্ষণের চেষ্টা তদবির নেই, চুপচাপ। কিন্তু ইদানীং মুখে মুখে নাম ছড়িয়ে পড়ায় একটু অসুবিধা হয়ে গেছে ওর–ফি-এর পরিমাণ দ্বিগুণ করে দিয়েও মক্কেল ঠেকাতে পারছে না।

এইটাই রানার কাভার। মেজর জেনারেলের আদেশ, এভাবেই প্রতীক্ষা করতে হবে ওকে আগামী অ্যাসাইনমেন্টের জন্যে, আনুষ্ঠানিকভাবে বি.সি. আই-এ অফিস করা চলবে না।

'তুমি নিজের ব্যবসা নিয়েই যেমন ছিলে তেমনি থাকো। যখন দরকার হবে ডাকব আমি। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের সাথে বাহ্যত কোন সংস্রব থাকবে না তোমার কিন্তু মাসে মাসে বেতন ঠিকই জমা হয়ে যাবে

তোমার অ্যাকাউন্টে। তুমি, আমি আর সোহেল ছাড়া কেউ জানবে না আসল কথা। সবাই জানুক, চাকরি ছেড়ে দিয়েছ তুমি।'

ঠিক আছে। 'রানা এজেন্সি–প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটার্স' টিকে গেল। ভালই লাগে রানার। কত বিচিত্র সব সমস্যা নিয়ে আসে মানুষ ওর কাছে, মানুষের মনের কত গোপন গভীর রহস্যের উন্মোচন হচ্ছে ওর চোখের সামনে–কত ব্যাকুলতা, লোভ, ক্রোধ, নীচতা, পাপ, মোহ, প্রেম। এমনভাবে, এত কাছে থেকে মানুষকে জানবার সুযোগ পায়নি সে কখনও আগে। কিন্তু মাঝে মাঝে অস্থির হয়ে ওঠে ওর মনটা। ভয়ঙ্করের সুহৃদ সে। বিপদ আর মৃত্যুর হাতছানি ছাড়া হাঁপিয়ে ওঠে ওর রোমাঞ্চপ্রিয় মন।

হঠাৎ ফোন এল সোহেলের। আবাল্য-বন্ধু প্রিয়তম মাসুদ রানাকে অনেকদিন না দেখে কলজেটা ফেটে যাবার উপক্রম হয়েছে, আগামী আধঘণ্টার মধ্যে দেখা না পেলে ফেটেই যাবে। গোটা কয়েক সদ্য উদ্ভাবিত গালি দিয়ে নামিয়ে রাখল রানা রিসিভার। চলল রানা।

সোহেলের কামরায় ঢুকতেই আপনা আপনি বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা। ক্লিক্ করে শব্দ হলো।

'শালা ভোম্ভোট, রটনটট–কাবলিসি করার জায়গা পাও না!' একটা চেয়ার টেনে বসতে যাচ্ছিল রানা। বাধা দিল সোহেল।

'এখানে না, দোস্ত। ব্যাপারেশন ক্যাটাভ্যারাস। খোদ বুড়ঢা মিঞা...' বাম পাশের দেয়ালের দিকে ইঙ্গিত করল সোহেল।

রানা দেখল, দেয়াল-আলমারির দরজা দুটো খুলে গেছে। ওটা পাশের ঘরের দরজা।

কাগজপত্র থেকে চোখ তুলে একবার ভুরু কুঁচকে রানাকে আপাদমস্তক দেখলেন মেজর জেনারেল, তারপর দাঁতে চেপে ধরা পাইপটা হাতে নিয়ে আবছা ইঙ্গিত করলেন বসবার জন্যে। বসে পড়ল রানা। পাঁচ মিনিট চুপচাপ। নিবিষ্টমনে একটা ফাইলে কি যেন দেখছেন বৃদ্ধ, মাঝে মাঝে পাতা ওল্টাচ্ছেন। মনে হচ্ছে ভুলেই গেছেন রানার কথা।

ঘরটার চারপাশে দৃষ্টি বোলাল রানা। সেই পরিচিত পরিবেশ ফিরে এসেছে আবার। ইলেকট্রনিক দেয়াল ঘড়িতে বাজছে সাড়ে চারটা। সাউন্ড-প্রুফ ঘরটায় পিন-পতন স্তব্ধতা। কাঁচের জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে নীল আকাশে ঘুরে ঘুরে উড়ছে কয়েকটা চিল। পড়ন্ত বিকেলের রোদ পড়েছে পুরু কার্পেটের উপর। জানালার কাঁচে প্রতিফলিত হয়ে এক চিলতে রোদ রঙধনু সৃষ্টি করেছে দেয়ালের গায়ে। সময় যেন থমকে দাঁড়িয়ে গেছে এই ঘরে–ঘড়িটা মিথ্যা।

মেজর জেনারেল বসে আছেন সেই পিঠ-উঁচু রিভলভিং চেয়ারটায়। নীল সার্জের স্যুট, সাদা শার্ট, ব্রিটিশ কায়দায় বাঁধা লাল রঙের দামী টাই। বেশ ছোকরা ছোকরা লাগছে প্রায় তিন কুড়ি বছর বয়সের ঋজু রাশভারী চিরকুমার বৃদ্ধকে। ওঁর ঠিক পেছনেই সারা দেয়াল জুড়ে একটা ম্যাপ। একেকটা

বোতাম টিপলে একেক দেশের ম্যাপ ভেসে ওঠে এই দেয়ালের গায়ে।

আজকের ম্যাপটা গোলমেলে। তিনটে দেশের ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার দেখা যাচ্ছে, কিন্তু জায়গাটা ঠিক চেনা যাচ্ছে না। অসংখ্য শুঁয়োপোকা দেখে বোঝা যাচ্ছে, পার্বত্য এলাকা। নিজের অজান্তেই ছড়ানো ছিটানো নামগুলো পড়তে শুরু করল রানা। হাকা, গাংগাও, পলেতোয়া, ফালাম, টাও, মলাইক, উইটুং, শেরমুন, মালিয়ানপুই, রোনিপারা, লইংকল্যাংপারা, চিন হিল্‌স্‌, মাউন্ট ভিক্টোরিয়া, লুসাই হিল্‌স্‌, মিজো হিল্‌স্‌··· থমকে গেল রানার চোখ। পরিষ্কার বুঝতে পারল, চট্টগ্রাম, আসাম ও বার্মার অংশবিশেষ দেখতে পাচ্ছে সে দেয়ালের গায়ে। দ্রুততর হলো রানার চিন্তা। দৃষ্টিটা ফিরে এল বৃদ্ধের মুখে। নিবিষ্টমনে ফাইল ঘাঁটছেন তিনি। হঠাৎ চোখ তুললেন।

'কেমন আছ, রানা?'

'ভাল, স্যার।'

'গোয়েন্দাগিরি চলছে কেমন? খুব ব্যস্ত?'

'না, স্যার। ব্যবসা ভালই চলছে, কিন্তু ব্যস্ততা নেই। জটিল কেস না পেলে সময় কাটতেই চায় না। হাঁপিয়ে উঠেছি।'

'তাই নাকি? তাহলে কিছুদিন ঘুরে এসো রেঙ্গুন থেকে।'

চট করে ম্যাপের উপর ঘুরে এল একবার রানার দৃষ্টিটা। মৃদু হাসলেন মেজর জেনারেল রানার চিন্তার গতি বুঝতে পেরে।

'ওটা হচ্ছে ঘটনাস্থল। কিন্তু চাবিকাঠি রয়েছে রেঙ্গুনে। আজ রাত বারোটায় রওনা হচ্ছ তুমি।'

রানার চোখে প্রশ্নবোধক দৃষ্টি দেখে আবার কথা বললেন মেজর জেনারেল।

'হ্যাঁ। খুলে বলছি। তার আগে বলো দেখি "মুসলিম বাংলা" সম্পর্কে তোমার কি ধারণা?'

'ভাল করে ভেবে দেখিনি, স্যার। বাজারে জোর গুজব···'

'গুজব? এটাকে গুজব বলে মনে করো তুমি, রানা?'

একটু থমকে গেল রানা কথাটা শুনে। বলল, 'রেডিয়োর নব ঘুরিয়েছি অনেক, কিন্তু ওই নামের কোন বেতারকেন্দ্র খুঁজে পাইনি, স্যার।' 'মুসলিম বাংলা'র প্রসঙ্গ তোলায় সত্যিই অবাক হয়েছে রানা। বলল, 'যাই হোক, আমার ধারণা, ব্যাপারটার মধ্যে কিছু সত্যতা যদি থেকেও থাকে, অনেক বেশি অতিরঞ্জিত হয়েছে লোকের মুখে মুখে।'

'তাই হলেই ভাল।' মাথা নাড়লেন মেজর জেনারেল। 'কিন্তু আমি এর মধ্যে অশুভ ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছি। দু'একটা নমুনা ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। দ্রব্যমূল্য হু হু করে বাড়ছে, সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করছে পাকিস্তান, ভুট্টোর মুখে ঘন ঘন শোনা যাচ্ছে 'মুসলিম বাংলা'র কথা, কে বা কারা জ্বালিয়ে দিচ্ছে আমাদের পাটের গুদাম, চিঠিতে হুমকি আসছে দেশপ্রেমিক নেতাদের কাছে, লুট হয়ে যাচ্ছে একটার পর একটা ব্যাংক···আমার মনে হয় এসবই কোন ভয়ঙ্কর আঘাতের প্রাথমিক নমুনা মাত্র। খুব শিগ্‌গির যদি ভয়ানক গোলমাল

বেধে যায়, আমি অবাক হব না। আমার ধারণা, প্রায় প্রস্তুত হয়ে গেছে 'মুসলিম বাংলা গেরিলা ফৌজ'।'

'কিন্তু স্যার, ব্যাপারটা শুধু অসম্ভব নয়, উদ্ভট ঠেকছে আমার কাছে। গেরিলা যুদ্ধ চালাতে হলে গণ-সমর্থন চাই। যে-কোন দেশের গেরিলার সবচেয়ে বড় ডিফেন্স হচ্ছে জনসাধারণ। প্রয়োজন হলেই মিশে যেতে পারে, নিরাপদ আশ্রয় পায় ওরা জনসাধারণের কাছে। এই একটি মাত্র কারণে ক্ষ্যাপা কুকুর হয়ে উঠেছিল পাকিস্তান আর্মি। আকস্মিকভাবে তুমুল আক্রমণ আসছে, অথচ 'মুকুত কাঁহাঁ' জানা ছিল না ওদের। ফলে লোম বাছতে কম্বল উজাড় হবার দশা হয়েছিল, গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে, নির্বিচারে নিরীহ মানুষকে হত্যা করেও নিশ্চিন্ত হতে পারেনি, পদে পদে হোঁচট খেয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের অ্যামবুশের সামনে। সেই গণ-সমর্থন কোথায় পাবে এরা?'

'ধর্মের দোহাই দিয়ে জনসাধারণের সমর্থন পাবে না ভাবছ?'

'অসম্ভব। ওভাবে আর বোকা বানানো যাবে না এদেশের মানুষকে। ইসলাম বিপন্ন বলে...'

'ভারতের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার করে?'

'ওদিক থেকে যে একেবারে অসম্ভব তা বলব না, স্যার। কিন্তু তাতে সময় লাগবে অনেক। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস ভারতের অকৃত্রিম বন্ধুত্ব, বিপুল সমর্থন, আর অকৃপণ সাহায্যের কথা এত সহজে ভুলবে না এদেশের মানুষ। মানুষের মন থেকে কৃতজ্ঞতা আর সম্প্রীতির রেশটুকু মুছে ফেলতে হলে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে ওদের। কেবল স্যাবোটাজে জনসাধারণের সমর্থন আসবে না। টিকতেই পারবে না। সত্যিই স্যার, উদ্ভট...'

'হ্যাঁ। উদ্ভট পরিকল্পনা বলতে পারো, কিন্তু অসম্ভব নয়। সারা দেশজুড়ে অরাজকতা সৃষ্টি করার পক্ষে যথেষ্ট। আমার ধারণা এই অরাজকতার সুযোগ গ্রহণ করার চেষ্টা করবে কোন বিশেষ মহল। বিরুদ্ধভাবাপন্ন বিশ্ব-শক্তির প্রত্যক্ষ হাত দেখতে পাচ্ছি এর পিছনে। নইলে অস্ত্র-শস্ত্র, গোলা-বারুদ, বেতারকেন্দ্রের ট্র্যান্সমিটার ইত্যাদি কোথা থেকে আসছে ওদের? বার্মা ও ভারত সরকার এমন দিশেহারা হয়ে পড়েছে কেন? সীমান্তে কারফিউ দেয়ার কথা দেখনি কাগজে?' এপাশ ওপাশ মাথা নাড়লেন রাহাত খান। 'এক মহাপরিকল্পনা রচনা করেছে ইয়াহিয়া ও তার দোসররা মিলে, আমার যতদূর বিশ্বাস।'

'প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ পাওয়া গেছে, স্যার?' সতর্কতার সাথে প্রশ্ন করল রানা।

'না।' সাফ জবাব দিলেন বৃদ্ধ। 'প্রত্যক্ষ কিছুই হাতে আসেনি আমাদের। কিছু কিছু আভাস দেখে অনুমান করে নিতে হচ্ছে। আসলে সবটাই অনুমান। তোমার প্রধান কাজ হচ্ছে এই অনুমানের মধ্যে সত্যতার পরিমাণ কতটুকু তা যাচাই করে দেখা।'

'আর্মি পাঠানো হচ্ছে?' কাজের কথায় এল রানা।

'কোথায় পাঠাব? ওদের ঘাঁটিই তো লোকেট করা যায়নি এখন পর্যন্ত

ভারত, বাংলাদেশ ও বার্মার সীমান্তে নয়শো বর্গমাইল জঙ্গল আর পাহাড়ের মধ্যে ঠিক কোন জায়গাটায় ওদের ট্রেনিং সেন্টার, জানা যাচ্ছে না। লোক পাঠালে ফেরত আসে না সে লোক। একমাত্র লোক, যে সঠিক লোকেশনটা জানত এবং জানাতে যাচ্ছিল, প্যাপন মং লাই, সে-ও নিখোঁজ হয়েছে সপ্তাহখানেক হলো। তাই বার্মিজ ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের সহযোগিতায় জটিল একটা জাল পাততে হয়েছে আমাদের।'

'প্যাপন মং লাই লোকটা কে?'

'অত্যন্ত প্রতাপশালী এক আরাকানী উপজাতীর সর্দার। গেরিলাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে গিয়ে রেঙ্গুন থেকে যোগাযোগ করেছিল সে আমাদের সাথে। কিন্তু পরদিনই গায়েব করে ফেলা হয়েছে তাকে।'

'ব্যাপারটা ট্র্যাপ হতে পারে না, স্যার?' সাবধানে জিজ্ঞেস করল রানা।

'খুব সম্ভব ট্র্যাপ নয়, তবু সেটাকেও একটা পসিবিলিটি বলে ধরতে হবে তোমাকে।'

'লোকটাকে খুঁজে বের করতে হবে আমার?'

'না।' পাইপটা ধরিয়ে নিলেন মেজর জেনারেল আবার। খানিকক্ষণ আনমনে টানলেন, চোখের নিচটা বাম হাতের কনিষ্ঠা দিয়ে চুলকালেন, তারপর বললেন, 'সেজন্যে মাসুদ রানাকে পাঠাবার প্রয়োজন পড়ে না। উ-সেনকে মনে আছে তোমার?'

চমকে গেল রানা।

'সেই ভয়ঙ্কর বার্মিজ দস্যু, উ-সেন? মনে আছে, স্যার। প্লেন ক্র্যাশে মারা গেছে বছর তিনেক হলো।'

'মারা যায়নি। আমাদের তথ্যে ভুল ছিল। বেঁচে আছে এবং বহাল তবিয়তেই আছে। তোমার এবারের টার্গেট উ-সেন।'

আশ্চর্য হয়ে গেল রানা। হাঁ করে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ বোকার মত। সংবিৎ ফিরে পেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'মুসলিম বাংলার সাথে দস্যু উ-সেনের কি সম্পর্ক স্যার?'

'টাকার সম্পর্ক। প্রচুর ডলারের বিনিময়ে ওর সহযোগিতা কিনে নিয়েছে পাকিস্তান। ওর প্রকাণ্ড নেট-ওয়ার্ক এখন কাজ করছে 'মুসলিম বাংলা গেরিলা ফৌজে'র অস্ত্রশস্ত্র, রসদ, এমন কি মানুষ সরবরাহ করার কাজে। অনেকটা লিয়াজোঁ ও রিক্রুটিং অফিসারের কাজ করছে সে। সরাসরি গেরিলা ফৌজে যোগ দেয়ার উপায় নেই, প্রথমে ওর ক্লিয়ারেন্স সংগ্রহ করতে হবে তোমাকে।'

'আমি কি ওদের দলে যোগ দিতে চলেছি?'

'তুমি একা নও। হাজারতিনেক মুক্তিযোদ্ধাকে সুন্দরবনের এক গোপন আস্তানায় লুকিয়ে রেখে ওদের মুখপাত্র হিসেবে তুমি একা যাচ্ছ উ-সেনের সাথে দেখা করতে। প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র আর গোলা-বারুদ নিয়ে যাচ্ছ তুমি তোমার সততা এবং "মুসলিম বাংলা"র প্রতি নিষ্ঠার প্রমাণ স্বরূপ। সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে, বার্মিজ ইন্টেলিজেন্সের মারফত কৌশলে-কন্ট্রাক্ট করা হয়েছে উ-সেনের

সাথে, আজই রাত বারোটায় রওনা হচ্ছ তুমি। খুব সম্ভব পাকিস্তানী কোন জেনারেলের সাথে দেখা হয়ে যাবে তোমার রেঙ্গুনে। কপাল ভাল হলে মাহমুদ আলী বা গোলাম আযমকেও পেয়ে যেতে পারো।'

'আমার কাজটা কি, স্যার?'

'প্রথম কাজ প্রাণে বেঁচে থাকা। দ্বিতীয় কাজ শত্রু ধ্বংস করা। বার্মিজ ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসকে সরে থাকতে বলেছি। কিভাবে কি করবে সেসব নির্ভর করবে পরিস্থিতির গতি প্রকৃতির উপর। যেমন ভাল বুঝবে, করবে। তবে আমি আশা করব, সাতদিনের মধ্যে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে উ-সেনের দল, মারা যাবে "মুসলিম বাংলা" আন্দোলনের দু'একজন গুরুত্বপূর্ণ কর্ণধার, গেরিলা ট্রেনিং সেন্টারের অবস্থান হাতে আসবে আমার।' পাইপটা নামিয়ে রাখলেন মেজর জেনারেল টেবিলের উপর। ডান হাতটা সামান্য একটু নড়ল ডানদিকে। অর্থাৎ–বক্তব্য শেষ, এবার তুমি আসতে পারো। সরাসরি চাইলেন বৃদ্ধ রানার চোখে। 'কিছু প্রশ্ন আছে?'

'শত্রুপক্ষ কে? কাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি আমরা?'

'তুমি জানতে চাইছ, যেহেতু "মুসলিম বাংলা গেরিলা ফৌজে"র সাথে কিছু ভারতীয় মিজো, নাগা ও বর্মী বিদ্রোহী যোগ দিয়েছে, আমরা তাদের সাথেও লড়ছি কিনা? উত্তরটা হচ্ছে, হ্যাঁ। ওরা যৌথভাবে কাজ করছে। ওদের মধ্যে চুক্তি হয়েছে, মিলিতভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে এক এক করে প্রত্যেকের সমস্যার সমাধান করবে। যাই হোক, বাংলাদেশের মাটিতে যেই আসুক, ভারতীয় হোক, বর্মী হোক, আর পাকিস্তানী হোক–যদি দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করতে চায়, আমরা তাদের শত্রু।'

'বুঝলাম স্যার, কাউকে ছেড়ে কথা বলব না। এখন কিভাবে যাচ্ছি, কিভাবে কন্ট্যাক্ট করছি উ-সেনকে, ইত্যাদি ব্যাপারে একটু ডিটেইল্স্...'

'তোমাকে কন্ট্যাক্ট করতে হবে না, ওরাই খুঁজে নেবে তোমাকে। আর অন্যান্য ব্যাপারগুলো বিস্তারিত জানতে পারবে সোহেলের কাছে।'

'ঠিক আছে, স্যার।' উঠে দাঁড়াল রানা।

সরাসরি রানার চোখের উপর চোখ রাখলেন মেজর জেনারেল।

'উ-সেন কতটা ভয়ঙ্কর ক্ষমতাশালী সে কথা তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন নেই আশা করি। রেঙ্গুনে বসে ওর বিরুদ্ধাচরণ করবার ক্ষমতা পৃথিবীর কুখ্যাত দস্যুদল টং বা মাফিয়ারও নেই।' উদ্বেগ আর আশঙ্কার ছায়া দেখতে পেল রানা বৃদ্ধের চোখে। 'কাজেই প্রয়োজন হলে যেন প্রাণ নিয়ে পালাতে পারো, তার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে রেঙ্গুনে। নানকিং হোটেলে তোমার সাথে এক ছুতোয় পরিচয় করে নেবে এক ভারতীয় দম্পতি, মিস্টার অ্যান্ড মিসেস সরোজ গুপ্ত। তোমার মিশন সম্পর্কে কিছুই জানে না ওরা, জানাবার প্রয়োজনও নেই। কাজ শেষ হলেই নিশ্চিন্তে ছেড়ে দেবে তুমি নিজেকে মিসেস গুপ্তর হাতে।'

হঠাৎ চোখজোড়া সঙ্কুচিত হয়ে গেল রানার। পরমুহূর্তে চমকে উঠল সে।

দ্বিগুণ হয়ে গেল হার্টবিট।

কি ওটা!

মেজর জেনারেলের শেষের কথাগুলো এখনও বাজছে কানে…কিন্তু একলাফে ঢাকা থেকে ফিরে এসেছে মনটা চারশো মাইল দক্ষিণের বর্তমান বাস্তবে।

আলো!

বামদিক থেকে একটা লাল আলো এগিয়ে আসছে ইয়টের দিকে। দ্রুত। নিঃশব্দে।

কিসের আলো? জাহাজ? প্লেন?

তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ছুটল রানা ব্রিজের দিকে। দূরবীন অ্যাডজাস্ট করতে করতেই বেশ অনেকটা কাছে চলে এল আলোটা। মাইল দেড়েক হবে এখান থেকে বড়জোর। চট করে নেভিগেশন লাইট নিবিয়ে দিল রানা। ভাল করে কিছু বুঝে উঠবার আগেই এক মাইলের মধ্যে এসে পড়ল আলোটা। আবছামত দেখতে পাচ্ছে রানা।

হেলিকপ্টার!

এই অন্ধকার সমুদ্রের বুকে হেলিকপ্টার কেন? বার্মার কোস্টাল সিকিউরিটি গার্ড। পুলিস? আর্মি? না চোরাচালানী?

এইদিকেই আসছে। রোটর ব্লেডের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে রানা এখন।

হেলম্ ঘুরিয়ে কোর্স পরিবর্তন করল রানা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি। স্পীড বাড়িয়ে দিল, থারটি নটস্! কিন্তু কোন লাভ হলো না। অনেক কাছে এসে গেছে।

দপ করে জ্বলে উঠল চোখ-ধাঁধানো সার্চলাইট।

সমুদ্রের বুকে কি যেন খুঁজছে হেলিকপ্টার। এই ইয়টটাকে? ব্যাপার কি? রানার পজিশন জানল কি করে ওরা?

খানিকক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে স্থির হলো সার্চ লাইটের আলো ইয়টের উপর। একশো গজ উপরে এসে দাঁড়াল হেলিকপ্টার। রোটর ব্লেডের কর্কশ আওয়াজে কানে তালা লাগবার জোগাড়। ধীরে ধীরে নেমে আসছে ওটা নিচে।

কর্কশ কণ্ঠে আদেশ এল লাউড স্পীকারে।

'থামাও ইয়ট। নোঙর ফেলো। নইলে গুলি করব।'

দুই

দড়ির মই বেয়ে নেমে এল চারজন।

মাথার উপর পনেরো ফুট উঁচুতে নেমে এসেছিল, এখন একশো ফুট

উপরে উঠে স্থির হয়ে আছে হেলিকপ্টার। নজর রাখছে চারদিকে।

মনে মনে এদের দক্ষতার প্রশংসা না করে পারল না রানা। প্রত্যেকের হাতে একটা করে মেশিন-পিস্তল। বটল্ গ্রীন ইউনিফরম। এদের মধ্যে একজনের কোমরে হোলস্টারে ঝোলানো রিভলভার, ঠোঁটে নিচু দিকে ঝোলানো বার্মিজ গোঁফ। রানা আন্দাজ করল, এইটাই সর্দার। সব কজনই বার্মিজ। ফোলাফোলা, থ্যাবড়া, চ্যাপ্টা, ভোঁতা নাক-মুখ, আধবোজা ঈষৎ বাঁকা চোখ, সুঠাম স্বাস্থ্য।

প্রথমেই সার্চ করা হলো রানাকে। অস্ত্র পাওয়া গেল না।

মিলিটারি ভঙ্গিতে ভুরু কুঁচকে স্বাগত দৃষ্টিতে চাইল গোঁফধারী রানার দিকে। যেন ধরেই নিয়েছে, মস্ত কোন অপরাধ করেছে রানা। ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, 'কয়জন আছে এই ইয়টে?'

'আমি একা।' উত্তর দিল রানা।

'একা?' চোখের ইঙ্গিতে সার্চ করবার নির্দেশ দিল সঙ্গীদের। নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে মেশিন পিস্তলটা সোজা তাক করল রানার বুকের দিকে। সঙ্গীরা ছড়িয়ে পড়ল ইয়টের চারপাশে। এদের চলা ফেরা, ভাব ভঙ্গিতে অত্যন্ত পারদর্শী প্রফেশনাল একটা আভাস টের পেল রানা। অ্যামেচার নয়।

আবার প্রশ্ন করল গোঁফধারী। 'একা? কোথায় চলেছ? কি আছে ইয়টে?'

'তার আগে জানতে পারি, তোমরা কারা?'

'কোস্টাল সিকিউরিটি গার্ড।'

'কি চাও তোমরা?'

'জানতে চাই, কি আছে ইয়টে?'

'কিচ্ছু নেই। আমি ট্যুরিস্ট···ওয়ার্লড ট্যুরে বেরিয়েছি। এখন চলেছি রেঙ্গুন। কি থাকবে আমার কাছে? খুলনা থেকে বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে বার্মা সরকারের জন্যে কয়েক পেটি চা নিয়ে যাচ্ছি স্যাম্পল্ হিসেবে। আর কিছু নেই আমার কাছে। সমস্ত কাগজপত্র, ডকুমেন্টস্ রয়েছে, দেখতে পারো। কোনরকম বে-আইনী জিনিস···'

'শাট আপ।' ধমকে উঠল গোঁফওয়ালা। কটমট করে চেয়ে বলল, 'বড় বেশি কথা বলো হে তুমি, ছোকরা। বাজে কথা শুনতে চাই না। যা জিজ্ঞেস করব শুধু তার উত্তর দেবে। দেখি পাসপোর্ট?'

'তার আগে তোমার আইডেন্টিটি কার্ড দেখাও।' বলল রানা।

'আমার নাম ক্যাপ্টেন ইয়েন ফ্যাঙ। আর আইডেন্টিটি কার্ড তো দেখতেই পাচ্ছ হাতে।' ঠোঁটের কোণে সামান্য বাঁকা হাসি টেনে এনে হাতের অস্ত্রটা নেড়ে দেখল। 'কাজেই বেশি স্মার্টনেস দেখিয়ো না ছোকরা, এক-আধটা গুলি ছুটে বেরিয়ে গিয়ে অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যেতে পারে।'

'তোমার নামে রিপোর্ট করব আমি রেঙ্গুন পৌঁছে।'

'তার আগেই স্বর্গে পৌঁছে যাবে। আমরা খবর পেয়েছি, এই ইয়টে করে বে-আইনী অস্ত্রশস্ত্র যাচ্ছে বার্মার বিদ্রোহী সেনা বাহিনীর জন্যে। দেখি

পাসপোর্ট?'

'কেবিনে আছে।'

তিন সঙ্গী ফিরে এসে বার্মিজ ভাষায় জানাল আর কেউ নেই.ইয়টে রানা ছাড়া। মাথা নাড়ল ইয়েন ফ্যাঙ। রানাকে বলল, 'যাও, নিয়ে এসো কেবিন থেকে। কিন্তু সাবধান, কোনরকম চালাকি নয়, একটু এদিক ওদিক দেখলেই গুলি করবে আমার লোক।'

কেবিন থেকে পাসপোর্ট নিয়ে এল রানা। সাথে গেল দুইজন মেশিন-পিস্তলধারী।

ডেকের উপর রোটর ব্লেডের প্রবল বাতাস। নোঙর ফেলা সত্ত্বেও অল্প অল্প দুলছে ইয়টটা ঢেউয়ের দোলায়। প্রয়োজন হলে এই দোলার সাহায্য নিতে হবে, ভাবল রানা।

পাসপোর্ট এবং অন্যান্য কাগজপত্র সংক্ষিপ্তভাবে পরীক্ষা করে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করল ক্যাপ্টেন ইয়েন ফ্যাঙ, 'বোগাস। নকল।' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইল রানার দিকে। 'নেভিগেশন লাইট নিবিয়ে দিয়ে পালাবার চেষ্টা করছিলে কেন?' রানাকে নিরুত্তর দেখে বলল, 'সার্চ করব। চলো, হ্যাচ খুলে দাও।' ডেকটেবিলের উপর থেকে ব্ল্যাক ডগ-এর বোতলটা তুলে নিল সে।

লোহার মই বেয়ে হোল্ডে নেমে এল ওরা।

দুজন মিলে খুলল একটা বাক্স।

চায়ের নমুনা দেখেই আঁতকে উঠল ইয়েন ফ্যাঙ। থরে থরে সাজানো রয়েছে গোটা পঞ্চাশেক চায়নিজ স্টেনগান। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বাক্সে ভর্তি অ্যামিউনিশন। লম্বা আকারের চতুর্থ বাক্সটায় হাসি হাসি মুখ করে শুয়ে আছে দশটা এল.এম.জি। চোখ কপালে উঠল ক্যাপ্টেনের। ঢক ঢক করে কয়েক ঢোক খেয়ে ফেলল সে বোতল থেকে। মুখ থেকে বোতলটা নামিয়ে বারণ করল একজনকে, 'হয়েছে, হয়েছে। আর খোলার দরকার নেই–চায়ের ফ্লেভার নষ্ট হয়ে যাবে। লাগিয়ে দাও সব বাক্স যেমন ছিল তেমনি।'

মেশিন-পিস্তলটার মুখ সরে গেছে রানার বুকের ওপর থেকে। আলতো করে ধরা আছে সেটা এখন মেঝের দিকে। ইচ্ছে করলেই ছিনিয়ে নিতে পারে রানা সেটা, কিন্তু তা করল না। এদের সত্যিকার পরিচয়টা ক্রমেই পরিষ্কার হয়ে আসছে রানার কাছে।

আরও দু'ঢোক কমিয়ে দিল ইয়েন ফ্যাঙ রানার ব্ল্যাক ডগ, তারপর সঙ্গীদের আদেশ দিল, 'ঠিক আছে, এ আমাদেরই লোক, এবার তোমরা ফিরে যাও হেলিকপ্টারে, আমি কয়েকটা কথা সেরে আসছি।'

তিন সঙ্গী হোল্ড ছেড়ে উপরে উঠে যেতেই অমায়িক ভাবটা মুছে গেল ইয়েন ফ্যাঙের মুখ থেকে। গম্ভীরভাবে বলল, 'ঠিক আছে, তুমি জেনুইন লোক। কিন্তু একটু ত্যাড়া কিসিমের। তোমার ব্যবহারটা একটু আয়ত্তে না রাখলে বিপদে পড়বে আমাদের সাথে কাজ করতে গিয়ে। ত্যাড়া লোক পছন্দ করি না আমরা।' রানাকে নিরুত্তর দেখে ধরে নিল বশ্যতা স্বীকার করে

নিয়েছে সে। এবার কাজের কথায় এল। 'জেনুইন লোক তো বুঝলাম, কিন্তু তোমার ওই নকল কাগজপত্র দেখিয়ে রেঙ্গুন কাস্টমসকে ধোঁকা দিতে পারবে না।' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল,'কাস্টমস যাতে তোমার কাছেই না ভিড়তে পারে, সেই ব্যবস্থা করতে হবে এখন আমাদের। সেসব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এখন পরবর্তী ডিরেকশন শুনে নাও মন দিয়ে। আগামীকাল দেখা পাবে না উ-সেনের। পরশু রাত আটটায় শ্যু ড্যাগন প্যাগোডার সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে, ওখান থেকে নিয়ে যাওয়া হবে তোমাকে আমাদের আস্তানায়। এর মধ্যে ইয়ট ছেড়ে কোথাও যাবে না, কিংবা কারও সাথে কোনরকম কন্ট্যাক্ট করবে না। বুঝলে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। বলল, 'মাঝ-সাগরে ইয়ট থামিয়ে কি দেখতে এসেছিলে তোমরা?'

'তোমাকে। পরীক্ষা করা হলো।'

'পরীক্ষা করতে এসেছ, প্রথমেই পরিচয় না দিয়ে ভান করছিলে কেন? বলা যায় না, এক-আধজনের প্রাণও তো যেতে পারত এই বোকামির ফলে?'

মৃদু হাসল ইয়েন ফ্যাঙ। 'গেলে তোমারটা যেত। তোমার প্রাণের জন্যে আমার খুব একটা মায়া নেই। তোমার রিঅ্যাকশন দেখার জন্যে এই মিথ্যার প্রয়োজন ছিল। কাউকে বিশ্বাস করি না আমরা। আমার কাছ থেকে ও.কে. সিগন্যাল না পেলে পৃথিবীর কারও পক্ষেই উ-সেনের সাথে দেখা করা সম্ভব নয়।'

'আমাদের মেসেজ পাওয়ার পরেও এত সন্দেহ কিসের?'

'তোমাদের মেসেজের মধ্যে কিছু ফাঁক আছে। তাই এই সাবধানতা।'

'স্বচক্ষে দেখার পর সন্দেহ নিরসন হয়েছে আশা করি?'

'না। এখনও তুমি আমাদের সন্দেহের বাইরে নও, আব্বাস মির্জা। আগামী দুদিন তোমার সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহ করা হবে। চলি এখন। মনে রেখো, পরশু, রাত আটটা। পাস ওয়ার্ড–ট্যুরিস্ট।'

লোহার মই বেয়ে উঠে এল ইয়েন ফ্যাঙ ডেকের উপর। পিছু পিছু এল রানা। কেন যেন ভয়ানক অপছন্দ করল রানা এই লোকটাকে। এক লাথি মেরে লোকটাকে পানিতে ফেলে দেবার অদম্য ইচ্ছেটা বহু কষ্টে আয়ত্তে আনল সে। ঢক ঢক করে বোতলের অবশিষ্টটুকু গলায় ঢেলে পানিতে ফেলে দিল ইয়েন ফ্যাঙ খালি বোতলটা।

হঠাৎ ভয়ানকভাবে চমকে উঠল সে।

প্রকাণ্ড একটা ছায়া। ডেকের উপর। মুহূর্তে মিলিয়ে গেল ছায়াটা কেউ কিছু বুঝে উঠবার আগেই।

'কি ব্যাপার...' প্রশ্ন করতে গিয়েও থেমে গেল ইয়েন ফ্যাঙ। আবার দেখা গেল ছায়াটা। ইয়টের চারপাশে পাক খেয়ে খেয়ে উড়ছে অ্যালব্যাট্রস। সার্চ লাইটের কর্কশ আলোয় বিদঘুটে দেখাচ্ছে ওর প্রকাণ্ড ছায়াটা। প্রাগৈতিহাসিক টেরাড্যাকটিলের মত।

খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে উঠল ইয়েন ফ্যাঙ। চমকে ওঠার লজ্জাটা কাটাবার জন্যে তাক করল মেশিন-পিস্তল।

'মেরো না, মেরো না ওটাকে...'

এগিয়ে এল রানা দুই পা। আবার ফিরে এসেছে বিশাল পাখিটা। বিচ্ছিরি কর্কশ শব্দ বেরোল পিস্তলের মুখ থেকে–কট্ কট্ কট্ কট্ কট্ কট্।

লক্ষ্যভ্রষ্ট করার জন্যে জোরে ধাক্কা মারল রানা ইয়েন ফ্যাঙের কাঁধে। কিন্তু তার আগেই প্রাণ বেরিয়ে গেছে পাখিটার। হুড়মুড় করে পড়ল ওটা সাগরজলে, ভাঙা-চোরা ভঙ্গিতে। বার দুই পাখা ঝাপটাল, তারপর স্থির হয়ে গেল। ঢেউয়ের মাথায় দুলছে। ডুবে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

রানার ধাক্কায় ডেক-চেয়ারে পা বেধে পড়ে গিয়েছিল ইয়েন ফ্যাঙ, তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। রাগে অগ্নিমূর্তি ধারণ করেছে সে। লাল হয়ে গেছে চোখজোড়া। মেশিন-পিস্তলটা ধরল রানার বুকের দিকে তাক করে। ঠক ঠক করে কাঁপছে হাতটা।

স্থির অচঞ্চল দাঁড়িয়ে আছে রানা। হেলিকপ্টারটি বেশ খানিকটা নিচে নেমে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল ইয়েন ফ্যাঙ, এগোতে সাহস পেল না। দড়ির মই নেমে এল, দুজন সঙ্গীর মাথা দেখা যাচ্ছে–সাহস ফিরে পেল সে। ঝাঁপিয়ে পড়ল রানার উপর। একতরফা যেখানে খুশি কিল-ঘুসি-লাথি মারল সে রানাকে একটানা দুই মিনিট। মেশিন-পিস্তলের কুঁদো দিয়ে মারল ঘাড়ে, পিঠে। মার খেয়ে পড়ে গেল রানা। উঠে দাঁড়াল আবার। ফোঁস ফোঁস হাঁপাচ্ছে ইয়েন ফ্যাঙ, রাগে কাঁপছে এখনও, মেশিন-পিস্তলটা প্রস্তুত, ট্রিগার টিপবার ছুতো খুঁজছে ডানহাতের তর্জনী, কটমট করে চেয়ে রয়েছে রানার দিকে, লক্ষ করছে রানার প্রতিক্রিয়া।

পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা। ঈষৎ বাঁকা কঠোর দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে ইয়েন ফ্যাঙের মঙ্গোলিয়ান চোখের দিকে।

নীরবে কাটল এক মিনিট। কেউ কাউকে ভস্ম করতে পারল না চাউনি দিয়ে।

কোন কথা না বলে দড়ির মই বেয়ে উঠে গেল ইয়েন ফ্যাঙ। গুটিয়ে নেয়া হলো মই। যেদিক থেকে এসেছিল সেইদিকেই চলে গেল হেলিকপ্টার। পাঁচ মিনিটের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল দৃষ্টিপথ থেকে।

বাতি জ্বেলে পাখিটাকে খুঁজল রানা। অদৃশ্য হয়ে গেছে সেটাও।

বিষণ্ণ মনে নোঙর তুলল রানা। কোর্স ঠিক করে নিয়ে ছেড়ে দিল ইয়ট।

বোতলটাও নেই, পাখিটাও নেই।

দুটোই শেষ করে দিয়ে গেছে ইয়েন ফ্যাঙ।

কাজটা ভাল করেনি।

বড় নিঃসঙ্গ বোধ করছে রানা।

তিন

জেটি থেকে দু'মাইল দূরে নোঙর ফেলেছে রানা।

আশেপাশে মাইল খানেকের মধ্যে দেশী-বিদেশী বেশ কয়েকটা ভারী জাহাজ, কিছু গাধা-বোট আর বার্জ রয়েছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। সন্ধ্যার আগে আগে আরও তিনটে জাহাজ নোঙর ফেলল কাছাকাছি।

সন্ধে থেকেই শুরু হয়ে গেছে ছপাৎ ছপাৎ দাঁড়ের শব্দ। ছোট ছোট অসংখ্য ডিঙি নৌকো। লোভনীয় পণ্য তাতে। একআধটা ভিড়ছে এসে ইয়টের গায়ে, দমাদম পিটাচ্ছে খোলের গায়ে বৈঠা দিয়ে–বিউটিফুল গার্ল সাহিব...বার্মিজ কুইন সাহিব...ভেরি ইয়াং সাহিব...স্পেশাল বিউটি সাহিব...ওনলি টেন রুপি সাহিব...ভেরি নাইস গার্ল সাহিব...

জামাকাপড় ভাঁজ করে একটা প্যাকেট তৈরি করে নিল রানা। আগামীকাল সন্ধের আগে ইয়ট ছেড়ে কোথাও যাওয়া নিষেধ, কিন্তু আজকের মধ্যেই মিস্টার অ্যান্ড মিসেস সরোজ গুপ্তের সাথে কন্ট্যাক্ট না করতে পারলে সমস্ত প্ল্যান ওলট-পালট হয়ে যাবে। অবশ্য আজকে ডাঙায় উঠে ধরা পড়লে অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যাবে। তবু এটুকু ঝুঁকি না নিয়ে উপায় নেই। সাড়ে সাত লক্ষ লোকের মধ্যে কি আর মিশে যেতে পারবে না সে?

ম্লান একটা রাইডিং লাইট জ্বেলে রেখে সব বাতি নিবিয়ে দিল রানা, হ্যাচের তালাটা ভাল করে পরীক্ষা করল, তারপর ডাকল একটা টেন রুপি বার্মিজ বিউটি কুইনকে। অ্যাংকর চেনের সাথে ডিঙিটা বেঁধে রেখে উঠে এল মেয়েটা ডেকের উপর।

তিনশো গজ দূরে বিনকিউলার হাতে একটা মাঝারি সাইজের জাহাজের ডেকে এইদিকে চেয়ে বসে আছে একজন মোটাসোটা লোক। দাঁতের ফাঁক থেকে চুরুটটা সরিয়ে হাসল নিঃশব্দ হাসি। ভাঁজ হয়ে গেল গালদুটো। আব্বাস মির্জার ইয়টে উঠছে একটা মেয়ে।

কেবিনে ঢুকেই ঝটপট কাপড় ছেড়ে ফেলল রঙচঙ মাখা ভূতের মত বিউটি কুইন। সস্তা স্নো-পাউডারের গন্ধ ভুরভুর করছে। এমন কড়া সেন্ট মেখেছে যে হাঁচি এসে যাবার জোগাড়। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়স হবে, এরই মধ্যে চর্বি জমে গেছে কোমরে। তলপেটে কয়েকটা গর্ভপাতের দাগ। রানার দিকে ফিরে মধুর হাসি হাসল। রানার ইঙ্গিতে বসল বিছানার উপর। দ্রুত কাপড় ছাড়ছে রানা। বিস্মিত দৃষ্টিতে রানার শরীরের পেশীগুলোর দৃঢ়তা লক্ষ করছিল সে–সামান্য নড়াচড়াতেই কিলবিল করে উঠছে অসংখ্য লৌহ-দৃঢ় পেশী, একবিন্দু বাড়তি চর্বি নেই শরীরের কোথাও, ইস্পাত দিয়ে তৈরি। মনে মনে

প্রশংসা না করে পারল না মেয়েটা–দারুণ ফিগার লোকটার।

শুধু জাঙ্গিয়াটা অবশিষ্ট থাকতে মেয়েটার দিকে ফিরল রানা। মেয়েটা হাসল আবার। বলল, 'ফার্স্ট গিভ টেন রুপি, সাহিব।'

ড্রয়ার থেকে পঞ্চাশ টাকার একটা নোট বের করল রানা। বলল, 'নো টেন রুপি–টেক ফিফ্‌টি রুপি, অ্যান্ড রেস্ট।'

অবাক হয়ে গেল বিউটি কুইন, কিন্তু হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিয়ে রেখে দিল ভ্যানিটি ব্যাগে। সহৃদয় ব্যক্তি পেয়ে খুশি হয়ে উঠেছে সে, প্রকাশ পেল হাসিতে। রানাকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ডাকল, 'কাম। মেক লাভ। ইউ এঞ্জয় সাহিব, প্রমিজ।'

হাসল রানা। 'নো মেক লাভ। ইউ স্লীপ মাই বেড। আই গো টাউন, কাম ব্যাক…টু আওয়ার্স।'

এই ভাঙা ভাঙা তোতাপাখির বোল ভালমত বুঝতে পারেনি বিউটি কুইন, শুয়ে পড়েছিল বিছানায়, কিন্তু রানাকে ওর ব্লাউজ আর সিল্কের বিচিত্র বর্ণ সারং পরতে দেখে তড়াক করে উঠে বসল। 'হেই! হোয়াট ইজ ডুইং!'

'আই টেক ইয়োর বোট, ইউ টেক মাই বোট।' দুই আঙুল দেখাল রানা। 'টু আওয়ার্স। আই কাম ব্যাক, অ্যান্ড গিভ ইউ অ্যানাদার ফিফ্‌টি রুপি। অল রাইট? নো মেক লাভ, ইউ স্লীপ, রেস্ট টু আওয়ার্স, দেন গো। অল রাইট?'

আজব বনে গেছে মেয়েটা মক্কেলের কাণ্ড দেখে। কিন্তু মোটামুটি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে সে। লোকটা কারও চোখে ধুলো দিয়ে কোথাও যাচ্ছে দুই ঘণ্টার জন্যে, ফিরে এসে আরও পঞ্চাশ টাকা দিয়ে বিদায় করবে–ততক্ষণ থাকতে হবে ওকে এই কেবিনে শুয়ে। বেশি আপত্তি করল না সে। একটু আঁইগুঁই করে রাজি হয়ে গেল। বলল, 'ইউ কাম ব্যাক, দেন লাভ মি। নো ডিজিজ। ইউ এঞ্জয় সাহিব, প্রমিজ। আই নো বেগার, ইউ লাভ মি আফটার কাম ব্যাক।'

রানার সাজগোজ দেখে হাসল মেয়েটা। বলল, 'হ্যালো, বিউটি কিং। ইউ নো গেট কাস্টোমার।'

হাসল রানাও। ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে একটা প্রকাণ্ড চুরুট বের করে ধরাল মেয়েটা। আরামদায়ক বিছানায় টানটান হয়ে শুয়ে আড়মোড়া ভাঙল।

ঠিক পাঁচ মিনিট পর কেবিনের দরজায় চাবি মেরে কাপড়ের প্যাকেটটা ভ্যানিটি ব্যাগের মত করে ধরে নেমে গেল রানা বোটে।

তিনশো গজ দূরে জাহাজের ডেকে বসা মোটা লোকটা চমকে উঠল। বিনকিউলারের নব ঘুরিয়ে আরেকটু পরিষ্কার করে নিল ছবিটা। বিস্ফারিত হয়ে গেল দুই চোখ। বোটে নেমে যাচ্ছে ব্লাউজ আর সারং পরা আব্বাস মির্জা!

একলাফে উঠে দাঁড়াল মোটা লোকটা। ছুটে গিয়ে ঢুকল একটা

কেবিনে। পরমুহূর্তে বেরিয়ে এল আবার। পিছু পিছু হন্তদন্ত হয়ে আসছে আরেকজন বার্মিজ লোক। লোহার মই বেয়ে নেমে একটা রাবারের ডিঙিতে উঠে পড়ল মোটা লোকটা। ছোট্ট একটা কাশি দিয়ে স্টার্ট হয়ে গেল ডিঙির আউটবোর্ড ইঞ্জিন। রেলিং ধরে ঝুঁকে ডিঙিটাকে দেখল দ্বিতীয় ব্যক্তি। কি যেন বলল চিৎকার করে। তারপর বিনকিউলার হাতে গিয়ে বসল মোটা লোকটার পরিত্যক্ত ডেক-চেয়ারে।

আধমাইল দূরে নদী-তীরের অন্ধকারাচ্ছন্ন বাড়ির চিলেকোঠায় অত্যন্ত শক্তিশালী একটা দূরবীনে চোখ লাগিয়ে বসেছিল একটা অ্যাংলো-বার্মিজ তরুণী। সবই দেখতে পেল সে পরিষ্কার।

একটা নোঙর ফেলা জাহাজকে খামোকাই একপাক ঘুরে সোজা চলল রানা তীরের সবচেয়ে অন্ধকার অঞ্চলটা লক্ষ্য করে। নদীর ধারে সারি সারি অনেকগুলো টিম্বার মিল। একটা টিম্বার মিলের বিরাট কাঠের গুদামের পাশে বটগাছের গুঁড়িতে বাঁধল রানা নৌকোটা। কাপড় পাল্টে ফেলেছে সে ইতোমধ্যেই।

সারি সারি কাঠের ভেলা শুয়ে রয়েছে নদীর তীরে। সুদূর উত্তর-বার্মার পাহাড়ী জঙ্গল থেকে সেগুন গাছ কেটে হাতি দিয়ে বয়ে এনে ভাসিয়ে দেয়া হয় ইরাবতী নদীতে ভেলা বেঁধে। সাত আটশো মাইল স্রোতে ভেসে পৌঁছে ওগুলো রেঙ্গুনের এইসব টিম্বার মিলে। এখান থেকে সেগুলোকে ফালি বানিয়ে, বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সিযন্ড করে রপ্তানি করা হয় বিদেশে বার্মা টিক হিসেবে।

কয়েকটা ভেলার উপর দিয়ে সোজা হেঁটে এগিয়ে বামদিকে একটা রাস্তা পেল রানা। পুরো এলাকা দামী কাঠের গন্ধে ভরপুর। সিকি মাইল হেঁটেই বড় রাস্তায় পড়ল রানা। হাতের ইশারায় ট্যাক্সি ডাকল। শ্যু ড্যাগন প্যাগোডায় যেতে বলে উঠে বসল সে পেছনের সীটে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই টের পেল রানা, পেছনে আরেকটা ট্যাক্সি অনুসরণ করছে। মুচকি হাসল সে। একে খসিয়ে দিতে এমন কিছু অসুবিধে হবার কথা নয়।

রানা বা তার অনুসরণকারী টেরও পেল না, আরও পেছনে আরও একটা ট্যাক্সি অনুসরণ করছে ওদের দু'জনকে।

এককালের ছোট্ট একটা জেলে গ্রাম আজ ৭৭ বর্গমাইল জোড়া এক মহানগরী। সারি সারি প্রাসাদোপম অট্টালিকা, অপূর্ব সব সৌধ, চমৎকার বাগান, পার্ক, লেক। রাস্তাগুলো সমান্তরাল—শহরটাকে সমান কয়েকটা ভাগে ভাগ করেছে।

শহরতলির একটা পাহাড়ের মাথায় পৃথিবী বিখ্যাত শ্যু ড্যাগন স্বর্ণ

প্যাগোডা। আড়াই হাজার বছরের পুরানো এই পবিত্র বুদ্ধ-স্মৃতিস্তম্ভ। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ দর্শকের ভিড় হয় এখানে। সামনাসামনি না দেখলে এর মাহাত্ম্য ও গাম্ভীর্য উপলব্ধি করা যায় না। তিনশো ছিয়াশি ফুট উঁচু প্রকাণ্ড প্যাগোডাটা আগাগোড়া সোনার পাত দিয়ে মোড়া। চুড়োটা নিরেট পাকা সোনা দিয়ে তৈরি, তার গায়ে বসানো আছে অসংখ্য মণি-মাণিক্য। খাঁটি হীরেই রয়েছে পাঁচ হাজার, অন্যান্য দামী পাথরও আছে প্রচুর। সব মিলিয়ে কত টাকার মণিমুক্তা আছে হিসেব করে বের করতে পারেনি কেউ আজ পর্যন্ত। ভগবান বুদ্ধের পবিত্র চুল এবং আরও কিছু স্মৃতি-চিহ্ন সংরক্ষিত আছে এখানে।

প্যাগোডাকে গোল করে ঘিরে রয়েছে পাশাপাশি অনেকগুলো মন্দির। মন্দিরগুলোও দেখার মত–কাচের টুকরো আর কাঠের উপর সূক্ষ্ম কারুকাজ করে অলংকৃত করা হয়েছে মন্দিরগুলোকে। দেয়ালের গায়ে জায়গায় জায়গায় বুদ্ধমূর্তি। অপূর্ব।

জাঁক-জমক আর জৌলুসের কথা বলে এই প্যাগোডার সঠিক বর্ণনা হয় না। একটা স্তম্ভিত, গুরুগম্ভীর, প্রাচীন ভাব রয়েছে এই ঐতিহাসিক প্যাগোডাকে ঘিরে।

এঁকেবেঁকে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে এল রানার ট্যাক্সি। রাত পৌনে আটটা, কিন্তু যথেষ্ট ভিড় রয়েছে দর্শকের। তবে ছড়ানো ছিটানো। পাঁচ ফুট উঁচু লোহার শিক দিয়ে বেড়া দেয়া হয়েছে প্যাগোডার সীমানা। গেট দিয়ে ঢুকে পড়ল রানা। আড়চোখে দেখল পেছনের ট্যাক্সি থেকে নামছে একজন মোটা লোক।

মিনিট পনেরো ঘুরে ঘুরে দেখল রানা মন্দির আর প্যাগোডা। আসলে অন্ধকারমত নির্জন জায়গা খুঁজছে সে। কিছুদূর অন্তর অন্তর আট ফুট উঁচু ল্যাম্পপোস্টের মাথায় চমৎকার ডিজাইন করা কাচের শেডের ভেতর উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক বাতি। কিন্তু প্রচুর ছায়া ছায়া অন্ধকার জায়গা চোখে পড়ল রানার। বারকয়েক ঘড়ি দেখল সে। ঠিক আটটা বাজতেই একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘনমত একটা ছায়ার কাছাকাছি পরিষ্কার আলোয় দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। এদিক ওদিক চাইছে, যেন খুঁজছে কাউকে, অপেক্ষা করছে কারও জন্যে, অস্থির হয়ে উঠেছে রানা প্রত্যাশিত ব্যক্তি আসছে না বলে। সবদিকেই চাইছে সে–পেছন দিকটা ছাড়া। স্পষ্ট অনুভব করল সে, অন্ধকার ছায়ায় ছায়ায় অতি সন্তর্পণে এগিয়ে আসছে মোটা লোকটা। অনেকটা কাছে এসে পড়েছে।

একজন অ্যাংলো বার্মিজ তরুণী এগিয়ে আসছে এইদিকে। পথ ছেড়ে একটু অন্ধকারের দিকে সরে গেল রানা। তরুণী চাইল একবার রানার দিকে, পাশ কাটিয়ে চলে গেল বাঁক ঘুরে। পেছনে খসখস আওয়াজ। ভারী একটা গদগদে কণ্ঠস্বর শুনতে পেল রানা ঠিক দু'হাত পেছনে।

'এই যে, মিস্টার...'

কথা শেষ করতে পারল না লোকটা। ঝট করে ঘুরেই বিদ্যুদ্বেগে

ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা মোটা লোকটার উপর।

মোটেই প্রস্তুত ছিল না মোটা। নাকের উপর প্রচণ্ড এক ঘুসি খেয়ে 'হুঁক্' করে উঠল। সামলে ওঠার আগেই দড়াম করে এক রদ্দা মারল রানা ওর গণ্ডারের মত মোটা ঘাড়ে। পরমুহূর্তে হাঁটু দিয়ে মারল তলপেটে। ধড়াস করে পড়ল কলাগাছ। এদিক ওদিক চাইল রানা। টেনে নিয়ে এল জ্ঞানহীন দেহটা আলোয়। মন্দিরের গায়ে প্রকাণ্ড একটা পাথরের বুদ্ধমূর্তি—সেটার পায়ের কাছে প্রণামের ভঙ্গিতে উপুড় করে বসিয়ে দিল সে মোটাকে। বসে রইল মোটা, ভক্তি গদগদ ভঙ্গিতে ঘোঁৎ ঘোঁৎ নাক ডাকছে ওর।

লম্বা পা ফেলে এগোল রানা। বাঁকটা ঘুরতেই ধাক্কা খেলো সে নরম কিছুর সাথে। শ্যাম্পুর মিষ্টি গন্ধ। সরে দাঁড়াল অ্যাংলো-বার্মিজ মেয়েটা। পরনে দামী স্কার্ট, হাইহিল জুতো, হাতে গুই সাপের চামড়ার দামী ভ্যানিটি ব্যাগ, ধবধবে ফর্সা গায়ের রঙ, লম্বা সুগঠিত শরীর, পাঁচ ফুট চার, চেহারায় এদেশীর চেয়ে বিদেশী ভাবটাই বেশি—এক কথায় সুন্দরী।

'এক্সকিউজ মি, ম্যাডাম। ব্যথা পেয়েছেন?'

'নো, ইট্স্ অল রাইট।' ভদ্রতা রক্ষা করল মেয়েটা বামহাতে ডান কাঁধটা ডলতে ডলতে। মোটা লোকটাকে দেখল একবার ঘাড় ফিরিয়ে।

চলে যাচ্ছিল রানা, পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করল মেয়েটা।

'বেড়াতে এসেছেন বুঝি? রেঙ্গুনে এই প্রথম?'

'হ্যাঁ।'

'আমার নাম সোফিয়া। রেঙ্গুন ইউনিভার্সিটিতে পড়ি।'

'আমি আব্বাস মির্জা। বাংলাদেশ থেকে এসেছি।'

'কবে এসেছেন?'

'আজই।'

'শ্যু ড্যাগন প্যাগোডা দিয়েই শুরু করলেন বুঝি? চলুন আপনাকে আরও কয়েকটা দর্শনীয় জিনিস দেখিয়ে আনি।'

অবাক হলো রানা। থেমে দাঁড়াল। 'আপনি কষ্ট করতে যাবেন কেন?'

'কষ্ট কিসের? ইট্স প্লেযার। ভয় নেই, প্রফেশনাল গাইড নই, টাকা চাইব না।'

রানার বাহুতে হাত রেখে মিষ্টি করে হাসল মেয়েটা।

ভড়কে গেল রানা।

'অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আজকে আমার একটু ব্যস্ততা আছে। আর কোনদিন...' এগোল রানা।

'ঠিক আছে, চলুন, ফিরবার পথে লেক ভিক্টোরিয়াটা দেখিয়ে দিই। ওই লেকের ধারেই আমাদের ইউনিভার্সিটি, লেডিজ হোস্টেলও। একটা লিফ্ট দিতে আপত্তি নেই তো?'

'যদি কিছু মনে না করেন...'

বাধা দিল মেয়েটা রানার কথায়। 'প্লীজ! আপনার সাথে কথা আছে।

ডেসপারেটলি আর্জেন্ট, অ্যান্ড ইম্পর্ট্যান্ট।' খামচে ধরল মেয়েটা রানার কোটের হাতা।

'কি কথা, বলুন।' ক্রমেই সজাগ হয়ে যাচ্ছে রানা ভেতরে ভেতরে।

'নিরালা জায়গা ছাড়া বলা যাবে না।' কাছ ঘেঁষে এল মেয়েটা। 'এত লোকের মধ্যে বলা যায় না সেকথা।'

আঙুল তুলে দামী স্যুট পরা স্মার্ট চেহারার একজন যুবককে দেখাল রানা। 'ওই ভদ্রলোককে যেখানে খুশি নিয়ে গিয়ে বলুন আপনার গোপন কথা। আমি দুঃখিত।'

এতটা কড়া কথা বলতে চায়নি রানা আসলে, হঠাৎ মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। ছিটকে সরে গেল মেয়েটা। প্রথমে ফ্যাকাসে হয়ে গেল, তারপর লাল হয়ে উঠল গালদুটো অপমানে। ওর ক্ষুব্ধ, আহত দৃষ্টি ভর্ৎসনা করল রানাকে। তারপর একটা কথাও না বলে চলে গেল পেছন ফিরে।

ট্যাক্সিতে উঠে বসল রানা। বলল, 'নানকিং হোটেল।'

চার

সোফিয়া মেয়েটার সাথে দুর্ব্যবহার করে মনটা খচ খচ করছে রানার। কথাটা শুনেই যেরকম কুঁকড়ে গেল, ফ্যাকাসে হয়ে গেল, সেটা অভিনয় হতেই পারে না। মেয়েটা কল-গার্ল নয়, এটুকু লিখে দিতে পারে রানা। কিন্তু তাহলে কি? বার্মার মেয়েরা বহুকাল থেকেই পুরুষের সমান অধিকার ভোগ করে আসছে, জানে রানা। এ মেয়েটার গায়ে পড়া ভাবটা কি অতিমাত্রায় স্ত্রী-স্বাধীনতার বহিঃপ্রকাশ?

দুত্তোর বলে উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করল রানা মেয়েটার চিন্তা, কিন্তু বার বার ঘুরে ফিরে আসছে চিন্তাটা। কি যেন বলতে চেয়েছিল মেয়েটা। কি সেটা? রানার বর্তমান কাজের সাথে জড়িত কিছু? বুদ্ধমূর্তির পায়ের কাছে প্রণামরত মোটা লোকটার দিকে যেভাবে চেয়েছিল, তাতে রানার মনে হয়েছিল জানে মেয়েটা—পরিষ্কার দেখতে পেয়েছে মারামারির দৃশ্যটা। কিন্তু তাহলে চিৎকার বা হৈ-চৈ না করে রানাকে নিরালা কোথাও নিয়ে যাবার চেষ্টা করবে কেন? উ-সেনের দলের মেয়ে? আর একটু খোঁজ-খবর নেয়া উচিত ছিল মেয়েটা সম্পর্কে।

নানকিং হোটেলের সামনে ট্যাক্সি থামতেই গাড়ির দরজা খুলে ধরল উর্দি পরা দারোয়ান। ট্যাক্সি ভাড়া মিটিয়ে ঢুকে পড়ল রানা হোটেল লাউঞ্জে। একটা কাচের দরজার ওপাশে দেখা যাচ্ছে হোটেলের পিছনের উজ্জ্বল আলোকিত মনোরম বাগান। বিভিন্ন ধরনের দেশী-বিদেশী ফুলের বেড, লাল-নীল-সবুজ বাতি দিয়ে সাজানো। মাঝে মাঝে কাঁধ সমান ঝাউ গাছ। বাগানের ফাঁকে ফাঁকে সুন্দর, সুরুচিপূর্ণভাবে সাজানো রয়েছে টেবিল চেয়ার।

বেশ ভিড়। অত্যুজ্জ্বল আলোয় আলোকিত সুইমিং পুলের কাছাকাছি কমবয়েসী বোম্বেটে ছেলেপিলেদের ভিড়।

ফটো ইলেকট্রিক সেলে পরিচালিত প্রকাণ্ড কাচের দরজা খুলে গেল রানা এগোতেই। চমৎকার দখিনা হাওয়া। স্যুইমিং পুলে জনাকয়েক উদ্ভিন্নযৌবনা সুন্দরী, জনাদুয়েক বয়স্ক পুরুষ ডাইভ দিচ্ছে, সাঁতার কাটছে। যতটা সম্ভব নির্জন জায়গায় বসে পড়ল রানা একটা খালি টেবিলে। বেয়ারা এসে দাঁড়াতেই অর্ডার দিল একটা ডাবল হুইস্কির। সালাম জানিয়ে চলে গেল বেয়ারা। চারদিকে চাইল রানা। একটা পরিচিত মুখও চোখে পড়ল না।

দ্বিতীয় দফা হুইস্কি এল, কিন্তু মিস্টার বা মিসেস সরোজ গুপ্ত এল না। অপেক্ষা করছে রানা। কিছুক্ষণ আগে একটা ইনভ্যালিড চেয়ার ঠেলে এক মহিলাকে এদিকে আসতে দেখে একটু আশান্বিত হয়েছিল, কিন্তু কাছে আসতে দেখা গেল ইনভ্যালিড চেয়ারে শুয়ে আছে এক দাড়িঅলা বুড়ো, চেয়ারটা ঠেলছে অপূর্ব সুন্দরী এক থাই রমণী। চলে গেল পাশ কাটিয়ে। প্রায় পৌনে ন'টা বাজে, আর অপেক্ষা করা যায় না, ডিনার সেরে উঠে পড়বে ঠিক করল রানা। নিশ্চয়ই কিছু গোলমাল হয়েছে। স্যুট, লাল টাই পরেছে রানা, রুমালটা অর্ধেক বের করে রেখেছে বুকপকেটে, কোটের বাটনহোলে একটা হলুদ বাটন ফ্লাওয়ার–চিনতে না পারার কোন কারণ নেই।

বেয়ারা ডাকতে যাবে, এমন সময় চমকে উঠল রানা। পেছন থেকে এসে টেবিলের গায়ে ধাক্কা দিয়েছে ইনভ্যালিড চেয়ারটা, উল্টে পড়ে গেছে আধগ্লাস হুইস্কি।

'ওহ্, আই অ্যাম ভেরি সরি। প্লীজ এক্সকিউজ মি। আই মাস্ট বাই ইউ অ্যানাদার ড্রিঙ্ক।'

রানা বলল, 'ওহ্, নো, দ্যাটস্ অলরাইট।' গলা চড়িয়ে ডাক দিল, 'বয়।'

বয় ছুটে এল। রানা কিছু বলবার আগেই থাই মহিলা রানার জন্যে হুইস্কির অর্ডার দিল। ব্যস্তসমস্ত ভঙ্গিতে টেবিল পরিষ্কার করে চলে গেল বেয়ারা। লজ্জিত হাসি হাসল মহিলা।

'কিছু মনে করবেন না, দেখতে পাইনি। আপনি কি বাঙালী?'

'হ্যাঁ। আপনি?'

'আমি মিসেস গুপ্ত। ইনি আমার হাসব্যান্ড, মিস্টার সরোজ গুপ্ত। আমি থাই, উনি বাঙালী।'

'আমার নাম আব্বাস মির্জা। গ্লাড টু মিট ইউ।' স্বস্তি ফুটে উঠল রানার মুখে। 'বসুন না, আপনাদের জন্যে কিছু অর্ডার দিই?' ঘুম ঘুম ভঙ্গিতে চেয়ে রয়েছে সরোজ গুপ্ত, কোন উত্তর না দিয়ে মাথা নাড়ল। প্রশ্নের জবাব দিল মিসেস গুপ্ত।

'ধন্যবাদ। ডিনারের সময় হয়েছে, তার আগে আমরা ড্রিঙ্ক করব না।'

'বেশ তো, আসুন না, একসাথেই ডিনার খাওয়া যাক?'

'সরোজ অসুস্থ। হোটেল কামরাতেই ডিনার সারে ও। অর্ডার দেয়া

আছে, এতক্ষণে হয়তো পৌঁছে গেছে ওর খাবার। তাছাড়া ঘরে ফিরবার সময় হয়েছে ওর। ওকে রেখে এসে আমি আপনাকে সঙ্গ দিতে পারি।'

'তাহলে চমৎকার হয়। কি অসুখ ওঁর?'

'আরথ্রাইটিস। এই চেয়ার ছাড়া চলতে পারে না এক পা-ও।'

'খুবই দুঃখের কথা। কতদিন ধরে এরকম?'

'বছরখানেক ধরে। বিয়ের তিন মাসের মধ্যেই।'

'কপাল খারাপ। এর কোন চিকিৎসা নেই?'

'একমাত্র চিকিৎসা হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে বিশ্রাম। কিন্তু এই জিনিসটা ওর ধাতের বাইরে। ব্যবসার কাজে আজ এ শহর, কাল ও শহর, ছোটাছুটির বিরাম নেই। আপনি একটু বসুন, আমি ওকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসছি।'

'আপনার কোন অসুবিধে নেই তো?' সরোজ গুপ্তের দিকে ফিরল রানা। 'মানে, আপনার স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে খাওয়া-দাওয়ার...'

'না না। কোন অসুবিধে নেই।' অমায়িক হাসি হাসল মিস্টার গুপ্ত। 'বহুদিন পর বাংলা ভাষায় কথা বলবার সুযোগ পেয়েও সেটা হারাতে হচ্ছে বলে আমি খুবই দুঃখিত। আছেন কদিন? সম্ভব হলে আসবেন এর মধ্যে। গল্প করা যাবে।'

চলে গেল মিসেস গুপ্ত ইনভ্যালিড চেয়ার ঠেলে নিয়ে। দুজনের জন্য ডিনারের অর্ডার দিল রানা। সাত কোর্সের ইংলিশ ডিনার। একটা সিগারেট ধরিয়ে গ্লাসে চুমুক দিল। মিনিট পাঁচেক পরেই ফিরে এল মিসেস গুপ্ত। ঠোঁটে লিপস্টিক।

খেতে খেতে গল্প চলল। ভদ্র দূরত্বের ভাবটা খসে গেল অল্পক্ষণেই। মহিলা খুবই আলাপী।

'জরুরী খবর দিয়ে আনানো হয়েছে আমাদের মান্দালয় থেকে। জানানো হয়েছে, বিশেষ কাজে এসেছেন আপনি ব্যাংকক থেকে, কাজ সারার পর গোপনে এদেশ থেকে বেরিয়ে যাবার ব্যাপারে সাহায্য করতে হবে আমাদের। সবরকমের সহযোগিতা দিতে হবে আপনাকে।' হাসল মিসেস গুপ্ত। 'কি ধরনের সহযোগিতার জন্যে প্রস্তুত থাকব আমরা কিছু ধারণা দিতে পারবেন?'

'আমি নিজেই জানি না এখনও।'

মাথা নাড়ল মিসেস গুপ্ত। 'কবে নাগাদ সাহায্যের প্রয়োজন পড়বে জানাতে আপত্তি আছে?'

'সেটাও আমার জানা নেই। যে কোন দিন যে কোন সময়ে প্রয়োজন পড়তে পারে। আদৌ প্রয়োজন না-ও পড়তে পারে। তবে প্রয়োজনের সময় আমাকে ঠিক কি করতে হবে জানিয়ে রাখলে সুবিধে হবে আমার।'

'দিনের বেলা আমরা কোন সাহায্য করতে পারব না। যে কোনদিন রাত আটটার পরে এলে আমাদের স্যুইটের দরজা খোলা পাবেন। স্যুইট নম্বর ৫৮০। সোজা ঢুকে পড়বেন আমাদের ঘরে। করিডরে লোক থাকলে অবশ্য না ঢোকাই ভাল, খানিক ঘুরে ফিরে আবার ট্রাই নেবেন। একবার আমাদের

ঘরে পৌঁছুতে পারলে আর কোন চিন্তা নেই, নিরাপদে পৌঁছে যাবেন ব্যাংকক।'

ব্যাপারটা মনে মনে নাড়াচাড়া করে দেখল রানা এক মিনিট। তারপর বলল, 'কিভাবে পাচার করছেন আমাকে?'

'আপনি পৌঁছানোর সাথে সাথেই মেক-আপ করে চেহারা পাল্টে দেব আমি আপনার, সরোজের চেয়ারটা দখল করবেন আপনি, ব্যস, বাকি কাজটুকু সহজ। শরীর খারাপের অজুহাতে আপনাকে নিয়ে চলে যাব আমি ব্যাংককে সরোজ গুপ্ত হিসেবে। আমরা এত বেশি ট্রাভেল করি যে সবাই চেনে আমাদের।' হাসল আবার। 'সরোজের স্বভাবচরিত্র আর বদমেজাজ সম্পর্কে সবাই ওয়াকেফহাল।'

'খুবই রিস্কি মনে হচ্ছে আমার কাছে ব্যাপারটা।'

'মোটেও না। অন্তত এক ডজন ভারতীয় স্পাইকে পার করেছি আমি এভাবে। আপনাকে নিয়ে হবে তেরো জন।'

'আনলাকি থারটিন। যাই হোক, আমি ভারতীয় স্পাই, একথা জানলেন কি করে?'

'আমরা ভারতীয় এজেন্ট। নিশ্চয়ই চাইনিজ স্পাইকে পার করতে বলবে না আমাদের ভারত সরকার। সহজ ইনফারেন্স। যাই হোক, কি এমন গোপন কাজে এসেছেন বলুন তো, যেজন্যে ছদ্মবেশে পালাতে হবে আপনাকে রেঙ্গুন থেকে।'

'তার আগে বলুন দেখি সরোজ বাবুর চেয়ারটা আমি দখল করে নিলে বেচারার কি দশা হবে?'

'ও চলে যাবে হোটেল ছেড়ে।'

'কিভাবে?'

'সোজা পায়ে হেঁটে। আসলে কোন অসুখ নেই ওর, তাছাড়া বুড়োও না ও। আপনারই সমবয়সী। দাড়ি চেঁছে ফেললেই সম্পূর্ণ অন্য মানুষ হয়ে যাবে ও। গটমট করে হেঁটে বেরিয়ে যাবে হোটেল থেকে। কেউ সন্দেহ করতে পারবে না।'

এই ব্যবস্থায় মোটেই খুশি হতে পারল না রানা। চুপচাপ খাওয়া সারল ও। টুকিটাকি দু'চারটে কথা হলো। সবশেষে বলল রানা মনের কথাটা।

'আমার যতদূর ধারণা, এই ধরনের কৌশল একবার বা দু'বার করা চলে নিরাপদে। বেশিবার রিপিটিশন হলে কারও না কারও চোখে ধরা পড়ে যায়, এবং তারা এই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে, সময়-বিশেষে ব্ল্যাকমেইল করতেও ছাড়ে না।' সরাসরি চাইল রানা মিসেস গুপ্তের চোখের দিকে। 'আপনাকে ভাগ্যবতী বলতে হবে, কারও চোখে পড়েননি আজ পর্যন্ত। মাফ করবেন, আমি আপনাদের এই ছেলেমানুষী খেলা দেখে নিরাশ হচ্ছি। আরও ভাল কোন প্ল্যান আশা করেছিলাম আমি। যাই হোক, আপনাদের উপর নির্ভর না করে উপায় নেই আমার, খুব সম্ভব আসছি আমি দু'একদিনের

মধ্যেই। অনুমতি করুন, এবার তাহলে উঠি আমি?'

'কোথায় উঠেছেন রেঙ্গুনে?'

'সব কথা আজ বলে ফেললে ব্যাংকক যাওয়ার পথে আর গল্প পাব না। কোথায় ছিলাম, কি কাজে এসেছিলাম, কিভাবে কাজটা করলাম তার রোমহর্ষক বর্ণনা দেব আপনাকে ফিরতি পথে। কথা দিলাম। বাই দা ওয়ে, ওই যে স্কার্ট পরা মেয়েটা বসে আছে, খুব সম্ভব অ্যাংলো-বার্মিজ, চেনেন ওকে?'

রানার চোখের ইঙ্গিত অনুসরণ করে দেখল মিসেস গুপ্ত সোফিয়াকে। একটা ঝাউ গাছের আড়ালে বসে আছে মেয়েটা, একা।

'না তো! এনি ট্রাবল্?'

'না না, কোন ট্রাবল্ নেই। কিন্তু এখন উঠে পড়াই উচিত। বেয়ারা... ।'

উঠে পড়ল সোফিয়াও। বেশ কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে চলল রানার পিছু পিছু। গেট দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে রানা। এগোতে গিয়েও থেমে গেল সোফিয়া। হোটেলে ঢুকছিল দু'জন লোক, রানাকে ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা এসে থমকে দাঁড়াল একজন। পেছন ফিরে দেখল রানাকে। সঙ্গীকে থামিয়ে বলল, 'আরে! দ্যাখ তো, এই লোকটার ইয়টই না কাল রাতে সার্চ করলাম আমরা?'

রানাকে দেখা যাচ্ছে দরজার কাচের মধ্যে দিয়ে, ঋজু ভঙ্গিতে হেঁটে যাচ্ছে লম্বা পা ফেলে।

'তাই তো!' উত্তর দিল সঙ্গী। 'এই ব্যাটা, এখানে কি করছিস? আগামীকাল আটটার আগে ইয়ট ছেড়ে কোথাও যাওয়া ওর নিষেধ। আশ্চর্য!'

'শোন। ঘাপলা আছে মনে হচ্ছে। আমি পিছু নিচ্ছি শালার, তুই খোঁজ নিয়ে দ্যাখ কার সাথে দেখা করতে এসেছিল ব্যাটা। আমি আধঘণ্টার মধ্যে না ফিরলে খবর দিবি ইয়েন ফ্যাঙকে।'

বেরিয়ে গেল লোকটা।

পিছু পিছু বেরিয়ে এল সোফিয়া হোটেল থেকে।

বটগাছতলায় পৌঁছে রশি খুলে নৌকোয় উঠে বসল রানা। দ্রুত হাতে কাপড় বদলাল, তারপর বৈঠা তুলে নিল। দু'ঘণ্টা পার হতে আর পাঁচ মিনিট বাকি। নিশ্চয়ই অস্থির হয়ে উঠেছে এতক্ষণে বিউটি কুইন।

অতি সন্তর্পণে বটগাছতলায় এসে দাঁড়াল রানার দ্বিতীয় অনুসরণকারী। দেখল রানার বেশ পরিবর্তন। মুচকে হাসল। কি করা উচিত ভাবল কিছুক্ষণ। স্থির করল, লোকটা যে গোপনে ইয়ট ছেড়ে শহরে এসেছিল, এই কথার সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকলে পরে বেমালুম অস্বীকার করবে ব্যাটা। কাজেই ওকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে ধরা পড়ে গেছে ও। অন্তত কয়েকটা কথা বলতে হবে ওকে এক্ষুণি।

পকেট থেকে রিভলভার বের করল লোকটা। নিজের অজান্তেই মস্তবড় ভুল করল সে। অভ্যাসবশে রিভলভারটা তাক করল রানার দিকে।

পিছনে মৃদু খসখস আওয়াজ। শিরশির করে উঠল ওর শিরদাঁড়ার ভেতরটা। কেন যেন মনে হলো পিছনে ফিরে লাভ নেই, চরম ক্ষণ উপস্থিত হয়েছে। ভয়ানক ভয় পেয়ে ককিয়ে উঠতে চাইল সে, আওয়াজ বেরোল না গলা দিয়ে। বরফের মত জমে গিয়েছে সে। স্পষ্ট বুঝতে পারছে, ঠিক পেছনেই, দুই ফুট দূরত্বে এসে দাঁড়িয়েছে ওর মৃত্যু। সচকিত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে করল পানিতে, ইয়টের ওই লোকটাকে ডাক দিয়ে সাহায্য চাইতে ইচ্ছে করল, কিন্তু কিছুই করতে পারল না সে। কিছু করবার আগেই তীক্ষ্ণ একটা ব্যথা অনুভব করল সে পিঠের কাছে। মুহূর্তে লোপ পেল ওর সমস্ত চেতনা, যেন হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ বয়ে গেল শরীরে। পরমুহূর্তে দেখতে পাচ্ছে সে আবার। বৈঠা বেয়ে চলে যাচ্ছে আব্বাস মির্জা। চিৎকার করে ডাকতে চেষ্টা করল সে রানাকে, ঘড় ঘড় আওয়াজ বেরোল শুধু। রক্ত বেরিয়ে এল নাক মুখ দিয়ে। স্পষ্ট বুঝতে পারল সে, মারা যাচ্ছে, কেউ বাঁচাতে পারবে না আর ওকে। ডুবে যাচ্ছে, তলিয়ে যাচ্ছে সে ক্রমেই। হুড়মুড় করে পড়ে গেল সে একটা ভেলার উপর। দপ করে নিবে গেল পৃথিবীর সব আলো। এখন শুধু নিকষ কালো অন্ধকার।

নিঃশব্দে ভিড়ল বোটটা ইয়টের গায়ে। চট করে অ্যাংকর-চেনের সাথে বেঁধেই উঠে পড়ল রানা ভাঁজ করা কাপড়ের প্যাকেটটা হাতে নিয়ে।

কেবিনের দরজার ফাঁক দিয়ে আলো দেখতে পেল রানা এক চিলতে। ধড়াস করে উঠল ওর বুকটা। খুলল কি করে! ভাগল নাকি মেয়েটা? কেন? কিভাবে?

কেবিনটা নিজহাতে চাবি মেরে রেখে গেছে রানা।

দরজার পাশে এসে দাঁড়াল রানা নিঃশব্দ পায়ে। চোখ রাখল দরজার ফাঁকে। না, পালায়নি। শুয়ে আছে বিউটি কুইন।

সরে গেল রানা দরজার সামনে থেকে। তন্নতন্ন করে খুঁজল পুরো ইয়টটা। কেউ নেই আর। রাইডিং লাইটটা নিবিয়ে দিতেই ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে গেল গোটা ইয়ট। কেবিনের দরজার ফাঁকে শুধু এক চিলতে আলো। আবার এসে দাঁড়াল রানা। কান পেতে দাঁড়িয়ে রইল আধমিনিট, তারপর একটানে দরজা খুলে লাফিয়ে ঢুকল ঘরের ভেতর। না। কেউ নেই আর।

দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে বিছানার ধারে এসে দাঁড়াল রানা।

জ্বলন্ত চুরুট ঠেসে ধরা হয়েছিল মেয়েটার বুকে, গালে, তলপেটে, কপালে। কথা আদায় করার চেষ্টা করেছিল কেউ—এমন কোন কথা, যা ঘুণাক্ষরে জানা ছিল না বেচারীর। রানার কানে স্পষ্ট ভেসে উঠল মেয়েটার কণ্ঠস্বর: ইউ কাম ব্যাক, দেন লাভ মি। নো ডিজিজ। ইউ এঞ্জয় সাহিব, প্রমিজ। আই নো বেগার, ইউ লাভ মি আফটার কাম ব্যাক।

মনে হচ্ছে ঘুমিয়ে আছে মেয়েটা। বাচ্চা মেয়ের মত বেঘোরে ঘুমোচ্ছে

ব্যাগটা আঁকড়ে ধরে।

রানা জানে, কোনদিন ভাঙবে না এ ঘুম। কপাল ফুটো করে ঢুকে গেছে একটা বুলেট।

মারা গেছে বিউটি কুইন।

পাঁচ

হ্যান্ডব্যাগে মেয়েলি টুকিটাকি জিনিস আর রানার দেয়া পঞ্চাশ টাকার নোটটা ছাড়া কিছুই নেই। মেয়েটি সম্পর্কে জানা গেল না কিছুই। গায়ে হাত দিয়ে টের পেল রানা, ঘণ্টাখানেক আগে মারা গেছে মেয়েটা, রিগর মর্টিস শুরু হতে দেরি আছে, কিন্তু শরীরটা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে।

রানার স্যুটকেস, ডেস্কের ড্রয়ারে যত কাগজপত্র, বিছানার তলা, এবং মেঝেতে বিছানো কার্পেটের তলা তন্নতন্ন করে সার্চ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে বিশেষ মাথা ঘামাল না সে। হাজার খুঁজেও কিছুই পাওয়া যাবে না, জানে রানা। কিন্তু আপত্তিকর কিছু রেখেও তো যেতে পারে রানাকে বিপদে ফেলার জন্যে?

কেবিনের প্রত্যেকটা জিনিস পরীক্ষা করল রানা সুশৃঙ্খলভাবে। না। কিছুই প্ল্যান্ট করে রেখে যায়নি আততায়ী। একটা চুরুটের টুকরো পাওয়া গেল শুধু ঘরের কোণে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে বসে পড়ল রানা খাটের কিনারে।

কেন হত্যা করা হলো এই অসহায় মেয়েটিকে? কারা করল কাজটা?

প্রশ্ন করা হয়েছিল মেয়েটাকে। কি প্রশ্ন? আব্বাস মির্জার আসল পরিচয় কি? কোথায় গিয়েছে সে? সে যখন আব্বাস মির্জাকে ছদ্মবেশে ওর বোটে করে শহরে যেতে দিয়েছে, তখন কিছু জানি না বললে চলবে না, নিশ্চয়ই সব জানে সে। আগে থেকে প্ল্যান করা ছিল সবকিছু।

বুদ্ধমূর্তির পায়ের কাছে যে মোটা লোকটাকে বসিয়ে রেখেছিল রানা, কাজটা তারও হতে পারে। জ্ঞান ফিরে পেয়ে হয়তো সোজা চলে এসেছে এই ইয়টে, রানাকে না পেয়ে প্রতিশোধ নিয়ে গেছে এই মেয়েটির উপর। রানাকে হারিয়ে ফেলেছে সে, এই অপরাধ ঢাকবার জন্যেও করতে পারে কাজটা।

ছদ্মবেশ ধারণ করে ওদের ফাঁকি দিতে পারেনি রানা, তার মানে নিশ্চয়ই আশেপাশের কোন জাহাজ থেকে ইনফ্রা-রেড লেন্স লাগানো বিনকিউলার চোখে লাগিয়ে নজর রাখা হয়েছিল ওর উপর। রানাকে ইয়ট ছেড়ে যেতে দেখেছে ওরা, ফিরে আসতেও দেখেছে।

আচ্ছা! ওকে পুলিসের ঝামেলায় ফেলবার কৌশল নয়তো এটা?

কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করল রানা কথাটা নিয়ে, তারপর বাদ দিয়ে দিল সম্ভাবনাটা। আর যাই হোক ওকে পুলিসী ঝামেলায় ফেলবে না উ-সেনের দল। এর মধ্যে আবার তৃতীয় কোন দল নেই তো? সোফিয়া মেয়েটা কে? যতদূর মনে হয় উ-সেনের দলের নয়, হলে সামান্য কথায় ওর চেহারা ফ্যাকাসে করে দেয়া সম্ভব হত না রানার পক্ষে। কাজটা কি মেয়েটার দলের লোকের? বোঝা যাচ্ছে না। তবে এমন কারও, রানার সত্যিকার পরিচয় জানা যাদের জন্যে অত্যন্ত জরুরী।

যাক, আগের কাজ আগে।

উঠে পড়ল রানা। দড়ি খুলে ছেড়ে দিল নৌকোটা। জোরে একটা ঠেলা দিল পা দিয়ে। অন্ধকারের বুকে মিলিয়ে গেল সেটা স্রোতের টানে।

এইবার মেয়েটাকে বিদায় করতে হবে, তারপর প্রস্তুত থাকতে হবে আক্রমণ ঠেকাবার জন্যে। রানা জানে আক্রমণ আসবেই। ইয়ট ছেড়ে শহরে যাবার কারণ জানতেই হবে ওদের। অবলীলায় তুলে নিল রানা মেয়েটিকে পাঁজাকোলা করে। বিছানার চাদরে রক্তের ছোপ দেখতে পেল সে। লাল থকথকে রক্ত। হঠাৎ ভয়ঙ্কর একটা আক্রোশ ফুঁসে উঠল রানার বুকের ভেতর। দপ দপ করছে মাথার মধ্যে শিরাগুলো। বুকের ভিতর প্রচণ্ড গর্জন করে উঠল যেন একসাথে চারটে ক্রুদ্ধ বাঘ। দাঁতে দাঁত চেপে চোয়াল ব্যথা হয়ে গেল ওর। নিজেকে ধরে রাখতে পারছে না নিজের মধ্যে। অনেক কষ্টে সামলে নিল রানা। প্রচণ্ড আক্রোশটা রূপ নিল শীতল এক ভয়ঙ্কর হিংস্রতায়। দৃঢ়পায়ে চলে এল রানা ইয়টের পিছন দিকটায়। লাইফবোটের পাশে মৃতদেহটা শুইয়ে দিয়ে ব্লাউজ আর সারং খুলে ফেলল। দ্রুতহাতে কাপড় পরাল সে মৃতদেহে। তারপর হাত ধরে নামিয়ে দিল নিচে, আওয়াজ না করে যতটা সম্ভব আস্তে ছেড়ে দিল হাত দুটো। ছোট্ট একটা ছপাৎ শব্দ করে তলিয়ে গেল শরীরটা খাড়াভাবে। কোথাও বেধে না গেলে খুব সম্ভব একুশ মাইল দূরে গাল্‌ফ্‌ অফ মার্তাবানে ভেসে উঠবে লাশটা আগামীকাল।

লাশটা নামাতে গিয়ে ডেকের কিনারে শুয়ে পড়তে হয়েছিল রানাকে। কান পেতে শুয়ে রইল সে আরও এক মিনিট। ইয়টের গায়ে ছোট ছোট ঢেউয়ের মৃদু চাপড়ের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। এবার চাদরের রক্ত ধুয়ে ফেললেই সমস্ত প্রমাণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। উঠতে যাচ্ছিল রানা, হঠাৎ স্থির হয়ে গেল।

আসছে। অস্পষ্ট একটা কুল কুল শব্দ কানে এসেছে রানার। সাঁতার কেটে আসছে কেউ। হাত দশেক দূরে আছে এখনও, কিন্তু শুনতে ভুল হয়নি রানার। এইদিকেই আসছে।

ক্রূর এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল রানার ঠোঁটে। নিঃশব্দে সরে গেল সে লাইফবোটের আড়ালে। আসুক। দুটো মৃতদেহ চলে যাবে একই জায়গায়। জুতোর গোড়ালি থেকে ছোট্ট ছুরিটা চলে এল রানার ডানহাতে।

ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে রানা। দড়ি বেয়ে উঠে আসছে লোকটা। আবছামত দেখা যাচ্ছে মাথা আর কাঁধ। দুই হাতে ভর দিয়ে উঠে

এল। দাঁতে চেপে ধরা ছুরিটা হাতে নিল, তারপর রেলিং টপকে চলে এল এপাশে। কয়েক পা সরে এল লোকটা ঘন অন্ধকারের দিকে, রানার হাতের নাগালের মধ্যে। ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ। ডেকের উপর টুপটাপ পানি পড়ছে গা থেকে ঝরে, ছিটে আসছে রানার চোখেমুখে।

লাফ দিল রানা।

আঁতকে উঠল লোকটা। ঝট করে ফিরল রানার দিকে। ডান হাতটা উঠে গেল মাথার উপর। বামহাতে জুডো চপ মারল রানা লোকটার কবজি থেকে আট ইঞ্চি উপরে। ছিটকে পড়ে গেল ছুরিটা হাত থেকে খসে। ডেকের উপর খট খট শব্দ তুলে চলে গেল সেটা হাত দশেক দূরে।

ঝট করে সেঁটে গেল রানা লোকটার গায়ের সাথে। বামহাতে পেঁচিয়ে ধরে টানল সামনে, ডানহাতে ধরা ছুরিটার দিকে। নিঃশব্দে সারতে হবে কাজটা। চার ইঞ্চি ব্লেডের ছোট্ট ছুরিটা ঢুকিয়ে দিচ্ছিল রানা লোকটার হৃৎপিণ্ড বরাবর, সেকেন্ডের দশ ভাগের একভাগ সময় লাগবে আর লোকটার ঢলে পড়তে, অন্তিম চিৎকারটা আটকে দেবে রানা ঠিক সময়মত মুখে হাত চেপে। কিন্তু থমকে গেল সে। চট করে সরিয়ে আনল ছুরি ধরা হাতটা।

বুদ্ধি দিয়ে বুঝে ওঠার আগেই রানার শরীর টের পেয়ে গেছে, কিছু একটা গোলমাল আছে। ওর বামহাত চেপে বসেছে একটা নরম স্তনের উপর, দ্বিতীয় স্তন চ্যাপ্টা হয়ে গেছে ওর শক্ত পেশীবহুল বুকের চাপে, হালকা একটা শ্যাম্পুর পরিচিত গন্ধ এসেছে রানার নাকে।

মেয়ে। নগ্ন একটা মেয়ে। শুধু জাঙ্গিয়া পরা।

পরমুহূর্তে চিনতে পারল রানা–সোফিয়া। এঁকেবেঁকে ছটফট করছে, রানার বজ্র আলিঙ্গন থেকে বেরোবার চেষ্টা করছে। কামড় দিল রানার হাতে। একহাতে কিল মারছে রানার পিঠে।

ছুরিটা আলগোছে ভাঁজ করে রেখে দিয়েছে রানা জুতোর গোড়ালিতে। ডানহাতে মুচড়ে ধরল সে মেয়েটার হাত। কানের কাছে মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কাকে খুন করতে এসেছিলে? আমাকে?'

মুহূর্তে আড়ষ্ট হয়ে গেল মেয়েটা। বলল, 'ওহ্ আপনি! আমি ভেবেছিলাম ওদের হাতে পড়েছি। ছেড়ে দিন, কথা আছে আপনার সাথে। জলদি। প্লীজ, বোকামি করবেন না, আমি শত্রু নই, ফ্রেন্ড।' ধস্তাধস্তি বন্ধ হয়ে গেছে মেয়েটার।

'সে তো বুঝতেই পারছি। একেবারে বুযম-ফ্রেন্ড। পিছু পিছু ধাওয়া করে বেড়াচ্ছ কি মতলবে?' হাত ছেড়ে দিল রানা। 'ছুরি হাতে নিঃশব্দে ইয়টে উঠেছ কোন কথা বলতে? মৃত্যুর?'

'আপনি জানেন না, কিছুক্ষণ আগেই আমি আপনার প্রাণ বাঁচিয়েছি।'

'তাই নাকি? কিভাবে?'

'নানকিং হোটেলের গেট থেকে আপনার পিছু পিছু লোক এসেছিল বটগাছ পর্যন্ত, রিভলভার বের করেছিল গুলি করবার জন্যে। ঠিক যখন

নিশানা করছে, পিছন থেকে ছুরি মেরেছি আমি ওকে।'

'আশ্চর্য!' অবাক হলো রানা মেয়েটার নির্বিকার বক্তব্য শুনে। 'কোথায় সে লোকটা?'

'পড়ে আছে একটা কাঠের ভেলার ওপর।'

'কেন করতে গেলে কাজটা?'

'আপনাকে মেরে ফেললে আমাকে সাহায্য করবার আর কেউ থাকবে না।'

কথাগুলো দুর্বোধ্য ঠেকল রানার কাছে। বুঝল, মেয়েটির কাছ থেকে সব কথা আদায় করতেই হবে। মনে হচ্ছে ওর সম্পর্কে অনেক কিছুই জানে মেয়েটা। কতটা কি জানে জানতেই হবে ওর। বলল, 'চলো কেবিনে গিয়ে শুনব তোমার কথা।'

ডেকের উপর থেকে ছুরিটা তুলে নিতে যাচ্ছিল মেয়েটা, পা দিয়ে সরিয়ে দিল রানা ওটা, নিচু হয়ে ঝুঁকে তুলে নিল নিজে। কেবিনের দরজা বন্ধ করে বাতি জ্বেলে দিল সে।

বিছানার দিকে চেয়ে একটা অস্ফুট ধ্বনি বেরোল মেয়েটার মুখ থেকে। ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে রয়েছে সে রক্তে ভেজা চাদরটার দিকে। বাথরুম থেকে একটা তোয়ালে দিল রানা মেয়েটাকে। রানাকে আড়াল করে গা মুছে ওড়নার মত করে তোয়ালেটা দিয়ে লজ্জা নিবারণ করল।

'এটা কিসের রক্ত বলতে পারো?'

'পারি। মানুষের। বেশ্যা মেয়েটাকে খুন করেছ তুমি।' বিস্ফারিত চোখে চাইল সোফিয়া রানার দিকে। মনে হলো ভয় পেয়েছে।

'তোমারও একই অবস্থা হবে সত্যি কথা না বললে। বসো ওই চেয়ারটায়।' ভয়ে ভয়ে আদেশ পালন করল মেয়েটা। 'এবার বলো, তুমি কি করে জানলে ওটা বেশ্যা মেয়ের রক্ত?'

সোফিয়ার ছুরিটা পরীক্ষা করছে রানা গভীর মনোযোগ দিয়ে। এই ধরনের ছুরি আগে কোথাও দেখেছে রানা, কিন্তু মনে করতে পারল না। ব্যাল্যান্সটা চমৎকার, এটা দিয়ে ইচ্ছে করলে ত্রিশ ফুট দূর থেকেও একটা টিকটিকির মাথা গেঁথে ফেলতে পারবে রানা। ডগাটা বিশেষ এক ঢঙে বাঁকানো। হাতির দাঁতের হাতলের ভিতর যেখানটায় ছুরির ফলা এসে ঢুকেছে, সেইখানে তাজা রক্তের আভাস দেখতে পেল রানা। মেয়েটা সত্যি কথা বলছে কিনা জানা নেই রানার, কিন্তু কিছুক্ষণ আগেই যে এই ছুরি দিয়ে কাউকে আঘাত করা হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই রানার। সোফিয়ার দিকে ফিরল সে, 'কই, উত্তর দিচ্ছ না কেন?'

'আমি দেখেছি মেয়েটাকে এই ইয়টে উঠতে।'

'কি করে দেখলে?'

খানিক ইতস্তত করে নিরুত্তর থাকাই স্থির করল সোফিয়া।

'কি করে দেখলে? আর দেখলেই যদি, বিশ মিনিটের মধ্যে শু্য ড্যাগনে

পৌঁছুলে কি করে? তোমার কথা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না, একটু স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলো।'

'আমি অনুসরণ করেছিলাম আপনাদের।'

'তার মানে আমার পেছনে যে আরেকজন লোক লেগেছে সেটাও জানা ছিল তোমার? শ্যু ড্যাগনের মারামারিটাও দেখেছ তাহলে তুমি?'

মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা।

'কে তুমি? কি চাও আমার কাছে?'

'সব কথা আপনাকে জানাতে আপত্তি নেই আমার, কিন্তু আপনি সঠিক লোক কিনা না জানলে একটি কথাও বলব না। ভুল করবার উপায় নেই আমার। একটু ভুল হয়ে গেলেই সর্বনাশ ঘটে যাবে।' সরাসরি চাইল সে রানার চোখের দিকে। 'আপনি উ-সেনের বন্ধু?'

সতর্ক হয়ে গেল রানা। 'তোমার এ প্রশ্নের কারণ?'

'কয়েকটা কারণ আছে, কিন্তু একটি কারণও ব্যাখ্যা করে বলতে পারব না আপনার সত্যিকার পরিচয় না পেলে।'

'তাহলে তো ভারি অসুবিধে,' বলল রানা। 'আমার সাথে অনেক কথা আছে বলছ, আবার বলছ আমার সত্যিকার পরিচয় না জানলে বলা যাবে না সে কথা—এ দুটোই পরস্পরবিরোধী কথা। আমার পরিচয় না জানলে আমার সাথে কথা থাকতে পারে না তোমার। তাছাড়া আমি উ-সেনের শত্রু কি বন্ধু তোমাকে বলতে যাব কোন্ ভরসায়? তোমার সত্যিকার পরিচয়ও তো জানি না আমি। কাজেই অবস্থাটা চালমাত হয়ে বসে আছে। তুমিও নিশ্চিত না হয়ে মুখ খুলবে না, আমিও না। অতএব, তুমি এবার আসতে পারো। অল্পক্ষণের মধ্যেই লোক এসে পড়বে আমার কাছে, তুমি যদি শত্রুপক্ষের মেয়ে হয়ে থাকো, তাহলে বিপদ হবে আমার।'

মনে মনে পর্যালোচনা করে দেখল মেয়েটা রানার বক্তব্য। খানিক পর মাথা নাড়ল। 'ঠিকই, শুধু শুধু সময় নষ্ট করছি। আপনাকে বিশ্বাস করতে পারলে বড় ভাল হত। বিশ্বাস করতে ইচ্ছেও করছে, কিন্তু আমার সামান্যতম ভুলে কতবড় ক্ষতি হয়ে যাবে আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।'

'সেই ক্ষেত্রে একটা কাজ করা যায়। অনেকটা খেলার মত। আমরা দুজন প্রশ্ন করে যেতে পারি একের পর এক, উত্তর দেয়া বা না দেয়া আমাদের ইচ্ছের ওপর নির্ভর করবে, কেউ জোরাজুরি করতে পারবে না। একজন একবারে একটার বেশি প্রশ্ন করতে পারবে না।'

'ঠিক বুঝলাম না। একরাশ প্রশ্ন করে কি লাভ যদি আমরা কেউ উত্তর না দিই? তাছাড়া মিথ্যা বলছেন কিনা বুঝবার উপায় কি?'

'সত্য মিথ্যা বোঝাটা যার যার বুদ্ধির ওপর নির্ভর করবে। ধরো, তুমি আমাকে একটা প্রশ্ন করলে। আমি যদি মনে করি এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া আমার জন্য বিপজ্জনক, আমি উত্তর দেব না। কিন্তু যদি মনে করি এ প্রশ্নের উত্তর দিলে আমার কোন ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা নেই, সত্যি কথাটাই বলব।

এটুকু সত্যতা আশা করব আমরা পরস্পরের কাছে। তাছাড়া প্রশ্নের চাতুরি দিয়ে সত্য মিথ্যা বুঝবার উপায় তো খোলা থাকল দুজনের জন্যেই।'

এবার ব্যাপারটা বুঝল মেয়েটা। মৃদু হাসল। বলল, 'এইভাবে আলাপ করতে গিয়ে হয়তো যা জানতে চাই জেনে ফেলতে পারব পরোক্ষভাবে, তাই না? ঠিক আছে প্রশ্ন করুন।'

'লেডিস ফার্স্ট।'

'ঠিক আছে। আমার প্রথম প্রশ্ন: এই মেয়েটাকে খুন করেছেন কেন?'

'আমি খুন করিনি।'

'তাহলে কে খুন করেছে?'

'উহুঁ। পর পর দুটো প্রশ্ন হয়ে যাচ্ছে। এবার আমার প্রশ্নের পালা। তবু তোমার প্রশ্নের উত্তরটা দিয়েই আমার প্রশ্ন শুরু করছি। উত্তর হচ্ছে: জানি না। এবার প্রশ্ন: বটগাছের নিচের মৃতদেহটা কি ভেলার ওপরই আছে, না পানিতে ফেলে দিয়েছ?'

'ভেলার ওপরেই আছে। প্রশ্ন: আপনি কি উ-সেনের হয়ে কাজ করছেন?'

'উত্তর দেব না। প্রশ্ন: ইয়েন ফ্যাঙ বলে কাউকে চেনো?'

'উত্তর দেব না। প্রশ্ন: উ-সেনের লোক অনুসরণ করছে কেন আপনাকে?'

'উত্তর দেব না। প্রশ্ন: প্যাপন মং লাই বলে কাউকে চেনো তুমি?'

'উত্তর দেব না। প্রশ্ন: আপনি কি ভারতীয়?'

'উত্তর: না। প্রশ্ন: তোমার মা এদেশী, না বাবা?'

'উত্তর: বাবা। প্রশ্ন: উ-সেনের দলে যোগ দিতে এসেছেন?'

'উত্তর দেব না। প্রশ্ন: ছুরিটা কি আরাকানী?'

'উত্তর: হ্যাঁ। প্রশ্ন: আপনি কি বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের লোক?'

'উত্তর দেব না। প্রশ্ন: উ-সেনকে তুমি পছন্দ করো?'

'উত্তর: ঘৃণা করি। প্রশ্ন: মেয়েমানুষের পোশাক পরে উ-সেনের লোককে ধোঁকা দিতে চেষ্টা করেছিলেন কেন?'

'উত্তর দেব না। প্রশ্ন: তাই দেখেই তুমি আমাকে মিত্র মনে করেছ?'

'উত্তর: না! উ-সেনের লোককে মারতে দেখে। এবং আমার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করতে দেখে। প্রশ্ন: নানকিং হোটেলের মিসেস গুপ্ত কি আপনার মিত্র?'

'উত্তর: জানি না। প্রশ্ন: যাকে ছুরি মেরেছ সে কি উ-সেনের লোক?'

'উত্তর: হ্যাঁ। প্রশ্ন: কতক্ষণের মধ্যে এই ইয়টে লোক আশা করছেন?'

'উত্তর: আগামী পাঁচ মিনিটের মধ্যে। আউট-বোর্ড ইঞ্জিনের শব্দ পাচ্ছি। প্রশ্ন: তোমার বয়স কত?'

'উত্তর: বাইশ বছর। প্রশ্ন: আমাকে চিনতে পেরেছেন মনে হচ্ছে?'

'উত্তর: পেরেছি। তোমার নাম সোফিয়া মং লাই। কোন্ ইয়ারে পড়ছ?'

'উত্তর: থার্ড ইয়ারে। প্রশ্ন: বুঝলাম, আমার কাছ থেকে আপনার আর

কিছু জানার নেই। সাহায্য পাচ্ছি আপনার?'

'উত্তর: জানি না। প্রশ্ন: তোমার বাবা এখন রেঙ্গুনে?'

'উত্তর: জানি না। অনেক খুঁজেও কোন হদিস পাচ্ছি না। প্রশ্ন: আমি যাকে খুঁজছি, আপনি কি সেই লোক?'

'উত্তর: খুব সম্ভব। প্রশ্ন: আমি বা আমরা আসব, জানলে কি করে?'

'উত্তর: বাবার কাছে। ধরা পড়ার আগের দিন বলেছিলেন। সেই থেকে অপেক্ষা করছি আমি। আমি জানি আমার বাবাকে উদ্ধার করার জন্যে পাঠানো হয়নি আপনাকে। সেইজন্যেই জোঁকের মত লেগে আছি আপনার পিছনে। আপনার কাজ আপনি করুন, আপনি প্রয়োজন বোধ করলে সাহায্য করতেও প্রস্তুত আছি আমি, যা চাইবেন তাই দিতে রাজি আছি, শুধু কথা দিন, ওই পশুদের কবল থেকে উদ্ধার করে দেবেন আমার বাবাকে। একবার বের করে আনতে পারলে আর ওদের সাধ্য নেই ওঁকে বন্দী করার। একশো আরাকানী যুবক রয়েছে এখন রেঙ্গুনে আমার হুকুমের প্রতীক্ষায়, প্রয়োজন হলে পাঁচ হাজার লোক দিতে পারব। লোকবল আছে আমার, কিন্তু ঠিক কোথায় এ বল প্রয়োগ করতে হবে জানা নেই। আমাকে এটুকু সাহায্য করতেই হবে। বলুন, করবেন?'

একেবারে কাছে এসে পড়েছে আউট-বোর্ড ইঞ্জিনের শব্দ। লাইট নিবিয়ে দিয়ে কেবিনের দরজা মেলে ধরল রানা। চাপাকণ্ঠে বলল, 'কাল যাচ্ছি আমি উ-সেনের সাথে দেখা করতে। তোমার বাবার দেখা পাব কিনা জানি না, যদি পাই তাঁকে নিয়ে ফেরার চেষ্টা করব। দেখা না পেলেও সন্ধান বের করবার চেষ্টা করব, এটুকু কথা দিতে পারি। এর বেশি আর কিছুই করবার নেই আপাতত আমার।' ছুরিটা ধরিয়ে দিল রানা সোফিয়ার হাতে। 'যাও, এবার কেটে পড়ো। খুব সম্ভব প্রচুর মারধর-করা হবে এখন আমাকে। তোমাকে যদি এই ইয়টে পায় তাহলে দুজনকেই খুন করে ফেলা হবে।'

'কোনরকম সাহায্যে আসতে পারি আমি?'

'তোমার একশো লোকের মধ্যে এমন কেউ আছে যে এই ইয়ট চালাতে পারে?'

'অন্তত দশজন পাওয়া যাবে এরকম।'

'গুড। কাল সন্ধের সময় আমি এই ইয়ট ছেড়ে চলে যাবার পর তোমার একশো লোককে চড়িয়ে দেবে এতে। এটাকে নিয়ে যেতে হবে আকিয়াবে। ওখানে নোঙর করে এই ইয়টের সমস্ত মালপত্র নিয়ে নিজেদের এলাকায় গিয়ে অপেক্ষা করতে বলবে ওদের।'

'কি আছে এই ইয়টে?'

'অস্ত্র।'

'সব লোককে পাঠিয়ে দেব, এখানে আমাদের লোক দরকার হবে না?'

'না।'

'আপনার নামটা জানতে পারি?'

'আপাতত আমার নাম আব্বাস মির্জা। সত্যিকার পরিচয় এখন না জানলেও চলবে।'

'ঠিক আছে, চললাম। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে।'

অন্ধকারে মিশে গেল সোফিয়া মং লাই।

ছয়

দমাদম পেটাল কিছুক্ষণ ওরা ইয়টের গায়ে। কোন সাড়া নেই রানার। দুই মিনিট পর ধৈর্য হারিয়ে উঠে এল উপরে। কেবিনের দরজায় টোকা দিল জোরে জোরে।

এক মিনিট পর দরজা খুলল রানা। সারা গায়ে সাবান মাখা, স্নান করছিল। তোয়ালে জড়ানো কোমরে। ইয়েন ফ্যাঙের উপর দৃষ্টি পড়তেই বলে উঠল, 'কি ব্যাপার? কেউ গেল না যে? শুধু শুধুই অপেক্ষা করলাম শ্যু ড্যাগন প্যাগোডায়। বিপদে পড়েছিলাম...' হঠাৎ অন্যান্যদের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল রানা, থেমে গেল কথার মাঝখানেই। সপ্রতিভ গলায় বলল, 'বসুন আপনারা। কেবিনে তো জায়গা হবে না, ব্রিজ থেকে কয়েকটা চেয়ার নিয়ে ডেকেই বসুন।'

একটু যেন থমকে গেল ইয়েন ফ্যাঙ রানার পরম নিশ্চিন্ত ভাব দেখে। কিন্তু সে শুধু তিন সেকেন্ডের জন্যে। রানাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ঢুকে পড়ল সে কেবিনে। পিছন পিছন ঢুকল আরও চারজন। সবশেষে ঢুকল মোটা লোকটা। প্রত্যেকেই সশস্ত্র, শুধু একজন ছাড়া।

মোটাকে দেখেই হাঁ হয়ে গেল রানার মুখ। যেন ভয়ানক অবাক হয়েছে। 'আরে! এই লোক তোমাদের সঙ্গে কেন? এই লোকই তো অনুসরণ...'

আর অভিনয়ের সুযোগ পাওয়া গেল না। এক ধমকে ঠাণ্ডা করে দিল ওকে ইয়েন ফ্যাঙ।

'চোপরাও! হারামীর বাচ্চা কোথাকার!' কটমট করে চাইল সে রানার চোখে। 'ন্যাকামি হচ্ছে?' প্রচণ্ড এক চড় তুলে দু'পা এগিয়ে এল সে, কিন্তু আঘাত করার ঠিক পূর্বমুহূর্তে তীক্ষ্ণকণ্ঠে আদেশ এল নিরস্ত্র লোকটার কাছ থেকে।

'কাট ইট। মেরো না, ইয়েন। ওর বক্তব্য শুনতে হবে আগে।' পকেট থেকে সিগারেট কেস বের করল।

লোকটা ছোটখাট, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিমছাম পোশাক পরিচ্ছদ, চোখে পুরু লেন্সের রোল-গোল্ডের ফ্রেমের চশমা। ইউনিভার্সিটির প্রফেসারের মত সম্ভ্রান্ত, বিদ্বান্ একটা ভাব রয়েছে চেহারায়। এই গুণ্ডাদের থেকে সম্পূর্ণ

আলাদা। কিন্তু এর আদেশের কতটা দাম টের পেল রানা মুহূর্তের মধ্যে ইয়েন ফ্যাঙের সংযত হয়ে যাওয়া দেখে। এই লোকটাই কি উ-সেন? ভাবল রানা।

'ঠিক আছে, আপাতত গায়ে হাত দেব না। কিন্তু ওর কথা শুনে কি হবে? ও তো একটা সত্যি কথাও বলবে না, ডক্টর হুয়াং!'

মৃদু হাসল ডক্টর হুয়াং। সিগারেটের চেয়েও সরু পাঁচ ইঞ্চি লম্বা একটা চুরুট বের করল সে সোনালি সিগারেট কেস থেকে। ঠোঁটে লাগিয়ে বলল, 'তোমাদের একজন দেখে এসো বাথরুমে কোন অস্ত্র আছে কিনা। প্রত্যেকটা জিনিস পরীক্ষা করবে, কমোডের সিস্টার্নও দেখবে।' একজন চলে গেল বাথরুমে। রানার দিকে ফিরল ডক্টর হুয়াং। 'আপনার বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ আছে এদের। সার্চ করা হয়ে গেলেই স্নান সেরে আসুন। আমরা বসছি।'

কিছু পাওয়া গেল না বাথরুমে। বিনা বাক্যব্যয়ে বাথরুমে ঢুকে শাওয়ার ছেড়ে দিয়ে যতক্ষণ খুশি গোসল করল রানা। তারপর গা মুছে কাপড় পরে বেরিয়ে এল।

কেবিনের একমাত্র চেয়ারটা দখল করেছে ডক্টর হুয়াং, ইয়েন ফ্যাঙ বসেছে খাটের কিনারে, বাকি সবাই দাঁড়িয়ে আছে। ডেস্কের উপর বসল রানা সবার চেয়ে উঁচুতে।

'বলুন, আপনাদের কি অভিযোগ?' ভদ্রভাবে বলল রানা। ভুরু কুঁচকে চাইল একবার ইয়েন ফ্যাঙের দিকে, তারপর মুচকি হাসল মোটাকে দেখে।

'আজ সন্ধে থেকে আপনার চাল-চলন অত্যন্ত রহস্যময় ঠেকছে ইয়েন ফ্যাঙের কাছে। ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই বিশেষ জরুরী মীটিং থেকে উঠে আসতে বাধ্য হয়েছি আমি। আমি আশা করব আপনার এই দুর্বোধ্য গতিবিধির সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিয়ে আপনি আমাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করতে পারবেন।' ইয়েন ফ্যাঙের দিকে ফিরল ডক্টর হুয়াং। 'মাথা ঠাণ্ডা রেখে প্রশ্ন করো, ইয়েন।'

রানার দিকে ফিরল ইয়েন ফ্যাঙ। দুই চোখে গোক্ষুরের বিষ।

'কোথায় গিয়েছিলে?'

'শ্যু ড্যাগন প্যাগোডায়।' গম্ভীরভাবে উত্তর দিল রানা।

'কেন?'

'তোমার নির্দেশ অনুযায়ীই গিয়েছিলাম। ঠিক আটটা থেকে আটটা দশ পর্যন্ত অপেক্ষা...'

'আমার নির্দেশ কি ছিল? আজকে যাবার কথা ছিল, না আগামীকাল?'

'গতকাল তুমি বলেছিলে "টুমরো", জাস্ট অ্যাট এইট পি-এম...'

'আমি বলেছিলাম "ডে আফটার টুমরো"। বার বার করে বলেছিলাম...'

'মিথ্যে কথা। হয় মিথ্যে বলছ, নয় ভুলে গেছ। অবশ্য বেহেড মাতাল ছিলে...'

'খবরদার, আব্বাস মির্জা!' একলাফে উঠে দাঁড়াল ইয়েন ফ্যাঙ। 'মুখ

সামলে কথা বলো, নইলে...'

এক হাত তুলে ওকে শান্ত হবার ইঙ্গিত দিল ডক্টর হুয়াং। বলল, 'বোঝা যাচ্ছে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে তোমাদের মধ্যে। মিস্টার আব্বাস মির্জা,' রানার দিকে ফিরল সে, 'আপনি বলছেন ইয়েন গতকাল মাতাল ছিল। কথাটা কতখানি সত্য?'

'হানড্রেড পার্সেন্ট।' আঙুল তুলে একজনের দিকে দেখাল রানা। 'ওকেই জিজ্ঞেস করে দেখুন না, ও তো ছিল কাল।'

নির্দিষ্ট ব্যক্তির দিকে ফিরল ডক্টর হুয়াং, প্রশ্নের ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল ভুরু নাচিয়ে। লোকটা ভয়ে ভয়ে চাইল একবার ইয়েন ফ্যাঙের দিকে, কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে অস্বস্তি ভোগ করল কয়েক সেকেন্ড, তারপর সম্মতিসূচক মাথা ঝাঁকাল। এতক্ষণে ডক্টরের চোখে একটু রাগের আভাস দেখতে পেল রানা। সরাসরি চাইল ইয়েন ফ্যাঙের চোখের দিকে।

'আবার তুমি আইন ভঙ্গ করেছ, ইয়েন। এবার উ-সেনের কানে তুলতে হবে কথাটা।'

'আর একটা চান্স দিন, ডক্টর, আর কোনদিন কাজের সময় ও জিনিস ছোঁব না। ওই হারামজাদা খাচ্ছিল মনের সুখে, আমি লোভ সামলাতে পারিনি, কয়েক ঢোক খেয়েছি ওর বোতল থেকে।'

রানার দিকে ফিরল ডক্টর হুয়াং। 'কয়েক ঢোক মদ খেলে কেউ বেহেড মাতাল হয়ে যায় না। তাছাড়া আপনি নিজেও মাতাল ছিলেন গতকাল। কাজেই ভুলটা ইয়েন করেছে না আপনি করেছেন বুঝবার উপায় নেই। আপনার পক্ষে ইচ্ছে করেই ভুল করবার যথেষ্ট কারণ থাকতে পারে। অন্তত ওর তাই ধারণা। বহুদিনের অভিজ্ঞ, যোগ্য এবং বিশ্বস্ত লোক ও আমাদের। এসব ব্যাপারে সাধারণত ভুল হয় না ওর। তবু এ ব্যাপারটায় আপনি বেনিফিট অভ ডাউট পেতে পারেন। ধরে নিলাম, ইয়েন আপনাকে আগামীকালকের কথা বলেছিল, মাতাল অবস্থায় আপনি সেটা আজকের কথা মনে করে চলে গিয়েছিলেন শ্যু ড্যাগন প্যাগোডায়। কিন্তু আরও কয়েকটা বিষয়ে আমাদের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দরকার। নিন, আমি প্রশ্ন করছি, উত্তর দিন।'

এতক্ষণ পর সরু চুরুটটা ধরাল ডক্টর হুয়াং। নড়েচড়ে বসল রানা। সিগারেট ধরাল একটা। বুঝতে পেরেছে সে, এই লোক সহজ পাত্র নয়। প্রথম এবং প্রধান ফাঁড়াটা কেটে গেছে, কিন্তু ছোটখাট অনেকগুলো ব্যাপার আছে, এখন থেকে সাবধান না হলে ফেঁসে যাবে ও। মনে মনে গুছিয়ে নিয়ে প্রস্তুত হলো সে প্রশ্নবাণের জন্যে।

'মেয়েমানুষের ছদ্মবেশ নিয়েছিলেন কেন?'

'সেটা আপনারা জানলেন কি করে?' অবাক হয়ে যাওয়ার ভান করল রানা।

'আমার প্রশ্নের উত্তর দিন!' হুয়াং গম্ভীর।

'শত্রপক্ষকে ফাঁকি দেয়ার জন্যে।'

'কারা শত্রুপক্ষ?'

'জানি না। সম্ভাব্য শত্রুর কথা বলছি।'

'সাবধানতা অবলম্বন করতে চেয়েছিলেন?'

'ঠিক তাই।'

'তারপর কি হলো?'

'ট্যাক্সিতে উঠেই টের পেলাম, অনুসরণ করা হচ্ছে আমাকে। বেশ খানিকটা ঘাবড়ে গেলাম। পিছু পিছু শ্যু ড্যাগন প্যাগোডা পর্যন্ত এল ট্যাক্সিটা, একটা মোটাসোটা লোককে নামতে দেখলাম। আমার একটু সন্দেহ ছিল, লোকটা আপনাদের দলেরও হতে পারে; হয়তো ওখান থেকে আমাকে নিয়ে যাবার জন্যেই পাঠানো হয়েছে ওকে।' সিগারেটে লম্বা করে টান দিল রানা। 'পনেরো মিনিট আগেই পৌঁছে গিয়েছিলাম আমি ওখানে। ঘোরাঘুরি করে সময় কাটালাম। ঠিক আটটার সময় দাঁড়িয়ে পড়লাম একটা অন্ধকারমত জায়গার কাছাকাছি পরিষ্কার আলোয়। অপেক্ষা করছি, কেউ আসে না। ওদিকে আড়চোখে লক্ষ করলাম, অন্ধকার ছায়ায় ছায়ায় পা টিপে টিপে এগিয়ে আসছে অনুসরণকারী। শত্রু না মিত্র বুঝতে পারিনি আমি তখনও। একটা অ্যাংলো মেয়ে আসছিল এদিকে, ভাবলাম আপনাদের দলের হতে পারে, কিন্তু পাশ কাটিয়ে চলে গেল। এমন সময় পিছনের লোকটা ডাকল আমাকে—এই যে, মিস্টার…। ঝট করে ঘুরেই ঝাঁপিয়ে পড়লাম আমি ওর ওপর।' মোটা লোকটার দিকে ফিরল রানা, 'সেজন্যে আমি দুঃখিত…'

'থাক,' বাধা দিল ডক্টর হুয়াং, 'দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে পরে আলাপ করা যাবে। এখন বলুন, লোকটা আমাদের দলের লোকও হতে পারে এই সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও মারলেন কেন ওকে?'

'সন্দেহ ছিল না আর। শত্রু জেনেই মেরেছি ওকে।'

'কিভাবে জানলেন?'

'পাস ওয়ার্ড ছিল "ট্র্যুরি", কিন্তু লোকটা শুরু করেছিল "এই যে মিস্টার" বলে।'

মাথা ঝাঁকাল ডক্টর হুয়াং, চুরুটে টান দিল, ধোঁয়া ছাড়ল একগাল, তারপর ধোঁয়ার দিকে চেয়ে বলল, 'একজন সাধারণ সৈনিকের তুলনায় আপনার রিঅ্যাকশন অত্যন্ত দ্রুত। এতই দ্রুত যে রীতিমত অস্বাভাবিক ঠেকছে আমার কাছে। যাই হোক, আপনার পরবর্তী কাহিনী শোনা যাবে, তার আগে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ খানিকটা শুনে নেয়া যাক।' মোটার দিকে ফিরল হুয়াং। বার্মিজ ভাষায় জিজ্ঞেস করল, 'এই লোকটা কি পনেরো মিনিট আগে পৌঁছেছিল? ঠিক আটটার সময় দাঁড়িয়ে পড়েছিল? অপেক্ষা করার ভাব দেখা গিয়েছিল ওর মধ্যে? "এই যে মিস্টার" বলেছিলে? অ্যাংলো মেয়ে আসছিল? চেনো মেয়েটাকে?'

প্রতিটা প্রশ্নের উত্তরেই সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল লোকটা, শেষেরটা

ছাড়া। চিন্তিতভাবে মাথা ঝাঁকাল ডক্টর হুয়াং। ঝট করে চাইল রানার দিকে।

'এরপর নানকিং হোটেলে গিয়েছিলেন আপনি?'

'হ্যাঁ।' নির্দ্বিধায় জবাব দিল রানা। একটু অবাক হওয়ার ভান করল এরা সব জানে দেখে।

'কেন?'

'প্রথমত, প্যাগোডা থেকে পালিয়ে লোকজনের ভিড়ে মিশে যেতে, দ্বিতীয়ত, ডিনারটা সেরে নিতে, তৃতীয়ত, ইয়টে ফিরবার আগে আর কেউ অনুসরণ করছে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে।'

'কেউ অনুসরণ করেছিল?'

'না। ডিনার সেরেই ফিরে এসেছি আমি ইয়টে।'

'পথে কাউকে ছুরি মারেননি কিংবা মারতে দেখেননি?'

'না তো! ইয়টে ফিরে দেখলাম যার বোট নিয়ে...'

'সেই মেয়েটাকে গুলি করে মারা হয়েছে। ওর দুর্ভাগ্য, ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয়েছে ও। কিন্তু সে প্রসঙ্গে পরে আসছি, তার আগে ভাল করে স্মরণ করবার চেষ্টা করুন, বটগাছ তলায় কোনরকম ধস্তাধস্তির আওয়াজ পেয়েছিলেন কিনা?'

সত্যিই কোন আওয়াজ পায়নি রানা। বলল, 'না। কোন আওয়াজ পাইনি। কেন, ওখানে আবার কোন দুর্ভাগ্যজনক কিছু ঘটেছে নাকি?'

'ঘটেছে। কিন্তু সে ব্যাপারে আপনাকে দায়ী করছি না, যদিও পরোক্ষভাবে এতে আপনার হাত থাকা অসম্ভব নয়। নানকিং হোটেল থেকে আপনাকে অনুসরণ করে এসেছিল লোকটা বটগাছের নিচ পর্যন্ত। আমাদেরই লোক। খানিক আগে পাওয়া গেছে ওর লাশ। পিঠে ছুরি মেরে খুন করা হয়েছে ওকে।'

বিস্মিত মুখভঙ্গি করল রানা, তারপর সহজ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে প্রত্যক্ষ সন্দেহের আওতা থেকে মুক্ত রাখছেন কি কারণে?'

'কারণ, লোকটা যেখানে দাঁড়িয়েছিল তার একহাত পিছনে একজোড়া হাইহিল জুতোর দাগ পাওয়া গেছে। সেই দাগ অনুসরণ করে কিছুদূরে জুতোজোড়া, একটা ব্লাউজ স্কার্ট আর একটা হ্যান্ডব্যাগ পাওয়া গেছে। সেখানে গোপন পাহারা বসিয়ে দিয়েছি, কিন্তু আমার ধারণা, ফিরে আসবে না মেয়েটা। খুব সম্ভব পায়ের চিহ্ন গোপন করবার জন্যে জলে নেমে সাঁতরে চলে গেছে সে তার গন্তব্যস্থানে।'

রানার ধারণা অন্যরকম। ভিতরে ভিতরে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল সে সোফিয়ার জন্যে, কিন্তু মুখের ভাবে প্রকাশ পেল না কিছুই। হঠাৎ বিচলিত হয়ে ওঠার ভাব দেখাল রানা। বলল, 'হ্যান্ডব্যাগটা কি গুঁই সাপের চামড়ার?'

চোখদুটো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল ডক্টর হুয়াং-এর। মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল সে। বলল, 'আপনি জানলেন কি করে?'

'তাহলে নিশ্চয়ই সেই অ্যাংলো মেয়েটার কাজ। ওর হাতে গুঁই সাপের

চামড়ার ব্যাগ ছিল।'

'হ্যাঁ, আমিও দেখেছি,' বলল মোটা লোকটা।

ভুরু কুঁচকে ভাবল হুয়াং কিছুক্ষণ, তারপর বলল, 'মেয়েটাকে চেনেন?'

'আবার দেখলে চিনতে পারব।'

'পরিচয় জানেন না?'

'না।।'

'তাহলে এটুকু জেনে বিশেষ লাভ হলো না। চেহারার বর্ণনা পাওয়া যাবে, এই যা লাভ। যাই হোক, আমরা আমাদের আগের প্রসঙ্গে ফিরে যেতে পারি। ইয়টে ফিরে এসে দেখলেন খুন হয়ে গেছে মেয়েটা। তারপর কি ভাবলেন এবং কি করলেন?'

'এই নিরীহ মেয়েটার মৃত্যুর কোন কারণই ভেবে বের করতে পারিনি। কারা কাজটা করল, কেন করল, কিছুই বুঝতে পারিনি। এখন মনে হচ্ছে আপনারা করেছেন, নিশ্চয়ই ওই গর্দভ ইয়েন ফ্যাঙের কাজ। আমাকে অনুসরণ করবার কোন দরকার ছিল না, এত কাণ্ডের কিছুই প্রয়োজন ছিল না–শুধু পিছু ডেকে বলে দিলেই হত, আজকে নয়, দেখা করবার কথা আগামীকাল। এটুকু জানতে পারলেই ফিরে আসতাম আমি। তা না করে বেশি চালাকি করতে গিয়েছিল, ফলে মিছিমিছিই প্রাণ গেল দুজন মানুষের। এখন বুঝতে পারছি, এই মেয়েটাকে টরচার করা হয়েছিল আমার সম্পর্কে তথ্য আদায় করার জন্যে। কিছুই বলতে পারেনি মেয়েটা, জানলে তো বলতে পারবে, কিন্তু বিশ্বাস করেনি ওই চামার, যাবার সময় গুলি করে মেরে রেখে গেছে।' ক্রুদ্ধ চোখে চাইল রানা ইয়েন ফ্যাঙের দিকে।

খলখল করে হাসল কিছুক্ষণ ডক্টর হুয়াং। 'বুঝতে পারছি, আপনারা দুজন কেউ কাউকে পছন্দ করতে পারছেন না। আপনার কপাল খারাপ বলতে হবে। ওর সাথে সদ্ভাব না থাকলে যে কোন মানুষকে নানানভাবে অসুবিধায় পড়তে হয়। যাই হোক, আমার মতে সামান্য একটা দেহপসারিণীর জন্যে এতখানি বিচলিত হয়ে পড়াটা আপনার পক্ষে ঠিক শোভা পাচ্ছে না। শুনেছি, একটা পাখির জন্যেও নাকি কেঁদে উঠেছিল আপনার প্রাণ! এই যদি অবস্থা হয়, দেশ উদ্ধার করবেন কি করে?'

'যে সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্রে নির্দ্বিধায় মানুষ হত্যা করে, ঘরে ফিরে এসে সে-ই বুকে জড়িয়ে ধরে তার ছোট্ট তিন বছরের শিশুকে। দুর্বলের প্রতি মমতা দিয়ে বিচার করবেন না, শক্তিশালীর বিরুদ্ধে কতটা কঠোর হতে পারি, তাই দিয়ে বিচার হবে আমার।'

শ্রাগ করল ডক্টর হুয়াং। 'সবাই ফিলসফার। যাই হোক, আমাদের আগের প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া যাক। এখন আপনি কি ভাবছেন সেটা আমার প্রশ্ন ছিল না, আমি জানতে চেয়েছিলাম ইয়টে ফিরে যা দেখলেন তাতে কি চিন্তা এল আপনার মনে, কি ভাবলেন, কি করলেন?'

রানা বুঝল, রামঘুঘু! বলল, 'স্বভাবতই ভয় পেলাম আমি। কারা করল

কাজটা বুঝতে না পেরে প্রথমে ডিঙিটা ভাসিয়ে দিলাম স্রোতে, মৃতদেহটা আস্তে করে ছেড়ে দিলাম পানিতে। বিছানার চাদর থেকে ধুয়ে ফেললাম রক্তের দাগ। তারপর স্নান করে প্রস্তুত হচ্ছিলাম সারা রাত্রি জাগরণের জন্যে। সতর্ক থাকা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর দেখতে পাচ্ছিলাম না। কেন কি ঘটছে কিছুই পরিষ্কার হয়নি আমার কাছে কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত। কারা অনুসরণ করছে আমাকে, উ-সেনের দলই বা কেন চুপচাপ, কারা খুন করল মেয়েটাকে আমারই ইয়টে এসে আমারই কেবিনের ভেতর–সবকিছু ঘোলাটে ছিল আমার কাছে, ভেবে কোন কূল-কিনারা পাচ্ছিলাম না।'

থামল রানা। দম ধরে বসে রইল হুয়াং মিনিট দুয়েক। রানা বুঝল অত্যন্ত দ্রুত চিন্তা চলেছে বুদ্ধিমান লোকটার মাথায়। সমস্ত তথ্য সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে নিখুঁত অঙ্কের হিসেব বের করছে হুয়াং। রানা পাস করল না ফেল করল জানা যাবে একটু পরেই। যেন কিছুতেই কিছু এসে যায় না, এমনি ভাব করে সিগারেট ধরাল সে আর একটা।

হঠাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে উঠে দাঁড়াল ডক্টর হুয়াং। ফিরল ইয়েন ফ্যাঙের দিকে। বলল, 'এই লোকটা সন্দেহজনক। যদিও আজকের একটি ঘটনাও ওর বিরুদ্ধে নিশ্চিত প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না, তবু কয়েকটা ব্যাপার অস্পষ্ট থেকে যাচ্ছে–এক: কেন স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশ? দুই: পিছনে লোক লেগেছে টের পাওয়ার পরও পালিয়ে গেল না কেন? তিন: নানকিং হোটেলে গেল কেন, লুকোবার এত জায়গা থাকতে? চার: এত হুঁশিয়ার লোক টের পেল না কেন যে নানকিং হোটেল থেকে লোক লেগেছে পিছনে? পাঁচ: ইয়টে ফিরে লাশ দেখেই পালিয়ে গেল না কেন?– কাজেই সাবধান থাকতে হবে আমাদের। এই লোক হয় প্রত্যেকটা কথা সত্যি বলছে, নয়তো প্রত্যেকটা কথাই এর মিথ্যা। হি মে বি ভেরি ডেঞ্জারাস ফর আস্। এর ব্যাপারে কোন ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না। আগামীকাল সন্ধে পর্যন্ত দুজন লোককে থাকতে হবে এখানে গার্ড হিসেবে। এক মুহূর্ত চোখের আড়াল করা চলবে না।'

একটানা এতগুলো কথা বলার পর রানার দিকে ফিরল হুয়াং। 'আগামীকাল সন্ধে পর্যন্ত নজরবন্দী থাকতে হবে আপনাকে। শ্যু ড্যাগনে আর যাবার দরকার নেই। ঠিক আটটার সময় উপস্থিত থাকবেন নানকিং হোটেলের লাউঞ্জে। ওখান থেকে আপনাকে চিনে নেবে আমাদের লোক। নতুন পাস ওয়ার্ড–ওয়েটিং। হোটেলের দরজা পর্যন্ত আপনার পিছু পিছু যাবে ইয়টের দুজন প্রহরী, আগে থেকেই জানিয়ে রাখছি, দুর্ঘটনা বা ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ যেন না থাকে।'

রানার চোখের দিকে চেয়ে সামান্য একটা নড করে বেরিয়ে গেল ডক্টর হুয়াং।

রানার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বেরিয়ে গেল ইয়েন ফ্যাঙ।

রানা বুঝল ঘুমাতে পারবে আজ রাতে।

কিন্তু সোফিয়া? ধরা পড়ে গেল মেয়েটা? খবরটা জানা যায় কিভাবে?

সাত

রাত আটটা।

রিসেপশন কাউন্টারের কাছাকাছিই একটা সোফায় বসল রানা।

নানকিং হোটেলের স্বাভাবিক কর্মব্যস্ততা–বোর্ডারদের চলাফেরা, ট্যুরিস্টদের ব্যস্ত চোখমুখ, পোর্টার-বেয়ারার ত্রস্ত পদচারণ, রিসেপশনিস্টের মেকি হাসির অভ্যর্থনা, মুহুর্মুহু টেলিফোনের ঝনঝনি–আলস্যভরে সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে দেখছে রানা সব। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট।

'ওয়েটিং ফর সামবডি?' কানের কাছে মোলায়েম মধুর কণ্ঠস্বর।

ঘাড় ফিরিয়ে দেখল রানা, পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের এক বার্মিজ সুন্দরী। রুচিসম্মত কেতাদূরস্ত পোশাক, মাথায় চুড়ো খোঁপা। হাতে লাল একটা মুখ-বাঁধা থলের মত প্লাস্টিকের ব্যাগ। সেই রঙের সাথে ম্যাচ করা লিপস্টিক।

উঠে দাঁড়াল রানা। বলল, 'ইয়েস। ওয়েটিং ফর ইউ। দিস ইজ আব্বাস মির্জা।'

'অ্যান্ড দিস ইজ স্যুই থি। গ্ল্যাড টু মিট ইউ।' মিষ্টি করে হাসল স্যুই থি।

'ডিলাইটেড। নাউ, হোয়াট্স্ দা প্রোগ্রাম?' প্রথমেই কাজের কথা পাড়ল রানা। 'লেট্স্ গো অ্যাহেড উইথ ইট।'

'ওঞ্চিউ হ্যাভ আ ড্রিংক? আই অ্যাম থারস্টি।'

নিজের জন্যে এক পেগ হুইস্কি এবং মেয়েটির জন্যে শ্যাম্পেনের অর্ডার দিল রানা। বসল ওরা মুখোমুখি। গতকালকের সেই বেয়ারাটা গ্লাস দুটো রেখে গেল টেবিলের উপর, রানাকে জিজ্ঞেস করল ডিনার খাবে কিনা। গতকাল মোটা বকশিশ পেয়ে লোভ হয়ে গেছে ব্যাটার! হাসল রানা, চাইল মেয়েটির দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে।

মাথা নাড়ল মেয়েটা। বলল, 'আমাদের ওখানে আপনার স্পেশাল ডিনারের ব্যবস্থা করা হয়েছে, এখানে খেয়ে নিলে নিরাশ হবেন আপনার হোস্ট।'

বেয়ারাকে বারণ করে দিয়ে ফিরল রানা মেয়েটির দিকে। 'ওখানে ড্রিংকের ব্যবস্থা নেই বুঝি?'

হাসল স্যুই থি। 'আছে। সব ব্যবস্থাই আছে। আপনার মালপত্র এতক্ষণে পৌঁছে গেছে, চমৎকার একটা এয়ারকনডিশনড কামরার ব্যবস্থা হয়েছে। অতিথিদের যত্ন আত্তির ত্রুটি রাখেন না উ-সেন। আপনার আরামের দিকে লক্ষ রাখার ভার দেয়া হয়েছে আমার ওপর। আপনার সব রকমের

আরামের ব্যবস্থা করতে হবে আমাকে–প্রয়োজন হলে ঘুমাতেও হবে আপনার সাথে। কাজেই কিছুটা আলাপ করে আপনাকে একটু ঘনিষ্ঠভাবে বুঝে নেয়ার সুযোগটা গ্রহণ করলাম। পাঁচ দশ মিনিটের এদিক ওদিকে কিছুই মনে করবেন না উ-সেন।'

হঠাৎ রানার চোখে পড়ল, সান্ধ্যভ্রমণ সেরে ইনভ্যালিড চেয়ারটা ঠেলে ওপাশের কাচের দরজা দিয়ে ঢুকছে মিসেস গুপ্ত। আধ-শোয়া হয়ে বসে আছে সরোজ গুপ্ত। রানার উপর চোখ পড়ল মিসেস গুপ্তের। ভয় পেল রানা, এখন যদি কোনরকমে প্রকাশ পায় যে ওরা পরস্পরকে চেনে, তাহলে সহজেই বেরিয়ে যাবে গতকাল নানকিং হোটেলে কেন এসেছিল রানা। আর এটুকু জানতে পারলেই আগাগোড়া সব ব্যাপার ফাঁস হয়ে যাবে। উ-সেনের পক্ষে গুপ্ত দম্পতির সত্যিকার পরিচয় বের করা বড়জোর দশ মিনিটের কাজ। ওরা ভারতীয় এজেন্ট–এটুকু জানতে পারলেই বাকিটুকু বুঝে নিতে কষ্ট হবে না কারও।

অস্বস্তিকর কয়েকটি সেকেন্ড কাটল। না, ভুল করল না মিসেস গুপ্ত। চিনতে পারার কোনরকম লক্ষণ প্রকাশ পেল না ওর চাহনিতে। দৃষ্টিটা সরে গেল রানার ওপর থেকে, স্থির হলো অন্য একটা যুবকের মুখের ওপর। মনে মনে হাসল রানা মিসেস গুপ্তের অতৃপ্ত স্ত্রীর ভূমিকায় তুলনাহীন অভিনয় দেখে। কপাল থেকে একগুচ্ছ অবাধ্য চুল সরিয়ে ইনভ্যালিড চেয়ার ঠেলে নিয়ে লিফটে উঠে গেল সে।

শ্যাম্পেনের অবশিষ্টাংশটুকু এক ঢোকে গিলে নিয়ে ঘড়ি দেখল স্যুই থি। বলল, 'চলুন, ওঠা যাক।'

রানা বলল, 'আরেক গ্লাস আনতে বলি?'

'নো থ্যাংক ইউ, বেশি দেরি করলে আবার রেগে যাবেন আপনার হোস্ট।'

'ব্যস, এক গ্লাস শ্যাম্পেনেই সব বোঝা হয়ে গেল আপনার?'

'কিছুটা হলো,' হাসল মেয়েটা। 'বাকিটুকু বুঝে নেব গভীর রাতে।'

'আপনি যেভাবে বলছেন, তাতে এখুনি জিভে পানি এসে যাচ্ছে আমার!'

বিল চুকিয়ে দিয়ে উঠে পড়ল রানা। একটা দুধ-সাদা মার্সিডিস টু-টোয়েন্টি এসে দাঁড়াল ফুটপাথ ঘেঁষে। পিছনের দরজা খুলে দিল শোফার। উঠে বসল ওরা। রাজহংসের মত ভেসে চলল মার্সিডিস বেঞ্জ রেঙ্গুনের উজ্জ্বল-আলোকিত রাজপথ ধরে।

ঘনিষ্ঠ হয়ে এল স্যুই থি। রানার ডানহাতটা তুলে ঘাড়ের পেছন দিয়ে ঘুরিয়ে আনল সামনে, মাথাটা এলিয়ে দিল রানার কাঁধে। চিকচিক করছে চোখদুটো, ঠোঁট ফাঁক হয়ে আছে, চকচকে সাদা দাঁত দেখা যাচ্ছে। আলতো করে কামড়ে দিল সে রানার ঘাড়ের পাশে। শিরশির করে উঠল রানার সর্বশরীর অদ্ভুত এক রোমাঞ্চে। ঘাড় ছেড়ে দিয়ে এখন রানার ঠোঁট খুঁজছে

স্যুই থির লজেন্সের মত ঠোঁট। উরুর ওপর থেকে সরে গেছে সারং। রানার বামহাতটা টেনে নিল সে ফর্সা উরুর ওপর। পেয়ে গেছে সে রানার ঠোঁট। গরম নিঃশ্বাস পড়ছে রানার গালে।

কিন্তু বোধশক্তি লোপ পেল না রানার। কোন্ রাস্তা দিয়ে কোন্‌দিকে চলেছে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রয়েছে ওর। প্রকাণ্ড সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং-এর পাশ দিয়ে গিয়ে বাঁয়ে মোড় নিল গাড়িটা, জুবিলি হল পেরিয়ে এগিয়ে গেল আরও। একটা পরিচিত রোমান ক্যাথলিক ক্যাথেড্রালের পাশের বাইলেন দিয়ে এসে দাঁড়াল পনেরোতলা ইয়ান লাও ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের আন্ডারগ্রাউন্ড কার পার্কের সামনে। একটা গাড়ি বেরোচ্ছিল, সেটা বেরিয়ে যেতেই নেমে গেল ওরা ভিতরে। দু'পাশে অনেকগুলো গাড়ি পার্ক করা আছে, কিন্তু খালি স্পেসও আছে। কোথাও না থেমে সোজা এগিয়ে গেল মার্সিডিস। কার পার্কের শেষ প্রান্তে পৌঁছতেই ধীরে ধীরে খুলে গেল একটা স্টীলের দরজা। খুব সম্ভব উ-সেনের ব্যক্তিগত কার-পার্ক। কালো একটা সিট্রন ডি.এস. দাঁড়িয়ে রয়েছে গম্ভীর মুখে। থেমে দাঁড়াল দুধ-সাদা মার্সিডিস।

আগেই সামলে নিয়েছে স্যুই থি। নেমে পড়ল রানা ওর পিছু পিছু।

'এই পুরো বিল্ডিংটা উ-সেনের?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ। তবে সবচেয়ে ওপরের দুটো তলা ছাড়া সবটাই ভাড়া দেয়া হয়েছে। এরকম আরও কয়েকটা দালান আছে ওর রেঙ্গুনে আর মান্দালয়ে। আসুন, এইদিকে।' লিফটের দিকে এগোল স্যুই থি। এগোল রানাও।

স্বাভাবিকের চেয়ে দ্বিগুণ বেগে উপরে উঠতে শুরু করল লিফট। এত স্পীডের জন্যে মানসিক প্রস্তুতি ছিল না রানার। ওর মনে হলো, ইঞ্চি তিনেক কমে গেছে ওর দৈর্ঘ্য।

চোদ্দতলায় থামল লিফট। নিঃশব্দে খুলে গেল দরজা। নীল কার্পেট বিছানো একটি লবি, ঝকঝকে সাদা দেয়াল। একটা কাঁচের দরজা পেরিয়ে পৌঁছল ওরা আধুনিকতম ফার্নিচারে সুসজ্জিত মস্ত একটা ড্রইংরুমে। কার্পেটের রঙ পাল্টে লাল হয়ে গেল। ছয় ইঞ্চি পুরু ফোম রাবারের উপর কালো চামড়া মোড়া সোফা। একই ডিজাইনের তিন সেট সোফা তিনভাবে সাজানো আছে। অপূর্ব কারুকাজ করা গোটা কয়েক বার্মা টিকের চেয়ার এবং টেবিল। ঘরের কোণে চমৎকার কারুকার্য করা বার্মা টিকের অর্ধচন্দ্রাকৃতি কাউন্টার, তার ওপাশে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটা মিনিয়েচার বার। দেয়ালের গায়ে ফ্রেমে বাঁধানো পৃথিবীর বিখ্যাত কয়েকটা পেইন্টিং, ঘরের তিন কোণে তিনটে ফ্লাওয়ার ভাসে প্রকাণ্ড তিনটে তাজা ফুলের তোড়া। দক্ষিণ দেয়ালে একটা আটফুট বাই ষোলো ফুট কাচের জানালা–গোটা রেঙ্গুন শহরটা দেখা যায় ওখানে দাঁড়িয়ে।

উ-সেনের মধ্যে যে আশ্চর্য এক সৌন্দর্যপ্রেমিক রয়েছে সেটা টের পেয়ে বেশ খানিকটা দমে গেল রানা। কারণ ও জানে, যত রকমের দস্যু বা আইন অমান্যকারী অপরাধী আছে, তার মধ্যে ভয়ঙ্করতম হচ্ছে রুচিশীল

সৌন্দর্যপ্রেমিকেরা। দু'একটা ব্যাপারে এরা আশ্চর্য রকমের কোমল, কিন্তু অন্যান্য ব্যাপারে এদের চেয়ে নিষ্ঠুর আর হৃদয়হীন, এক কথায় পিশাচ দ্বিতীয়টি পাওয়া ভার। এরা করতে পারে না এমন কাজ নেই, নামতে পারে না এমন নীচ নেই। এদের উপরের প্রলেপ দেখলে কেউ কল্পনাও করতে পারবে না কতবড় ভয়ঙ্কর শয়তান বাস করে এদের বিকৃত মস্তিষ্কের ভিতর। পিসারো, মডিগলিয়ানী, গগাঁ আর পিকাসো দেখে বিন্দুমাত্র মুগ্ধ হতে পারল না রানা, বরং আশঙ্কায় ছেয়ে গেল ওর মনটা। ভয়ঙ্কর ধূর্ত হয় অপরাধ জগতের এইসব আঁতেলেকচুয়ালরা, রানা কি পারবে ওর চোখ ফাঁকি দিয়ে কাজ উদ্ধার করতে?

'কি ভাবছেন?' হাসল স্যুই থি মিষ্টি করে। 'ওরকম আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন। কি খাবেন? হুইস্কি, না কোন ককটেল? কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে যাবেন মিস্টার উ-সেন। অতিথিকে শুকনো মুখে রেখেছি জানলে ভয়ানক চটে যাবেন উনি আমার ওপর।'

হাসল রানা। বসে পড়ল একটা সোফায়। বলল, 'একটা ককটেল হলে মন্দ হত না। সস্তা কোন শ্যাম্পেন আছে আপনাদের কাছে?'

'আমি সস্তার কোন কারবার করি না, মিস্টার আব্বাস মির্জা।' একটা গমগমে কণ্ঠস্বর ভেসে এল রানার পিছন দিক থেকে। 'নির্বোধ আর অক্ষমেরা সবকিছুর মূল্য নিয়ে মাথা ঘামায়।'

পিছন ফিরল রানা। দেয়ালের গায়ে একটা দরজা নিঃশব্দে খুলে গেছে কখন। চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়ে আছে ডাবল-ব্রেস্টেড নীল মোহায়ের স্যুট পরা দীর্ঘদেহী এক পুরুষ। রানার চেয়ে অন্তত ছয় ইঞ্চি বেশি লম্বা। সরু কোমর, প্রশস্ত কিন্তু আড়ষ্ট কাঁধ, পিঠটা একেবারে খাড়া। মুখ দেখে বয়স বুঝবার উপায় নেই। চল্লিশ থেকে ষাটের মধ্যে যে কোন বয়স হতে পারে। প্রকাণ্ড মাথা ভর্তি ঘন পাকা চুল, দার্শনিকের মত এলোমেলো। চোখে অত্যন্ত গাঢ় সবুজ রঙের সানগ্লাস, ওটার হ্যান্ডেল থেকে একটা সরু তার গিয়ে ঢুকেছে কোটের ব্রেস্ট পকেটে।

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে এগিয়ে এল লোকটা রানার দিকে। রানার মাথার দুই হাত উপরে ওর দৃষ্টি। উঠে দাঁড়াল রানা। কিন্তু লোকটার দৃষ্টি যেদিকে ছিল সেদিকেই রইল, পরিবর্তন হলো না। ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পেরে শিরশির করে উঠল রানার শিরদাঁড়ার ভিতরটা। বিস্মিত দৃষ্টিতে চাইল রানা স্যুই থি-র দিকে, সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল সে। কোনকিছু না ছুঁয়ে বা ধরে একটা সোফা ঘুরে নিশ্চিত পদক্ষেপে রানার সামনে এসে দাঁড়াল অন্ধ লোকটা। হাত বাড়িয়ে দিল রানার দিকে।

'আমি উ-সেন। ভেরি গ্ল্যাড টু মিট ইউ, মিস্টার আব্বাস মির্জা।'

'গ্ল্যাড টু মিট ইউ,' উত্তর দিল রানা।

দেয়ালের গায়ের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেছে আপনাআপনি। শুকনো, শক্ত একটা হাত জোরের সাথে শেক করল রানার হাত। দরাজ কণ্ঠে আগের

কথার খেই ধরল উ-সেন, 'হ্যাঁ, যা বলছিলাম, সব আনন্দই অমূল্য, মিস্টার আব্বাস মির্জা। আনন্দের প্রশ্নে, উপভোগের প্রশ্নে, মূল্য বিচার করতে নেই। সস্তা শ্যাম্পেনের সাথে কি মিশিয়ে ককটেলের কথা ভাবছিলেন?'

'ব্র্যান্ডি!'

'গুড! শিকাগোর কথা বলছেন। বেশ, ঊনপঞ্চাশের ক্রুগ শ্যাম্পেন আছে আমাদের, আর আছে আটাশের হাইন ব্র্যান্ডি। বানাও স্যুই, আমাকেও দিয়ো এক গ্লাস। পৃথিবীর সবচেয়ে দামী ককটেল দিয়েই শুরু হোক আমাদের আলাপ। আপনাকে ছুঁয়ে দেখতে পারি?'

ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পেরে স্যুই থি-র দিকে চাইল রানা। মাথা ঝাঁকাল স্যুই থি।

'নিশ্চয়ই, দেখুন,' বলল রানা বিনয়ী কণ্ঠে।

প্রথমে রানার চিবুক, তারপর গাল, কান, কপাল ছুঁয়ে দেখল উ-সেন; দুই হাতে মাথার মাপ নিল, ঘাড়ের পরিধি দেখল, প্রশস্ত দুই কাঁধ এবং পেশীবহুল বাহু দেখল। দেখা হয়ে যেতেই সরে দাঁড়িয়ে বলল, 'গুড। স্যুই থি-র রাত আজ স্বপ্নের ঘোরে কাটবে বুঝতে পারছি। আজকের রাত হবে ওর জীবনের স্মরণীয় রাত। বহুদিন পর একজন সত্যিকার বলিষ্ঠ আত্মবিশ্বাসী পুরুষের সাথে আলাপ হলো। আপনার সাথে পরিচিত হয়ে এতক্ষণে সত্যি আনন্দ বোধ করছি, মিস্টার আব্বাস মির্জা। আসুন, বসা যাক।'

বসল ওরা মুখোমুখি দুটো সোফায়। রানা লক্ষ করল পাপেটের মত আড়ষ্ট হাঁটার ভঙ্গিটা হাঁটার বৈশিষ্ট্য নয়, শারীরিক কোন অসুবিধা আছে উ-সেনের। বসেছে পিঠটা একেবারে সোজা রেখে। সার্জিক্যাল করসেট পরেছে কিনা ভাবল রানা। কিন্তু না, সার্জিক্যাল করসেট হলে শোলডার ব্লেডের নিচে এসেই শেষ হয়ে যেত। এর সারা পিঠই আড়ষ্ট। ট্রেতে করে তিন গ্লাস ককটেল নিয়ে এল স্যুই থি, নামিয়ে রাখল টেবিলের উপর। স্বচ্ছন্দে একটা গ্লাস তুলে নিল উ-সেন, অন্য গ্লাসের সাথে ধাক্কা খেলো না। রানা একটা গ্লাস তুলে নিতেই টুং করে টোকা দিল ওর গ্লাস দিয়ে।

'আপনার সাফল্য কামনা করছি।'

স্যুই থি বসেছে উ-সেনের পাশে পায়ের উপর পা তুলে। ছোট্ট চুমুক দিল গ্লাসে।

'আপনার থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে টপ ফ্লোরে। ঠিক নটার সময় ডিনার খাব আমরা। আরও একজন অতিথি থাকবেন। আপনার সাথে পরিচয়ের পালাটা আগেই সেরে রাখলাম, ভালই হলো। গমগমে কণ্ঠ উ-সেনের, প্রকাণ্ড ড্রইংরুমটা মনে হয় কাঁপছে। এই গ্লাসটা শেষ হলেই আপনাকে আপনার ঘর দেখিয়ে দেবে স্যুই থি। আপনার মালপত্র পৌঁছে গেছে আপনার ঘরে। ন'টা পর্যন্ত বিশ্রাম নিতে পারবেন, ইচ্ছে হলে স্নান সেরে নিতে পারেন। ঠিক নয়টার সময় স্যুই থি গিয়ে নিয়ে আসবে আপনাকে।' স্যুই থির কোমরে হাত রাখল উ-সেন। 'আজকের ডিনারটা গুরুত্বপূর্ণ। একজন বিশিষ্ট অতিথি

আসবেন আপনার সাথে আলাপ করতে, পরিচিত হতে। তার আগে প্রাথমিক দু'একটা প্রশ্নোত্তর সেরে নেয়া যাক।'

নড়েচড়ে বসল উ-সেন।

'প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমি জানতে পারলাম, আমার লোক আপনার সাথে খুব ভাল ব্যবহার করেনি। অবশ্য ইয়েন ফ্যাঙের কাছ থেকে এর চেয়ে বেশি কিছু আশা করা যায় না। আমি অন্ধ মানুষ, নিজে সবকিছু করতে পারি না, কাজেই ওর মত কিছু আনকালচারড, আনসফিস্টিকেটেড, মোটাবুদ্ধির লোককে দিয়ে অনেক কাজ করাতে হয়। আশা করি ওর অপরাধ আপনি নিজ গুণে ক্ষমা করবেন।'

'না, না। কিছু মনে করিনি আমি।' বলল রানা।

'থ্যাংক ইউ। কিন্তু সেই অ্যাংলো মেয়েটি সম্পর্কে কোন খোঁজ পাইনি আমরা এখন পর্যন্ত। কে মেয়েটা? কেন সে খুন করল আমাদের একজন লোককে, আপনার পিছু নিয়েছিল কেন সে, কোন্ দলের মেয়ে সে, কি তার উদ্দেশ্য—কিছুই জানা যায়নি। আপনি এ ব্যাপারে কোন সাহায্য করতে পারবেন?'

'চেহারার বর্ণনা দিতে পারি। এর বেশি কিছুই জানা নেই আমার।'

'অথচ মেয়েটা আপনাকে শ্যু ড্যাগন পর্যন্ত কেবল নয়, নানকিং হোটেল পর্যন্ত, এবং সবশেষে বটগাছের নিচু পর্যন্ত অনুসরণ করেছিল...' কথাটা বলতে বলতে থেমে গেল উ-সেন, হঠাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলল, 'আপনাকে সন্দেহের আওতার বাইরে রেখেছি আমি সব সময়েই। কিন্তু আপনি রেঙ্গুন এসে পৌঁছুবার সাথে সাথেই অন্য একটা দলের তৎপরতা লক্ষ করা যাচ্ছে—সেটাই চিন্তিত করে তুলেছে আমাকে। আজ সন্ধ্যায় নানকিং হোটেলে আপনাকে ক্লিয়ারেন্স দিয়েছে ফ্যান সু। কাজেই আপনার ব্যাপারে আমার আর কোন সন্দেহ নেই। তবু কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছি।'

'নানকিং হোটেলে?'

'হ্যাঁ। আমার বিশ্বস্ত লোক আছে ওখানে। ওর কাছ থেকে ক্লিয়ারেন্স পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছি আমি। ফ্যান সু যখন বলেছে আপনাকে চেনে না, আমি বুঝে নিয়েছি আপনাকে কাউন্টার এসপিয়োনাজের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়নি, আপনি জেনুইন লোক। যাই হোক, আজ ডিনারে আসছে জেনারেল এহতেশাম। তিনি আপনার লোকদের গেরিলা ট্রেনিং ক্যাম্পে নিয়ে আসার সব ব্যবস্থা করবেন। মোটামুটি প্ল্যান-প্রোগ্রাম নিয়েও আলাপ হবে। তিন হাজার দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ সৈনিকের কথা শুনে দারুণ উৎসাহিত বোধ করছেন তিনি।'

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল উ-সেন। রানাও দাঁড়াল। রানার কাঁধে একটা হাত রাখল উ -সেন।

'আপনি নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছেন আমার চলাফেরা দেখে? লাঠি ব্যবহার করছি না, দু'হাত সামনে বাড়িয়ে ঠাহর করবার চেষ্টা করছি না, তাহলে অন্ধ

মানুষ, এত স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করছি কি করে?' হাসল উ-সেন। 'জন্মান্ধ হলে এটা সম্ভব হত না। চোখ দুটো হারিয়েছি আমি বছর তিনেক আগে এক প্লেন অ্যাকসিডেন্টে। সেই থেকে এই চশমা ব্যবহার করছি আমি।'

'এই চশমা দিয়ে দেখতে পান?'

'নো, মাই ডিয়ার ইয়াং ম্যান। দেখতে পাই না। বাদুড়ের মত চলি আমি। এই চশমাটা আসলে একটা সাউন্ডট্র্যান্সমিটার। ডক্টর হুয়াং কি-র আশ্চর্য এক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। অত্যন্ত ডেলিকেট এর মেকানিজম্। আশেপাশের দশ গজ পর্যন্ত এর রেঞ্জ। দশ গজের মধ্যেকার প্রত্যেকটা জিনিস থেকে রিফ্লেক্টেড হয়ে বীমগুলো ফিরে আসছে আমার বাম কানের পাশে বসানো একটা রিসিভারে। এই রিসিভারটা আবার সরু তার দিয়ে জয়েন করা আছে আমার পকেটে রাখা একটা মিনিয়েচার অ্যামপ্লিফায়ারের সাথে।'

'এর ফলে গোলমাল পাকিয়ে যায় না?'

'প্রথম প্রথম যেত। এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছি। সব বস্তুর ঘনত্ব সমান নয়। দেয়াল, চেয়ার-টেবিল, কাচ, তরল পদার্থ, মানুষ–প্রত্যেকটা জিনিস আলাদা আলাদাভাবে চিনতে কোন কষ্ট হয় না আর। শুধু ঘরের ভেতরেই নয়, রাস্তা-ঘাটে চলতেও কোন অসুবিধে হয় না। অনায়াসে গাড়ি চালিয়ে ঘুরে আসতে পারি আমি সারাটা রেঙ্গুন শহর। শুধু তাই নয়, আমার কয়েকটা বিশেষ সুবিধা আছে, সাধারণ চক্ষুবিশিষ্ট মানুষের যা নেই। প্রথমত, চোখ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় শ্রবণশক্তি বেড়ে গেছে আমার চতুর্গুণ। এটা প্রকৃতির তরফ থেকে ক্ষতিপূরণের প্রচেষ্টা খুব সম্ভব, দ্বিতীয়ত, শুনলে আশ্চর্য হবেন, আমার সূর্য অস্ত যায় না কোনদিন। দিন রাত্রির প্রভেদ নেই আমার কাছে। ঘন অন্ধকারে আপনি অচল হয়ে পড়বেন আলো ছাড়া, কিন্তু আমি ঠিকই দেখতে পাব, যেমন আলোতে, তেমনি অন্ধকারে। আর তৃতীয়ত,...'হঠাৎ থেমে গেল উ-সেন। লজ্জিতকণ্ঠে বলল, 'এই দেখো, নিজের গল্প নিয়ে এতই মেতে গেছি যে ভদ্রতাজ্ঞান পর্যন্ত লোপ পেয়ে গেছে। যাও স্যুই, অতিথিকে পৌঁছে দিয়ে এসো তাঁর ঘরে।'

আর একটি কথাও না বলে পাপেটের মত পা ফেলে ফেলে চলে গেল উ-সেন ঘর ছেড়ে।

স্যুই থির পিছু পিছু সিঁড়িঘরের দিকে এগোল রানা।

স্নান সেরে নিতে হবে।

আট

ঘটা করে পরিচয় করিয়ে দিল উ-সেন রানাকে জেনারেলের সাথে। হ্যান্ডশেক করে সামান্য মাথা ঝাঁকাল রানা। বসে পড়ল চেয়ারে।

পাঁচজনের জন্যে ডিনার সার্ভ করছে দুজন বেয়ারা। টেবিলের দু'মাথায় রানা ও জেনারেল এহতেশাম, রানার ডানপাশে উ-সেন ও ডক্টর হুয়াং, বামপাশে স্যাই থি। প্রথমে কথা শুরু হলো আবহাওয়া ও টুকিটাকি কুশলাদি দিয়ে। সুপ আসতেই জমে গেল আলাপ।

উ-সেনের প্লেটের পাশে একটা ফাইল রাখা আছে। ওটার ওপর দুটো টোকা দিতেই মোড় ঘুরে গেল আলোচনার।

'এটা কি বলুন তো?' প্রশ্ন করল উ-সেন রানাকে।

মাথা নাড়ল রানা। জানে না।

'এর ভেতর রয়েছে "মুসলিম বাংলা" আন্দোলনের যাবতীয় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র। বলতে পারেন, এটাই আপনাদের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের খসড়া পরিকল্পনা।' অভিভূত হয়ে যাবার ভাব করল উ-সেন। 'আশ্চর্য! কি সাধারণভাবে শুরু হয় সবকিছু–কয়েকজনের কিছু ইচ্ছে, কোন একটা বিষয়ে একমত হওয়া, কিছু কাগজপত্রে মোটামুটি একটা খসড়া পরিকল্পনা তৈরি করা, তারপর পালে হাওয়া লাগলে বাতাসে গা ভাসিয়ে দেয়া। বিশ্বাস করুন, এই মাস চারেক আগেও আমি বিশেষ গুরুত্ব দিইনি এই সম্ভাবনাকে। কিন্তু কার পালে কখন হাওয়া লাগে বোঝার উপায় নেই। যেভাবে চারদিক থেকে ফেঁপে উঠছে ব্যাপারটা, তাতে যেন চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি, অদূর ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে "মুসলিম বাংলা"। অস্ত্র বা টাকার অভাব ছিল না, এখন দেখছি জনবলেরও অভাব পড়বে না। রীতিমত আশান্বিত হয়ে উঠছি আমি আপনাদের ব্যাপারে।'

'আমার সত্যিকার পরিচয় জানলে হয়তো এতটা আশান্বিত বোধ নাও করতে পারেন, মিস্টার উ-সেন। জেনারেলের উৎসাহেও ভাটা পড়তে পারে।' বলল রানা হাসিহাসি মুখে। 'ভুলে যাবেন না, আমি আপনাদের দলে যোগ দিইনি এখনও, যোগ দেয়া যায় কিনা সেটা জানতে এসেছি কেবল। আপনাদের বক্তব্য শুনব, আমার বক্তব্য বলব। যদি মিল পড়ে, একসাথে কাজ করব, নইলে স্লামালেকুম বলে চলে যাব যে যার পথে।'

একটা ক্ষীণ মুচকি হাসি দেখা দিল উ-সেনের ঠোঁটে মুহূর্তের জন্যে–যার অর্থ, সেক্ষেত্রে তোমার পথটা সোজা স্বর্গের দিকে চলে যাবে। জেনারেলের দিকে ফিরল সে, 'আপনি কিছুই বলছেন না যে, জেনারেল?'

'ওঁর সত্যিকার পরিচয়টা জেনে নিয়ে বলাই বোধহয় ভাল।'

সবাই চাইল রানার দিকে। ফাইলটার ওপর আলতোভাবে চোখ বুলাল

রানা। যে জিনিসের জন্যে সে রেঙ্গুন এসেছে আট-নয়শো মাইল পাড়ি দিয়ে, সেটা ওর হাতের ছয় ইঞ্চির মধ্যে রয়েছে বিশ্বাসই হতে চাইছে না ওর। চট করে চোখ সরিয়ে নিল সে, চাইল সবার মুখের দিকে। সবাই অপেক্ষা করছে ওর কথা শুনবার জন্যে।

'আমি পাকিস্তানের বন্ধু নই।'

একটু যেন ঘাবড়ে গেল সবাই। সুপের প্লেট সরিয়ে সেকেন্ড কোর্স সার্ভ করছে বেয়ারা। একটু নড়েচড়ে উ-সেন বলল, 'ব্যাখ্যা করে বলুন।'

'গত মুক্তিযুদ্ধে আমি যুদ্ধ করেছি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। এখন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রস্তুতি নিচ্ছি। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য এবং একজন পাকিস্তানী জেনারেলের উদ্দেশ্যের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ রয়েছে। আমি যুক্ত পাকিস্তানের বিরোধী।'

হো হো করে হেসে উঠল জেনারেল। হাসিটা একটু কমতেই বলে উঠল, 'আমিও তাই। ভয় নেই, আবার আপনাদের শাসন বা শোষণের পরিকল্পনা নেই আমাদের, মিস্টার আব্বাস মির্জা।'

'তাহলে কি উদ্দেশ্য আপনাদের? কেন এত টাকা ও সময় ব্যয় করছেন?'

'টাকা আমরা ব্যয় করছি না। ওটা আসছে তৃতীয় কোন পক্ষ থেকে। সময় যেটুকু দিচ্ছি তার একমাত্র কারণ আমরা বাংলাদেশের বন্ধু হিসেবে থাকতে চাই। আমাদের দুই দেশকে বিচ্ছিন্ন এবং শত্রুভাবাপন্ন করে রেখে দুজনের মাথাতেই ঘোল ঢালবে ভারত, এটা চাই না আমরা। আপনারা যাতে সত্যিকারের স্বাধীনতা অর্জন করতে পারেন, স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে পৃথিবীর বুকে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেন, আমাদের প্রচেষ্টা সেজন্যেই।'

'এই প্রচেষ্টা একাত্তরের মার্চ মাসে চালালে এত রক্ত ব্যয় হত না কোন পক্ষেরই।'

'ভুল হয়েছে আমাদের, স্বীকার করি, তাই বলে ভুল শোধরানো যাবে না, এমন কথা তো কোন হাদিসে লেখেনি।' গম্ভীর হলো জেনারেল। 'আপনাদের ক্ষোভের কারণ আমি বুঝতে পারি, মিস্টার আব্বাস মির্জা। কিন্তু অতীতের ডাস্টবিন না ঘেঁটে ইচ্ছে করলেই একটা সমঝোতায় আসতে পারি আমরা। কি বলেন, পারি না?'

চট করে কথার খেই ধরল উ-সেন। 'নিশ্চয়ই! পারা তো উচিত। জেনারেলের বক্তব্য শোনা গেল, এবার আপনার বক্তব্য কিছু শোনান আমাদের, মিস্টার আব্বাস মির্জা। ককটেল সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান দেখে সহজেই অনুমান করা যায়, ইসলামের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আপনি ''মুসলিম বাংলা''র প্রতিষ্ঠা কামনা করছেন না। কাজেই সহজ প্রশ্ন আসে, কোন আদর্শ অনুপ্রাণিত করল আপনাকে? প্রথমে বলুন, অস্ত্র পেলেন কোথায়?'

'অস্ত্র আমরা জমা দিইনি যুদ্ধের পর।'

'কেন?'

'ভারতীয় প্রভুত্ব পছন্দ হয়নি আমাদের।' হাসল রানা। 'আপনারা দূরে

বসে সব খবর রাখেন কিনা জানি না। ভারতীয় সৈনিকদের প্রাথমিক লুটতরাজের কথা বাদই দিলাম–ওটা স্বাভাবিক। কিন্তু ক্রমে ক্রমে আমাদের অর্থনীতি এখন সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে ভারতের ওপর, ভারতীয় নিয়ন্ত্রণ ক্রমেই নির্লজ্জভাবে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছে, আমাদের ফরেন পলিসির ডিকটেশন আসে এখন নয়াদিল্লী থেকে। কোন দেশ প্রেমিক সহ্য করবে এটা বলুন? এত রক্ত দিয়ে পাকিস্তানের হাত থেকে যে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনলাম, সে কি ভারতের আশ্রিত করদ রাজ্য হিসেবে কোনমতে ধুকধুক করে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যে? সাঁড়াশির চাপ যতই বাড়ছে, দেশের মানুষ ততই ভারতবিদ্বেষী হয়ে উঠছে। আপনারা কল্পনা করতে পারবেন না কি পরিমাণ মাস-সাপোর্ট পাব আমরা।'

যতটা সম্ভব কণ্ঠস্বরে একটা দেশপ্রেমের আবেগ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করল রানা। জেনারেলের চোখদুটো চকচকে হয়ে উঠেছে দেখে বুঝল নেহায়েত মন্দ অভিনয় হয়নি। কিন্তু আর বেশি কিছু বলবার সাহস হলো না রানার। উ-সেনকে বলল, 'আমার কথা তো শুনলেন, এবার আপনার কথা বলুন? এসবের মধ্যে আপনি জড়ালেন কি করে?'

'এটাই আমার ব্যবসা।' পরিষ্কার কণ্ঠে বলল উ-সেন। 'আমার সৌভাগ্য, আমি আপনাদের মত ধর্ম বা দেশপ্রেমের জ্বালায় পীড়িত হই না কখনও। এই অঞ্চলে একসময় আমি দুর্ধর্ষ এক দস্যু বলে পরিচিত ছিলাম। অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর থেকে আর ওসব ছোট কাজে হাত দিই না আমি সহজে। বুদ্ধি খাটিয়ে বড়সড় গোলমাল খুঁজে বের করার চেষ্টা করি। কপালগুণে পেয়েও গেছি চমৎকার উর্বর এক ক্ষেত্র। তিন দেশের তিনটি সমস্যাকে একসাথে গেঁথে দিয়ে আমি এখন মিডল্-ম্যানের কাজ করছি। গোটা দুয়েক মহাশক্তিকেও গেঁথে নিয়েছি বড়শিতে। ফলে ঝর্ণাধারার মত টাকার স্রোত বইছে আমার দিকে। আমিও বেশ আছি, বলতে গেলে মজাই পাচ্ছি তিন তিনটে দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে আমার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শুধু একটাই দুঃখ, আপনাদের যার যার কাজ উদ্ধার হয়ে গেলেই ভুলে যাবেন আমার কথা বেমালুম। আপনাদের মধ্যে এক-আধজন হয়তো কালক্রমে ইতিহাসের চরিত্র হয়ে যাবেন, কিন্তু যে এই ইতিহাসের গোড়ায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করল, যার মাথায় প্রথম এল এই সম্ভাবনার কথা, তার কথা লেখা হবে না কোথাও। আমি দস্যু, দস্যুই থেকে যাব চিরকাল।'

'তিন দেশের কথা বলছেন, ঠিক কি বোঝাতে চাইছেন বুঝতে পারলাম না।'

'বাংলাদেশের মুসলিম বাংলা গেরিলা ফৌজ, বার্মার অসন্তুষ্ট কারেন উপজাতি, আর ভারতে নিপীড়িত নাগা ও মিজো। এরা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। সমস্ত ডকুমেন্ট আছে এখানে, একটু পরেই দেখতে পাবেন। তিন দেশের তিনটে সমস্যা, এক এক করে সমাধান করা হবে। প্রথম–বাংলাদেশ।'

ডিনার সেরে ড্রইংরুমে এসে বসল সবাই।

'বুঝলাম,' বলল রানা। 'কিভাবে কি করতে চান? আপনাদের প্ল্যানটা কি?'

উত্তর দিল জেনারেল এহ্‌তেশাম। 'প্রথমত, প্রচুর পরিমাণে গেরিলা তৈরি করব আমরা। এখন আমাদের মোট সংখ্যা হচ্ছে আট হাজার, আপনার তিন হাজার পেলে হচ্ছে এগারো হাজার। ট্রেনিং কমপ্লিট হলেই এদেরকে পুশ করব আমরা দেশের অভ্যন্তরে। প্রথম কাজ বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত করে দেয়া। সেই সাথে চলতে থাকবে পলিটিক্যাল কিলিং। একের পর এক মারা যাবে জননেতা। ধ্বংস হতে থাকবে একের পর এক বড় বড় কল কারখানা, ইন্ডাস্ট্রি। ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ লেগে যাবে সারাদেশে। আর এই অসন্তোষের সুযোগে আমরা তুমুলভাবে ছড়াতে শুরু করব ভারতবিদ্বেষ। আবার একটা গৃহযুদ্ধ বেধে যাবে, রক্তের প্লাবন বয়ে যাবে সারা বাংলাদেশে...'

হাসি হাসি হয়ে উঠেছে পুলকিত জেনারেলের মুখ। রানা ভাবল, ওরে শালা হারামখোর, খুব মজা লাগছে বাংলাদেশের দুরবস্থার কথা কল্পনা করতেই। নেকড়ে বাবাজী ঠাকুমা সেজেছ! তোমরা যা খুশি করবে আর বাংলাদেশের লোক বসে বসে আঙুল চুষবে?

আরও কি কি বলে যাচ্ছে জেনারেল, রানার কানে ঢুকছে না, কারণ রানা ওর বাপ মা এবং চোদ্দগুষ্টি সংক্রান্ত নানান কথা ভাবছে আপনমনে, এমন সময় কর্কশ শব্দে বেজে উঠল টেলিফোন।

টেলিফোনটা কানে তুলে নিয়েই ভুরু কুঁচকে গেল উ-সেনের।

'কি বললে? ইয়ট নিয়ে চলে গেছে তো তোমরা কি করছিলে?...কখন?...আমাদের চারজনই মারা-গেছে? তিনজন?...ঠিক আছে, লাশ গায়েব করে ফেলো...হ্যাঁ, বুঝলাম, কি করতে হবে জানাচ্ছি আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে চাইল উ-সেন রানার দিকে। বলল, 'একশো আরাকানী আপনার ইয়ট দখল করে নিয়ে চলে গেছে।'

'বলেন কি।' একলাফে উঠে দাঁড়াল রানা।

'বসুন, ব্যস্ত হবার কিছুই নেই। ধরা পড়ে যাবে সবাই। অয়্যারলেসে খবর দিয়ে দেব ট্রেনিং ক্যাম্পে। কিন্তু ভাবছি, এত সাহস পেল কোথায় ওই জংলী ভূতগুলো? গাইডেন্স দিচ্ছে কে?'

'কিন্তু আরাকানীরা ইয়ট ছিনিয়ে নিতে গেল কেন? আপনার সাথে কোন গোলমাল আছে ওদের?'

'ওদের নেতাকে বন্দী করে রেখেছি আমি মান্দালয়ে। হয়তো তার শোধ নিল এইভাবে।'

'অস্ত্র দিয়ে কি করবে ওরা? ইয়টে অস্ত্র আছে সেকথাই বা জানল কি করে?'

'সেই কথাই তো ভাবছি। লিকেজটা কোথায়!' হুয়াং-এর দিকে ফিরল

উ-সেন। 'ডক্টর, তুমি কিছু বুঝতে পারছ?'

'না।' চিন্তিতমুখে উত্তর দিল হুয়াং। সরু লম্বা চুরুটে টান দিল, 'শুধু একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি, মিস্টার আব্বাস মির্জা আসার পর থেকেই অনেকগুলো অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে রেঙ্গুনে।'

একজন বেয়ারা এসে দাঁড়াল। উ-সেনকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইতে দেখে বলল, 'কর্নেল সাহেব এসেছেন, এক্ষুণি দেখা করতে চান জেনারেল এহতেশামের সাথে। বলছেন, অত্যন্ত জরুরী দরকার।'

'কি এমন জরুরী দরকার পড়ল আবার কর্নেলের।' প্রশ্নটা যেন নিজেকেই নিজে করল উ-সেন। তারপর আদেশ দিল, 'যাও, এখানে পাঠিয়ে দাও তাকে, তারপর দূর হয়ে যাও। আজকে আর দরকার হবে না তোমাদেরকে।'

সবার সামনে একগ্লাস করে শিকাগো ককটেল রাখল স্যুই থি।

আবার টেলিফোন এল। ভুরু কুঁচকে রিসিভার তুলে নিল উ-সেন।

'কি বললে।' ভুরু জোড়া কপালে উঠল উ-সেনের, 'অ্যাঁ! বেয়ারা বলছে একা ডিনার খায়নি? তাহলে কার সাথে খেয়েছে?...তাহলে মিথ্যে কথা বলেছে ফ্যান সু।...খোঁজ নাও।...কি? সিনেমায়? না, পালিয়েছে?'

দু'একটা কথা শুনেই বুঝেছে রানা, সময় উপস্থিত। সমূহ বিপদ এসে হাজির হয়েছে। ধরা পড়তে যাচ্ছে সে এক্ষুণি। এই অবস্থায় মন্ত্রমুগ্ধের মত উ-সেনের প্রত্যেকটি কথা শোনা উচিত ছিল, কিন্তু একটি কথাও কানে ঢুকছে না ওর।

কারণ আরও একটা বিপদ এসে হাজির হয়েছে তখন দরজায়। স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইল রানা নবাগত লোকটার দিকে।

ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, রানার এককালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, কর্নেল শেখ।

নয়

বিস্ময়ে বিস্ফারিত কর্নেল শেখের দুই চোখ। অবিশ্বাস ফুটে উঠল চোখের দৃষ্টিতে। তারপর দেখা দিল ভয়।

'রানা! তুমি এখানে! তুমি এখানে কেন?'

'আপনি চেনেন একে?' প্রশ্ন করল উ-সেন। 'রানা বলছেন কেন? এর নাম আব্বাস মির্জা নয়?'

'তুমি চেনো নাকি?' একই সাথে প্রশ্ন করল জেনারেল এহতেশাম। 'কিভাবে চেনো?'

রানার দুই হাত চলে গেল টেবিলের নিচে।

'চিনি মানে?' উত্তর দিল কর্নেল শেখ, 'ভাল করেই চিনি। একসাথে কাজ করেছি আমরা ঢাকায়। আমার চেয়ে ভাল করে আর কেউ চেনে না ওকে। ও হচ্ছে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের সেকেন্ড ম্যান। মেজর জেনারেল রাহাত খানের ডানহাত। ওর নাম মাসুদ রানা। ভয়ঙ্কর লোক। ও এখানে কেন?'

হুড়মুড় করে উল্টে গেল টেবিলটা। চেয়ার উল্টে মাটিতে পড়ল স্যুই থি এবং জেনারেল এহতেশাম। ঝনঝন শব্দে ভেঙে গেল দুটো ককটেল গ্লাস। বাম কনুই চালাল রানা বামপাশে বসা ডক্টর হুয়াং-এর সোলার-প্লেকসাসে। কাত হয়ে ঢলে পড়ল ডক্টর হুয়াং।

'সাবধান!' চিৎকার করে উঠল কর্নেল শেখ। 'ওকে থামান! নইলে সবাইকে মেরে ফেলবে ও একা, খালিহাতে!'

চেয়ার তুলে মারল রানা কর্নেল শেখের হাতে। পিস্তল বেরিয়ে এসেছিল ওর হাতে, ছিটকে চলে গেল সেটা ঘরের কোণে। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে একবার রানার দিকে চেয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ল সে জেনারেলের উপর। তুলে দাঁড় করাবার চেষ্টা করছে সে জেনারেলকে।

ফাইলটা তুলে নিয়েছিল উ-সেন টেবিল ওল্টাবার আগেই, এবার চট করে উঠে দাঁড়িয়ে রওনা হলো সে দেওয়ালের গায়ের দরজার দিকে। হাত বাড়িয়ে টাইটা ধরল রানা, কিন্তু কখন উঠে দাঁড়িয়েছে ডক্টর হুয়াং টের পায়নি সে। প্রকাণ্ড একটা স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন শোভা পাচ্ছে ওর হাতে। পেছন থেকে রানার ঘাড়ের পাশে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করল সে, সেইসাথে ধাক্কা মারল ওল্টানো টেবিলের দিকে। উঠে বসার চেষ্টা করছিল স্যুই থি, টেবিল টপকে ওর ঘাড়ের উপর পড়ল রানা।

'গুলি করুন, গুলি করুন!' চিৎকার করছে কর্নেল শেখ আতঙ্কিত কণ্ঠে। 'ওকে চেনেন না আপনারা! এক্ষুণি গুলি করুন, নইলে মারা পড়ব সবাই!'

গুলি করল হুয়াং। স্যুই থির মাথার দুই ইঞ্চি দূরে মেঝেতে লাগল গুলিটা। ভয় পেয়ে আর্তনাদ করে উঠল স্যুই থি। উঠতে যাচ্ছিল রানা, দুই হাতে গলা জড়িয়ে ধরল স্যুই থি। কনুই দিয়ে ওর কাঁধের নরম মাংসে জোরে একটা চাপ দিল রানা। তীক্ষ্ণ চিৎকার করে ছেড়ে দিল সে রানার গলা। উঠে পড়ল রানা।

মুশকিল হয়ে গেছে ডক্টর হুয়াং-এর। রানাকে ধাক্কা দিতে গিয়ে পুরু লেন্সের চশমাটা পড়ে গেছে মাটিতে। খুঁজবার সময় নেই, গুলি করা দরকার, কিন্তু গুলি ঠিক লক্ষ্যে পৌঁছুবে কিনা বুঝতে পারছে না। স্যুই থির চিৎকার শুনে ওর ধারণা হয়েছে ওকেই বুঝি লেগেছে প্রথম গুলিটা, দ্বিতীয় চিৎকার শুনে কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছে, কিন্তু আর গুলি করতে ভরসা পাচ্ছে না।

চলে যাচ্ছে উ-সেন। একলাফে পৌঁছে গেল রানা। প্রথমেই থাবা দিয়ে ফেলে দিল ওর চশমা। পরমুহূর্তে মারল ওর চরম মার। খুলিটা ঠিক যেখানে ঘাড়ের সাথে মিশেছে, আঙুলগুলো সোজা রেখে দেহের সর্বশক্তি দিয়ে মারল

সেখানে কারাতের কোপ, হাতটা সামান্য একটু উপর দিকে কাত করে। নিখুঁতভাবে মারল রানা। যে কোন লোকের অডন্টয়েড প্রসেস সেঁধিয়ে যাবে মেডুলার মধ্যে, ভেঙে ডিজলোকেটেড হয়ে যাবে ভেতরের হাড় একটিমাত্র আঘাতে–মৃত্যু হবে তৎক্ষণাৎ। মুখের দিকে না চেয়েই বুঝতে পারল রানা, মারা গেছে উ-সেন। ফাইলটা পড়ে গেছে হাত থেকে, পড়ে যাচ্ছে লম্বা আড়ষ্ট দেহটা।

আবার গুলি করল হুয়াং। লক্ষ টাকা দামের একটা অয়েল পেইন্টিং বরবাদ হয়ে গেল। ঝট করে উ-সেনের আড়ালে চলে গেল রানা, তারপর জোরে ধাক্কা দিল মৃতদেহটা সামনের দিকে। এই ফাঁকে চট করে চোখ পড়ল রানার, উঠে দাঁড়িয়েছে কর্নেল শেখ জেনারেলকে টেবিলের নিচে থেকে বের করে নিয়ে।

এদিকে হুয়াং-এর উপর গিয়ে পড়েছে উ-সেনের লাশ। পড়ে গেছে সে, নিচ থেকে উঠতে পারছে না। পিস্তল ধরা হাতটা শূন্যে দুলছে আছড়ে-পাছড়ে বেরোবার চেষ্টা করছে বলে। দুই পা এগিয়েই লাথি মারল রানা হুয়াং-এর কবজিতে। ব্যথায় ককিয়ে উঠল হুয়াং। পিস্তলটা ছিটকে গিয়ে পড়ল দশ হাত তফাতে।

জেনারেলের দিকে ফিরল এবার রানা। জেনারেলকে টেনে-হিঁচড়ে বের করে নিয়ে যাচ্ছে কর্নেল শেখ। ওল্টানো টেবিলটা টপকে ছুটল রানা সেদিকে, কিন্তু একটা পা ধরে ফেলল স্যুই থি। পড়ে গেল রানা। ব্যথা পেল হাঁটুতে। ক্ষুধার্ত বাঘিনীর মত ঝাঁপিয়ে পড়ল পিঠের উপর স্যুই থি। দুই হাতে কিল মারল কয়েকটা, তারপর লম্বা লম্বা নখ দিয়ে খামচাতে শুরু করল। ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস পড়ছে ওর, নখগুলো এখন খুঁজছে রানার চোখ। ঝট করে ঘুরল রানা। দেখল তীব্র ঘৃণায় বিকৃত হয়ে গেছে স্যুই থি-র মুখটা। দড়াম করে ঘুসি মারল রানা ওর তলপেটে। মুহূর্তে দূর হয়ে গেল সমস্ত ঘৃণা। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারা। ঢলে পড়ল একপাশে, দম নিতে পারছে না, পেটে হাত চেপে গড়াগড়ি শুরু করল সে।

পনেরোতলায় যাবার দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছে শেখ জেনারেলকে নিয়ে।

মেঝে থেকে ফাইলটা কুড়িয়ে নিয়েই ছুটল রানা। সিঁড়ি বেয়ে অর্ধেকের বেশি উঠে গেছে ওরা। একেক লাফে চার সিঁড়ি করে টপকে উঠতে শুরু করল রানা। পেছন ফিরে রানাকে দেখেই দ্রুততর হলো ওদের গতি, কিন্তু প্রায় পৌঁছে গেছে রানা। লাফ দিল সে কর্নেল শেখের হাঁটু লক্ষ্য করে। দুর্ভাগ্য রানার, পিছলে গেল পা। প্রথমে পড়ল কনুই, তারপর সিঁড়ির কিনারে আছড়ে পড়ল হাঁটুর নিচের শক্ত হাড়। মাথাটা বাঁচাতে চেষ্টা করল রানা নিজের অজান্তেই, পারল না–জোরে ঠুকে গেল কপালটা সিঁড়ির উপর। কয়েক সেকেন্ডের জন্যে বোধশক্তি হারাল সে অবর্ণনীয় তীক্ষ্ণ ব্যথায়।

ধীরে ধীরে মাথা তুলে উপরদিকে চাইল রানা। অদৃশ্য হয়ে গেছে কর্নেল

শেখ জেনারেলকে নিয়ে। হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেয়ে আবার ছুটল রানা ক্ষ্যাপা কুকুরের মত। ডানদিকের করিডরের চতুর্থ ঘরটায় ঢুকছে ওরা। রানা পৌঁছবার আগেই ভেতর থেকে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। দেহের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে কাঁধ দিয়ে ধাক্কা মারল রানা দরজার গায়ে। যেমন ছিল তেমনি রইল দরজাটা, যেন ইস্পাত দিয়ে তৈরি।

বুম করে গুলির আওয়াজ হলো। রানার তিন হাত দূরে দেয়ালের গায়ে লেগে এক খাবলা প্লাস্টার তুলে নিয়ে বিঙ্ঙ্ করে চলে গেল বুলেটটা। পিস্তল দুটো নিচে ওভাবে ফেলে রেখে ঝোঁকের মাথায় খালিহাতে চলে আসায় রাগ হলো নিজের উপরই। পেছন ফিরে দেখল, ডক্টর হুয়াং শুয়ে আছে সিঁড়ির মাথায়। দুই কনুই মেঝেতে রেখে দুই হাতে ধরেছে সে পিস্তলটা। একমাত্র ভরসা, চশমাটা আনতে ভুলে গেছে সে তাড়াহুড়োয়। সামনের দিকে চেয়ে দমে গেল রানা। লম্বা, ফাঁকা করিডর, দুপাশে সারি সারি বন্ধ দরজা। একলাফে চলে এল সে কর্নেল আর জেনারেল যে ঘরে ঢুকেছে, তার ঠিক উল্টোদিকের দরজার সামনে। বুম্‌ম্! এবারের গুলিটা সোজা করিডর পেরিয়ে গিয়ে ঠুস্ করে শেষ মাথার কাচের জানালা ভেদ করে বেরিয়ে গেল।

হ্যান্ডেলে চাপ দিতেই খুলে গেল দরজা। অন্ধকার ঘর। ঢুকেই চাবি লাগিয়ে দিল রানা। সেঁটে দাঁড়িয়ে রইল দেয়ালের গায়ে। স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসনের ছয়টা গুলির চারটে ব্যয় হয়ে গেছে আগেই, পঞ্চমটা দুই ইঞ্চি পুরু সেগুন কাঠের দরজা ভেদ করে চুরমার করে দিল ড্রেসিং টেবিলের দামী বেলজিয়াম গ্লাসটা। আর আছে একটা গুলি। ঝুঁকিটা নেয়াই স্থির করল রানা। হাত বাড়িয়ে চাবি ঘুরিয়ে তালা খুলে দিল দরজার।

ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে দরজাটা। পিস্তলটা দেখা দিল সর্বপ্রথম। প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রানা দেয়ালের সাথে মিশে। শেষ গুলিটা খরচ করার আগে নিশ্চয়ই লাইট জ্বালবার চেষ্টা করবে হুয়াং। কিন্তু দরজার গায়ে হাত বোলাতে দেখেই টের পেল রানা, ওর মতলব অন্যরকম। এগোল রানা। কোনরকম লক্ষ্য স্থির না করেই গুলি করল হুয়াং। ছাতে গিয়ে লাগল গুলি। ততক্ষণে চাবিটা খুলে নিয়েছে হুয়াং। ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা। বাম হাতের আঙুলের ওপর খটাস করে মারল হুয়াং পিস্তলের বাঁট দিয়ে। দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা, ক্লিক করে তালা বন্ধ হওয়ার শব্দ হলো।

দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে রানা। আঙুলগুলো ব্যথা করছে, ঘাড়টাও টনটন করছে, গালে কপালে যেসব জায়গায় স্যুই থির নখের আঁচড় লেগেছে, সেসব জায়গা জ্বলছে নোনতা ঘাম লেগে। আধ মিনিট চিন্তা করল রানা। এই খাঁচার মধ্যে মিনিট পনেরো আটকে রাখতে পারলেই লোকজন সংগ্রহ করে কিংবা পিস্তল রিলোড করে রানাকে গ্রেপ্তার করা হুয়াং-এর জন্যে অতি সহজ কাজ। বেরোতে হবে। কিন্তু কিভাবে? একমাত্র পথ জানালা। এগিয়ে গেল রানা জানালার দিকে। কাচের জানালাটা খুলে বাইরে মাথা বের করল সে।

ঘুরে উঠল মাথাটা। পনেরো তলা নিচে রাস্তা দেখা যাচ্ছে। প্রচুর

লোকজন চলাচল করছে রাস্তায়। গাড়ি, অটোরিকশা, ট্রাক, বাস চলে যাচ্ছে সাঁই সাঁই। উজ্জ্বল আলো জ্বলছে রাস্তায়, দোকানে। বিচিত্র-বর্ণ জামাকাপড় পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে মুক্ত, স্বাধীন অসংখ্য বর্মী মেয়ে-পুরুষ। এত উঁচু থেকে ছোট ছোট পুতুলের মত লাগছে ওদেরকে। রানা ধরা পড়ে গেছে ইঁদুরের কলে। ল্যাম্পপোস্টগুলোর আলো রাস্তা আলোকিত করেছে ঠিকই, কিন্তু উপরে আসছে না। রানার মনে হচ্ছে একটা আলোকিত অ্যাকুয়ারিয়াম দেখছে সে। চাঁদের ম্লান আলো পড়েছে দালানের গায়ে। যা খুঁজছিল তা পেল না রানা। পনেরোতলা থেকে একেবারে নিচ পর্যন্ত খাড়া নেমে গেছে দেয়ালটা—কার্নিস নেই একটাও।

এবার সত্যি সত্যিই ভয় পেল রানা। ওয়ারড্রোবটা ঠেলে রেখে এল দরজার গায়ে। আবার এসে দাঁড়াল জানালার পাশে। ব্যাটন বগলে চেপে চুরুট ফুঁকছে একজন ট্রাফিক পুলিস। এখন এদের সাহায্য চেয়ে লাভ নেই, তার আগেই খতম হয়ে যাবে সে। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বেরোতে হবে এখান থেকে। কিন্তু কি করে?

একটাই মাত্র পথ আছে। কিন্তু সে পথে চেষ্টা করতে গেলে পাঁচ মিনিটের আগেই খতম হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। পাঁচ সেকেন্ড লাগবে ও পথে পরপারে চলে যেতে, তবু ওইটাই এখন একমাত্র পথ। জানালা দিয়েই বেরোতে হবে ওকে।

জুতোর গোড়ালি থেকে ছুরিটা বের করে আনল রানা। ডাবল-বেড বিছানার চাদরটা কেটে ছয় টুকরো করল, শক্ত করে গিঁঠ দিল একটার সাথে আরেকটা, তারপর আবার গিয়ে দাঁড়াল জানালার পাশে। দড়ির এক মাথা বাঁধল জানালার একটা লোহার শক্ত হিঞ্জের সাথে। টেনে দেখল ভার সইতে পারবে কিনা। মোটামুটি নিশ্চিন্ত হয়ে দড়িটা ফেলে দিল বাইরের দিকে। এবার শার্টের গোটাকয়েক বোতাম খুলে ফাইলটা ঢুকিয়ে দিল গেঞ্জির নিচে। বুকের কাছে বর্মের মত আটকে রইল ফাইলটা। শার্টের বোতাম লাগিয়ে দিয়ে জানালাটা যেই টপকাতে যাচ্ছে, অমনি শোনা গেল ডক্টর হুয়াং-এর কণ্ঠস্বর।

'মিস্টার মাসুদ রানা, রিলোড করা হয়ে গেছে, তালা খুলে দিচ্ছি আমি, মাথার উপর হাত তুলে বেরিয়ে আসুন। এই ঘরে কোন অস্ত্র নেই, আমি জানি। ভাল চান তো বেরিয়ে আসুন, নইলে আমি ঢুকব। আমাকে ঢুকতে হলে দেখামাত্র গুলি করা ছাড়া উপায় থাকবে না আমার।'

দড়ি বেয়ে সড় সড় করে নেমে এল রানা হাতদশেক। যখন থামল, গিঁঠগুলো চেপে বসল আরও, ইঞ্চি দুয়েক নেমে গেল সে আপনাআপনি। ধক করে উঠল ওর বুকের ভেতরটা দড়ি ছিঁড়ে পড়ে যাচ্ছে মনে করে। চট করে চোখ গেল বহু নিচে ব্যস্ত রাজপথের দিকে। সবাই নিশ্চিন্তে চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। কেউ কল্পনাও করতে পারছে না দেড়শো ফুট উঁচুতে সার্কাসের মহড়া দিচ্ছে এক বিদেশী অ্যাক্রোব্যাট, প্রাণের দায়ে।

ঘড়ির পেন্ডুলামের মত দুলতে শুরু করল রানা। ক্রমেই বাড়তে থাকল ঝুল। পাশের ঘরের জানালার কাছে পৌঁছুতে হবে।

মাঝে মাঝেই দেয়ালের গায়ে ঘষা খাচ্ছে শরীরটা। যতটা সম্ভব পা দিয়ে ঠেকাবার চেষ্টা করছে রানা, কিন্তু ইতোমধ্যেই গোটাকয়েক রাম-ঘষা খেয়েছে সে বাম কনুই আর হাঁটুতে। আর দু'তিনটে খেলেই সিকি ইঞ্চি চামড়া গায়েব হয়ে যাবে ওর ওসব জায়গা থেকে।

পাশের ঘরের জানালার কাছাকাছি পৌঁছুতেই টের পেল রানা, আরও হাতদুয়েক নামতে হবে। দোলায়িত অবস্থাতেই আরও দুই হাত নামল রানা, দোলার গতি বাড়িয়ে দিল শরীর বাঁকিয়ে। হাত দুটো অবশ হয়ে আসতে চাইছে, কিন্তু এখন আর মত পাল্টাবার উপায় নেই, যেটা করছে সেটাই শেষ পর্যন্ত করে দেখতে হবে–আসলে বারো হাত দড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার শক্তি নেই আর ওর হাতে। প্রথম সুযোগেই এক লাথি দিয়ে বেশ খানিকটা কাচ ভেঙে ফেলল রানা। ছিটকিনির কাছাকাছি লক্ষ্য স্থির করেছিল যাতে প্রয়োজন হলে ওটা খোলা যায়। আবার ঝুল খেয়ে ফিরে এল রানা পাশের ঘরের জানালার কাছে। এবার আরেকটা লাথি দিয়ে আরও খানিকটা কাচ খসিয়ে দিল সে। আর বড়জোর দু'বার ঝুল খাওয়ার শক্তি আছে হাতে, এর মধ্যে কাজ সারতে না পারলে খসে যাবে দড়িটা হাত থেকে, এবং...। দাঁতে দাঁত চেপে রয়েছে রানা, আঙুলগুলো আড়ষ্ট হয়ে গেছে ব্যথায়। দুই বাহু ঠকঠক করে কাঁপছে ম্যালেরিয়া রোগীর মত। পরেরবার জানালা পর্যন্ত পৌঁছুতেই পারল না রানা। মাঝপথে জোরে এক ঘষা খেল কনুইয়ের ছড়ে যাওয়া জায়গাটায়। হায় হায়! ছুটে গিয়েছিল দড়িটা হাত থেকে, পাগলের মত হাতড়ে আবার ধরে ফেলল রানা। পট্ পট্ শব্দ হলো কাপড়ের দড়িতে। বুঝতে পারল, এত ওজন পছন্দ হচ্ছে না ওটার, এখন যে কোন মুহূর্তে ছিঁড়ে যেতে পারে। প্রাণপণে শেষবারের মত দোল খেল রানা, জানালার কাছে পৌঁছে ভাঙা জায়গা দিয়ে পা ঢুকিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু দেহ-মনের বোঝাপড়া আর আগের মত নেই, সিনক্রোনাইযেশন হারিয়ে ফেলেছে সে। পর পর দুই পায়েই চেষ্টা করল, কিন্তু একটা পাও ঢোকাতে পারল না ফাঁক দিয়ে। দপ করে নিবে গেল সব আশা, চেতনা লোপ পেতে চাইল রানার। কোনমতে টিকে রইল সে।

ঝরঝর করে ঘাম ঝরছে সর্বাঙ্গ থেকে। টপ করে ভুরু থেকে এক ফোঁটা খসে পড়ল চোখের মধ্যে। দাঁতে দাঁত চেপে বিড়বিড় করে নিজেকে নিজে গাল দিচ্ছে রানা এখন অনর্গল–আরেকবার, আরেকবার চেষ্টা কর শুয়োর, হাল ছেড়ে দিলে চলবে না, টিকে থাক্ কুত্তা, ঠিক হয়ে যাবে এক্ষুণি, আর একটা বার উল্লুক, আর একটা বার...

চোখের পাতা বারকয়েক মিটমিট করল রানা। হ্যাঁ, আবার দেখতে পাচ্ছে সে। আরেক ঘষা খেল সে কাঁধে, কিন্তু পা দিয়ে গতিটা বজায় রাখল। আবার ফিরে এল জানালার কাছে। সমস্ত মানসিক শক্তি একত্রিত করে বাম পা-টা চালাল রানা। হাঁটু পর্যন্ত ঢুকে গেল বাম পা, কিন্তু জোর ঝাঁকি খেয়ে

হাত ছুটে গেল ওর দড়ি থেকে।

আর ভয় নেই। এক পায়ে ঝুলে রইল সে পনেরোতলার জানালায় মাথা নিচু পা উঁচু অবস্থায়। বিশ সেকেন্ড বিশ্রাম নিল, তারপর শরীরটা বাঁকা করে ওপরে উঠিয়ে খুলে ফেলল জানালার বল্টু। পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে পাশের ঘরে প্রবেশ করল রানা। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে টিপে টিপে দুই হাতের আঙুল, বাইসেপ আর কাঁধের আড়ষ্টতা দূর করল সে, তারপর এগিয়ে এসে কান রাখল দরজায়। খুব কাছেই খস খস আওয়াজ পেয়ে সামান্য ফাঁক করল দরজাটা। দেখল ঠিক ওরই মত পাশের ঘরের দরজাটা সামান্য ফাঁক করে উঁকি দিচ্ছে ডক্টর হুয়াং করিডোরে দাঁড়িয়ে।

'মিস্টার মাসুদ রানা,' তেমনি শাসাচ্ছে হুয়াং, 'আমার সাথে পাঁচ ছয়জন পিস্তলধারী রয়েছে। যদি প্রাণে বাঁচতে চান, মাথার ওপর হাত তুলে বেরিয়ে আসুন। বিশ্বাস করুন, কোন উপায় নেই আর আপনার। পাঁচ পর্যন্ত গুনছি, এর মধ্যে বেরিয়ে না এলে আমরা সবাই ঢুকব একসাথে ঘরের ভেতর, দেখামাত্র গুলি করা হবে আপনাকে। এক...দুই...'

পাঁচ গোণার আগেই বেরিয়ে এল রানা নিঃশব্দে। পেছন থেকে মৃদু চাপড় দিল হুয়াং-এর পিঠে। ভয়ানক চমকে পিছু ফিরল হুয়াং। রানাকে দেখে সেকেন্ড দুয়েক বুঝেই উঠতে পারল না সে ব্যাপারটা, যখন বুঝল তখন স্পষ্ট আতঙ্ক ফুটে উঠল ওর চোখে মুখে। অন্তরাত্মা খাঁচা ছাড়ার দশা হলো। সামলে নেয়ার আগেই প্রচণ্ড এক ঘুসি এসে লাগল নাকের উপর, পরমুহূর্তে জুডো চপ পড়ল ঘাড়ের পাশে। বিনা দ্বিধায় জ্ঞান হারাল সে। এবার আর ভুল করল না রানা। পিস্তলটা তুলে নিল মেঝে থেকে, জ্ঞানহীন দেহটা টেনে ঘরের মধ্যে ফেলে তালা লাগিয়ে দিল বাইরে থেকে।

দ্রুতপায়ে নেমে এল রানা। যেমন রেখে গিয়েছিল, ঠিক তেমনি পড়ে রয়েছে উ-সেন। স্যুই থি জ্ঞান ফিরে পেয়ে এপাশ ওপাশ মাথা ঝাঁকাচ্ছে, রানাকে দেখে ভীতি দেখা দিল ওর চোখে। একটা ফ্লাইং কিস্ উপহার দিল রানা ওকে। গেঞ্জির নিচে থেকে ফাইলটা বের করে হাতে নিল। নিচু হয়ে উ-সেনের খোলা চোখের দিকে চাইল সে এক সেকেন্ডের জন্যে। অন্ধ চোখদুটো স্থির। যন্ত্রণার কোন ছাপ নেই সে চোখে। নিমেষের মধ্যে মৃত্যু হয়েছে–কষ্ট পেয়ে মরেনি লোকটা।

এখানে আর সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না। আজ সারারাত ঘর থেকে বেরোবে না কর্নেল শেখ আর জেনারেল এহ্তেশাম। কিছুই করবার উপায় নেই রানার। কাগজপত্র হাতে এসে গেছে, এরা তৎপর হয়ে ওঠার আগেই নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। লিফটে উঠল সে দ্রুতপায়ে। নাগরদোলার মত পাকস্থলী শিরশিরানো গতিতে নেমে এল কারপার্কে।

দশ

সিট্রন ডি.এস. নিয়ে বেরিয়ে এল রানা আন্ডারগ্রাউন্ড কার পার্ক থেকে রাস্তায়। একটা লাল রঙের ফিয়াট সিক্স-হানড্রেড ছোট্ট গর্জন তুলে স্টার্ট নিল কাছাকাছি একটা গলিমুখে।

এ রাস্তায় ও রাস্তায় ঘুরল রানা মিনিট দশেক। মনে মনে ভবিষ্যৎ কর্তব্য স্থির করছে সে। নানকিং হোটেলে লোক আছে উ-সেনের, এখন কি সেখানে যাওয়া ঠিক হবে? গুপ্ত দম্পতির সাথে রানার যে যোগ রয়েছে সেকথা জানা হয়ে গেছে উ-সেনের দলের, ওদের সাহায্য নেয়া কি ঠিক হবে? কি করবে রানা?

কর্তব্য পরে ঠিক করা যাবে, ভাবল রানা। এখন প্রথম কাজ ওদের সাবধান করে দেয়া।

কয়েকটা ব্যাপারে খটকা রয়ে গেছে রানার মনে, গোলমেলে ঠেকছে গোটাকতক ঘটনা। কিন্তু হাজার ভেবেও এর সমাধান বের করা যাবে না, বুঝতে পারছে সে। কাজেই মাথা থেকে দূর করে দিল সে বিক্ষিপ্ত ভাবনাগুলো। আগের কাজ আগে।

মিনিট দশেক ঘোরাঘুরির পর যখন পরিষ্কার বুঝতে পারল লাল ফিয়াট ছাড়া আর কোন গাড়ি অনুসরণ করছে না, তখন একটা সিনেমা হলের সামনে সার বাঁধা গাড়ির ভিড়ে আরেক গাড়ির পেছনে সিট্রন ডি. এস-এর নাক ঠেকিয়ে দিয়ে নেমে এল সে। রাস্তায় অপেক্ষা করছে লাল ফিয়াট। রানা এগোতেই বামপাশের দরজা খুলে হাঁ হয়ে গেল। উঠে বসল রানা। গাড়ি ছেড়ে দিল সোফিয়া মং লাই।

'প্রথমেই চলো এমন কোন গোপন জায়গায় যেখানে টেলিফোন আছে।' সোফিয়ার দিকে চাইল রানা। 'আছে এরকম কোন নিরাপদ জায়গা?'

'আছে।'

'বার্মিজ পোশাকে কিন্তু চমৎকার লাগছে তোমাকে।'

'ধন্যবাদ।' মিষ্টি করে হাসল সোফিয়া।

জেটির দিকে গাড়ি ঘুরিয়ে নিল সোফিয়া। মিনিট দুয়েক চুপচাপ কাটল। সিগারেট ধরাল রানা। একবুক ধোঁয়া নিয়ে ছাড়ল আয়েস করে, ঝিরঝিরে হাওয়ায় প্রাণটা জুড়িয়ে গেল ওর, পনেরোতলা বিল্ডিং-এর দুঃস্বপ্ন দূর হয়ে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার বাবার খবর জানতে চাইলে না?'

'একা ফিরতে দেখেই বুঝতে পেরেছি বাবা এখানে নেই, থাকলে কিছুতেই একা আসতেন না আপনি।' রানাকে অবাক হয়ে চাইতে দেখে বলল, 'আমার মধ্যে দুর্ধর্ষ ভয়ঙ্কর, আদিম আরাকানীর রক্ত আছে–মানুষ

চিনতে ভুল হয় না আমার। লক্ষ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে আমার মধ্যে। তাছাড়া পনেরো তলার এক জানালা থেকে আরেক জানালায় যেতে দেখেছি আমি আপনাকে। সেটা দেখে, এবং তারপর আপনার হাতে ফাইল দেখে সহজেই অনুমান করতে পারছি কি ঝড় বয়ে গেছে ওখানে। কে জয়ী হয়েছে বুঝতে খুব বেশি বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না।' সোজাসুজি চাইল সোফিয়া রানার চোখে অকপট দৃষ্টিতে, 'সন্ধান পেয়েছেন?'

'মান্দালয়ে বন্দী করে রাখা হয়েছে তোমার বাবাকে।'

মাথা ঝাঁকাল সোফিয়া। কোন কথা না বলে গাড়ি চালানোয় মন দিল। দশ মিনিটে পৌঁছে গেল ওরা নদীর ধারের একটা দোতলা বাড়িতে। সোজা সিঁড়ি বেয়ে দোতলার চিলেকোঠায় উঠে এল রানা সোফিয়ার পিছু পিছু। ছোট্ট একটা ঘর, বাথরূম আছে অ্যাটাচড। সিঙ্গল একটা খাট দেয়ালের গায়ে লাগানো, আলনায় ভাঁজ করা দামী কাপড়, অন্তর্বাস ঝুলছে। টেবিলের উপর টুকিটাকি প্রসাধনী। তেপায়ার উপর দাঁড়িয়ে নদীর দিকে চেয়ে রয়েছে একটা শক্তিশালী টেলিস্কোপ। রানা বুঝতে পারল কিভাবে রানার ছদ্মবেশের কথা জেনেছিল সোফিয়া। খাটের মাথার কাছে তেপায়ার উপর রাখা টেলিফোনটা দেখে খুশি হলো রানা সবচেয়ে বেশি। বসে পড়ল সে খাটের কিনারে। বলল, 'কাল ধরা পড়ার হাত থেকে বাঁচলে কি করে?'

'ডেকের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আপনাদের সব কথা শুনেছিলাম আমি কাল।' হাসল সোফিয়া। 'ফলে জামা-কাপড় জুতোর দু'শো গজের মধ্যে যাইনি।' একটু যেন লজ্জা পেল, 'ওই রকম ন্যাংটো হয়েই ফিরে এসেছিলাম এখানে লুকিয়ে লুকিয়ে।'

ফাইলটা খুলল রানা। দশ মিনিট ধরে উল্টে গেল একটার পর একটা পাতা। মাঝে মাঝে মন দিয়ে পড়ল কয়েকটা পৃষ্ঠা, বাকিগুলো উল্টে গেল চোখ বুলিয়েই। গোটা কয়েক নকশা রয়েছে ফাইলে, নকশাগুলোর উপরে কয়েকটা বিভিন্ন রঙের চিহ্ন রয়েছে কেবল—কোন্ অঞ্চলের নক্সা বুঝতে পারল না রানা। কিন্তু মনে মনে মুখস্থ করে ফেলল প্রতিটা দাগ। কয়েকটা কাগজে বিদেশী শক্তির প্রত্যক্ষ সাহায্যের স্বীকৃতি রয়েছে। এগুলো পড়তে পড়তে মেজর জেনারেল রাহাত খানের মুখের চেহারা কি আকার ধারণ করবে ভাবতে গিয়ে হেসে ফেলল রানা। বন্ধ করে দিল ফাইল।

'আপনার নির্দেশমত আমার একশো লোককে পাঠিয়ে দিয়েছি আকিয়াবের পথে...'

'শুনেছি খবরটা।'

'এইবার?' প্রশ্ন করল সোফিয়া। 'এখন কি করতে হবে আমাকে?'

'মান্দালয়ে যেতে হবে।' সহজ উত্তর দিল রানা।

'আর আপনি?'

'ভাবছি।' বলল রানা গম্ভীরভাবে। 'আমার ওপর হুকুম আছে, কাজ শেষ হলেই নানকিং হোটেলের সেই মহিলার হাতে নিজেকে সমর্পণ করতে হবে।

গোপনে পাচার করবে সে আমাকে রেঙ্গুন থেকে ব্যাংকক। আমার কাজ শেষ।'

'এখন সেই মহিলার কাছে চলেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে আমার বাবাকে উদ্ধার করব কি করে?' চিন্তিত হয়ে পড়ল সোফিয়া। 'হুকুম যদি থাকে তাহলে তো মানতেই হবে তা আপনাকে।'

'সেই সাথে আমাকে এ-ও বলে দেয়া হয়েছে, যা ভাল বোঝো অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করবে।'

'কি ভাবছেন?'

'ভাবছি, বিবাহিতা মহিলার কাছে আত্মসমর্পণ করব, না, অবিবাহিতা মহিলার কাছে...'

হাসল সোফিয়া। বলল, 'কোন্‌টা বেশি লোভনীয় মনে হচ্ছে?'

'শেষেরটা।'

চট করে রানার দিকে চাইল সোফিয়া। 'তার মানে সাহায্য পাচ্ছি আপনার?' রানাকে মাথা ঝাঁকাতে দেখে বলল, 'অনেক ধন্যবাদ। আপনি বাঁচালেন আমাকে। নানকিং হোটেলে যাচ্ছেন না তাহলে?'

'যাচ্ছি, কিন্তু পাচার হচ্ছি না। এই ফাইলটা তুলে দেব শুধু ওদের হাতে।'

'আমার আকুল অনুরোধ ছাড়া আর কোন কারণ আছে এই মত পরিবর্তনের?'

'আছে। পাঁচটা কারণ আছে।'

'কি সেগুলো?'

'জানতে চাইছ কেন?'

'একসাথে কাজ করতে হলে পরস্পরের ভাবনা-চিন্তা জানা দরকার।'

'আমার একমাত্র ভাবনা এবং চিন্তা হচ্ছে কি করে তোমার সাথে ভাব করা যায়। তোমাকে ইয়টে দেখার পর থেকে মনটা বড় ব্যাকুল হয়ে রয়েছে।'

'এড়িয়ে যাচ্ছেন আমার প্রশ্ন।'

'ঠিক আছে, শোনো তাহলে। প্রথমত, আমাকে পাচার করবার যে পদ্ধতির কথা শুনলাম, সেটা আমার মোটেই পছন্দ হয়নি। দ্বিতীয়ত, ওরা জেনে গেছে যে আমি গতকাল নানকিং হোটেলে একা ডিনার খাইনি, কার সাথে খেয়েছি খুব সম্ভব তাও জেনে গেছে—কাজেই এখন ওদের সাহায্য নেয়াটা রিস্কি। তৃতীয়ত, আমি মনে করি, আমার কাজের মাত্র চারভাগের এক ভাগ সারা হয়েছে। বাকিটুকু সারতে হলে তোমার বাবার সাহায্য দরকার আমার। সাহায্য পেতে হলে প্রথমে তাকে মুক্ত করতে হবে। চতুর্থত, আজকের পৃথিবীতে সহজ সরল সুন্দর অথচ ভয়ঙ্কর মেয়ে দুর্লভ। মেয়েটাকে ভাল লেগে গেছে আমার। তার মুখে হাসি ফোটাতে পারলে ধন্য মনে করব

নিজেকে।'

রানাকে থামতে দেখে জিজ্ঞেস করল সোফিয়া, 'আর পঞ্চম কারণ?'

'আর কোন কারণ নেই। একটা বেশি হাতে রেখেছিলাম, যদি কাজে লেগে যায়।'

মৃদু হাসল সোফিয়া। 'আজকে কি কি ঘটল উ-সেনের ওখানে? সামান্য একটু অংশ দেখতে পেয়েছি আমি, সবটা জানতে ইচ্ছে করছে। বলতে আপত্তি আছে?' একটা চেয়ার টেনে রানার মুখোমুখি বসল সে।

'দাঁড়াও, টেলিফোনটা সেরে নিই আগে।'

গাইড থেকে নম্বর বের করে রিং করল রানা নানকিং হোটেলে। রিসিভারের ওপর রুমাল চেপে ধরে বলল, 'পাঁচশো আশি নম্বর স্যুইটের মিস্টার অথবা মিসেস সরোজ গুপ্তকে দিন।'

রিং দিচ্ছে রিসেপশনিস্ট, শুনতে পাচ্ছে রানা। পুরানো আমলের টেলিফোন সিস্টেম। বার দশেক রিং হওয়ার পর রিসিভার তুলল কেউ।

রিসেপশনিস্ট বলছে, 'মিসেস গুপ্ত বলছেন?'

একটু ইতস্তত করার পর উত্তর এল, 'উনি তো নেই এখানে, সিনেমায় গেছেন।'

রিসেপশনিস্ট বলল, 'মিস্টার গুপ্ত বলছেন তো?'

আবার সামান্য দ্বিধা, তারপর উত্তর: 'হ্যাঁ।'

কি যেন বলতে যাচ্ছিল সোফিয়া, ঠোটের ওপর আঙুল রেখে চুপ করতে নির্দেশ দিল ওকে রানা। চুপ হয়ে গেল সোফিয়া।

রিসেপশনিস্ট বলল, 'আপনার টেলিফোন। কথা বলুন।'

রানাই প্রথম কথা বলল। ইংরেজিতে। 'মিস্টার গুপ্ত? আমি আব্বাস মির্জা বলছি। কেউ শুনছে না তো?'

'না। কি ব্যাপার?'

'বিপদে পড়েছি, সাহায্য দরকার আমার। আসব?'

'চলে আসুন।'

'কখন এলে সুবিধা হয় আপনাদের?'

'এক্ষুণি চলে আসুন। আমার মিসেস গেছে সিনেমায়। চলে আসুন, গল্প করা যাবে।'

'এক্ষুণি?' চিন্তিত রানার চোখ মুখ। ঘড়ি দেখল। 'এক্ষুণি তো আসতে পারছি না, ভাই। মাত্র খেতে বসেছি। এখন বাজে দশটা, আমি সোয়া এগারোটা নাগাদ পৌছুব, বড়জোর সাড়ে এগারোটা হবে।'

'সাড়ে এগারোটায় আমার মিসেসও ফিরবে। দুজন একসাথে এই ঘরে ঢোকা ঠিক হবে না। এগারোটার মধ্যেই চলে আসার চেষ্টা করুন। সেটাই ভাল হবে। দরজা খোলাই থাকবে, নক না করে সোজা ঢুকে পড়বেন। কেমন?'

'ঠিক আছে, ঠিক এগারোটায় পৌছুব আমি। রাখলাম।'

রিসিভারটা নামিয়ে রেখেই তড়াক করে উঠে দাঁড়াল রানা। পিস্তলটা বিছানার উপর রেখে দিয়ে রওনা হবার উপক্রম করল।

অবাক হয়ে রানার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল সোফিয়া, 'কোথায় যাচ্ছেন?'

'নানকিং হোটেল।'

'পৌঁছুতে মাত্র পনেরো মিনিট লাগবে। এগারোটার তো এক ঘণ্টা বাকি আছে।'

'ভাবছি, আগেই চলে যাই। শুভস্য শীঘ্রম।'

রওনা দিচ্ছিল রানা, চট করে ওর একটা হাত ধরে ফেলল সোফিয়া। 'কি হয়েছে? কোন বিপদ? আমার কাছে গোপন করছেন কেন?'

'গোপন করছি কোথায়?' হেসে কাটিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল রানা। 'ফিরে আসব আধ ঘণ্টার মধ্যেই।' আবার এগোবার চেষ্টা করল।

হ্যাঁচকা টান দিয়ে থামাল ওকে সোফিয়া। 'আমি যাব সাথে?'

'না।'

'কি হয়েছে? এত গম্ভীর কেন? বলতেই হবে আমাকে। না বললে আমিও যাব সাথে।' বাচ্চা মেয়ের মত গোঁ ধরল সোফিয়া। 'আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি, ভয়ানক কিছু ঘটেছে।'

মৃদু হাসল রানা। 'বুঝতে পারছি, মেয়েটা শুধু সহজ সরল সুন্দর ও ভয়ঙ্করই নয়, বুদ্ধিমতিও।' হাল ছেড়ে দিল সে। 'বলো, কি জানতে চাও?'

'টেলিফোনে মিথ্যে কথা বললেন কেন?'

'কারণ, যে টেলিফোন ধরেছিল সে সরোজ গুপ্ত নয়। অন্য লোক।'

সোফিয়ার দুই চোখে বিস্ময়। 'সেই জন্যেই নির্ধারিত সময়ের আগেই আচমকা গিয়ে হাজির হতে চাইছেন?' রানাকে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতে দেখে বলল, 'মারামারি হবে মনে হচ্ছে। খুনোখুনিও হতে পারে। আমাকে সাথে নিলে সুবিধে হতে পারে আপনার।'

'তুমি এখনও এক্সপোজড্ হওনি ওদের কাছে। স্কার্ট ছেড়ে সারং ধরায় চট করে চিনতেও পারবে না। এটা একটা মস্তবড় অ্যাডভান্টেজ। তোমার আপাতত আড়ালে থাকাই ভাল।'

কথাটার যৌক্তিকতা বুঝতে পারল সোফিয়া। বলল, 'এই বিপদের মধ্যে না গেলেই কি নয়? আপনার কি ধারণা সত্যিই বিপদে পড়েছে গুপ্ত দম্পতি?'

'হ্যাঁ। বেশি দেরি হয়ে গেলে বিপদের মাত্রা বাড়বে বই কমবে না। আমি এখানেই তোমার সাথে কন্ট্যাক্ট করব। চলি।'

হঠাৎ দুই হাতে রানার গলা জড়িয়ে ধরে চুমো খেলো সোফিয়া রানার ঠোঁটে–প্রথমে অপটু আড়ষ্টভাবে, দ্বিতীয়বার হৃদয়ের আবেগ মিশিয়ে। মৃদু মধুর শ্যাম্পুর গন্ধটা পেল রানা আবার। রানার বুকের সাথে সেঁটে গালে গলায় বন্য জন্তুর মত গাল ঘষল, কপাল ঘষল সোফিয়া। তারপর যেমন অকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তেমনি হঠাৎই ছেড়ে দিল সে রানাকে।

ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল রানা। কানে বাজছে সোফিয়ার

সাবধানবাণী—সাবধানে থেকো, প্লীজ। তোমাকে আমার দরকার।

নানকিং হোটেল। ছয়তলার লম্বা করিডর ধরে এগিয়ে যাচ্ছে রানা ৫৮০ নম্বর স্যুইটের দিকে। জনশূন্য করিডর।

প্রথমে নিঃশব্দে চেষ্টা করে দেখল রানা হ্যান্ডেলে চাপ দিয়ে। খুলল না দরজা। ভেতর থেকে বন্ধ। গুনে গুনে তিনটে টোকা দিল রানা। পায়ের শব্দ পাওয়া গেল ভেতরে।

'কে?' গম্ভীর পুরুষ কণ্ঠ।

'বেয়ারা। আপনার হুইস্কির বোতল, স্যার।' জবাব দিল রানা।

চাবি ঘোরানোর শব্দ হলো। হ্যান্ডেলটা নিচু হতেই প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা দিল রানা দরজার গায়ে। অস্ফুট একটা আর্তধ্বনি শুনতে পেল সে। ঘরে ঢুকেই দরজা লাগিয়ে দিল রানা।

বামহাতটা ডানহাতে চেপে ধরে দাঁড়িয়ে আছে ইয়েন ফ্যাঙ। রানাকে দেখেই ভয়ানকভাবে আঁতকে উঠল। ডানহাতটা চলে গেল ওর জ্যাকেটের পকেটে।

দুই পা এগিয়ে শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে নক আউট পাঞ্চ কষাল রানা ফ্যাঙের নাকের ওপর। হুড়মুড় করে দেয়ালের গায়ে গিয়ে ধাক্কা খেলো সে। প্রায় উড়ে গিয়ে পড়ল রানা ওর ওপর। সেলাইমেশিনের স্পীডে দুই হাতে ঘুসি চালাল রানা ওর নাকে, মুখে, বুকে, পেটে। পকেট থেকে একটা সাইলেন্সার ফিট করা ল্যুগার বেরিয়ে এসেছিল ওর ডান হাতে, কিন্তু সেটা ব্যবহার করবার ক্ষমতা লোপ পেয়েছে ওর দশ সেকেন্ডের মধ্যেই। একটানা পনেরো সেকেন্ড মেশিন চালিয়ে থামল রানা।

মাটিতে শুয়ে আছে ফ্যাঙ। মুখটা আর চিনবার উপায় নেই, দলিত মথিত রক্তাক্ত এক মাংসপিণ্ড মনে হচ্ছে। সামনের তিনটে দাঁত অদৃশ্য হয়ে গেছে ওর।

একটানে একটা ইজিচেয়ারের উপর তুলে দিল রানা ফ্যাঙের জ্ঞানহীন দেহটা। ওরই বেল্ট, টাই আর রুমাল দিয়ে আচ্ছা করে বাঁধল ওর মুখ, হাত, পা। পিস্তলটা তুলে নিয়ে রাখল নিজের পকেটে।

এতক্ষণ একটি শব্দ পাওয়া যায়নি পাশের বেডরুম থেকে। ব্যস্ততা সত্ত্বেও নিজের অজান্তেই কান পেতে শুনবার চেষ্টা করেছে রানা এতক্ষণ। এবার এসে দাঁড়াল বেডরুমের দরজায়। চিত হয়ে শুয়ে আছে সরোজ গুপ্ত। পাশে পড়ে আছে একটা ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা।

খোলা চোখ দুটোতে স্পষ্ট আতঙ্কের ছাপ রয়েছে এখনও। যদিও সব আতঙ্কের উর্ধ্বে চলে গেছে সে এখন।

এগারো

নিশ্চিন্তে কাগজ দেখছিল সরোজ গুপ্ত, টেরও পায়নি হয়তো ইয়েন ফ্যাঙের প্রবেশ। বোঝা যাচ্ছে, বেশি কথা খরচা করেনি ফ্যাঙ-ল্যুগারটা কপালের দিকে তাক করে টিপে দিয়েছে ট্রিগার।

কেন?

সরোজ গুপ্তকে হত্যা করার পর অপেক্ষা করছিল ও কার জন্যে? রানা? না মিসেস গুপ্ত? নাকি দুজনের জন্যেই? রানাকে হত্যা করতে চাওয়ার সহজ কারণ বোঝা যায়, কিন্তু গুপ্ত দম্পতির উপর চোখ পড়ল কেন ওদের? রানা যে মিসেস গুপ্তের সাথে ডিনার খেয়েছে গতকাল, এই কথাটাই হয়তো জানতে পেরেছে উ-সেনের লোক, কিন্তু এর মধ্যে এতখানি গুরুত্বপূর্ণ কি খুঁজে পেল ওরা যে মৃত্যুদূত পাঠিয়ে দিয়েছে একেবারে?

ঘোলাটে ঠেকছে ব্যাপারটা রানার কাছে। ওরা কি জানে এদের ভূমিকা সম্পর্কে? জানে যে এরা ভারতীয় এজেন্ট, এবং গোপনে লোক পাচার করাই এদের মুখ্য কাজ? ধরে নেয়া যাক একথা জানা আছে উ-সেনের দলের; কিন্তু তবু তো এরকম আকস্মিক আক্রমণের যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

এর সঠিক উত্তর দিতে পারবে মিসেস গুপ্ত।

কাজেই অপেক্ষা করতে হবে ওকে।

ঘর অন্ধকার করে দিয়ে সোফার উপর বসে পড়ল রানা। অনুভব করল, আজ সন্ধের তৎপরতা বেশ খানিকটা ক্লান্ত করে ফেলেছে ওকে। পা দুটো টান করে আড়মোড়া ভাঙল সে, তারপর আয়েশ করে হেলান দিয়ে সিগারেট ধরাল একটা।

ঠিক পোনে এগারোটার সময় করিডরে পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। পিস্তলটা হাতে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে বসল রানা। দরজা খুলে যেতেই করিডরের ম্লান আলো দেখা গেল। চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়ে আছে মিসেস গুপ্ত। গুন গুন করে গান গাইছিল, থেমে গেল গান।

প্রথমেই হাত বাড়িয়ে বাতি জ্বেলে দিল মিসেস গুপ্ত, ইয়েন ফ্যাঙকে দেখে চমকে উঠল, ঝট করে ফিরল রানার দিকে।

'আপনারা কি করছেন এই ঘরে? সরোজ কোথায়?'

'পাশের ঘরে।' নির্বিকারভাবে বলল রানা।

রানার হাতের পিস্তলটার দিকে চাইল মিসেস গুপ্ত, দৃষ্টিটা সরে স্থির হলো চোখের ওপর, তারপর আবার চাইল ইয়েন ফ্যাঙের দিকে। চেহারায় বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হলো না। মহিলার মানসিক শক্তি দেখে সত্যিই অবাক হলো রানা।

'কি ব্যাপার?' আবার প্রশ্ন করল মিসেস গুপ্ত। 'ব্যাপারটা কি, সেটা

আপনার কাছ থেকে জানার জন্যেই অপেক্ষা করছি আমি।'

'সরোজ কোথায়?'

'বললাম তো, পাশের ঘরে।' উঠে দাঁড়াল রানা।

পাশের ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল মিসেস গুপ্ত। ওর পিঠের কাছে রানা।

'আপনি খুন করেছেন ওকে!' চাপা ফ্যাঁসফেঁসে স্বরে বলল মিসেস গুপ্ত।

'আশ্চর্য!' সত্যিই আশ্চর্য হলো রানা। 'আপনার এ ধারণা হলো কেন? আমি ওকে খুন করতে পারি এটা যখন সম্ভাবনার মধ্যেই ধরেছেন আপনি, নিশ্চয়ই সম্ভাব্য কারণ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা আছে আপনার? কারণটা ব্যাখ্যা করতে হবে আপনাকে। যত তাড়াতাড়ি পারেন কান্নাকাটি সেরে নিন, অনেক কথা আছে আপনার সাথে। হাতে সময় কম।'

একটু অবাক হয়ে চাইল মিসেস গুপ্ত রানার দিকে। তারপর হাসল। 'জীবনে কাঁদিনি আমি, আব্বাস মির্জা। জন্মের সময়ও না। কান্না আমার আসে না। তাছাড়া সরোজ আমার স্বামী ছিল কিছুক্ষণ আগে পর্যন্তও–এখন ও একটা লাশ।' প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল মিসেস গুপ্ত, 'আপনি বলতে চান, আপনি ওকে খুন করেননি?'

'পিস্তলটা পাশের ঘরের বন্ধুটির কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছি আমি। আমি পৌঁছুবার আগে মারা গিয়েছেন আপনার স্বামী। ওই লোকটাকে চেনেন?'

মাথা নাড়ল মিসেস গুপ্ত। চেনে না।

বেডরূমের দরজাটা ভিড়িয়ে দিল রানা। 'তাহলে গোটা কতক কাজের কথা সেরে ফেলতে পারি আমরা?'

'আপনি আমাকে জেরা করতে চান?'

বিছানার পাশে বসে পড়ল রানা। বলল, 'তার আগে কি সার্চ করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন?'

রানার সামনে এসে দাঁড়াল মিসেস গুপ্ত। দুই হাত তুলল মাথার ওপর। বলল, 'আমি অস্ত্র ব্যবহার করি না।'

'আমার এক বান্ধবীও ঠিক এই কথাই বলে। কিন্তু আমি জানি ওর শরীরে কোথাও না কোথাও ছোট্ট একটা টু-ফাইভ ক্যালিবারের অ্যাসট্রা পিস্তল থাকে সবসময়।'

'অর্থাৎ...' কথাটা শেষ না করেই শাড়ি খুলতে শুরু করল মিসেস গুপ্ত। এক এক করে সব কাপড়-চোপড় খুলে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলল সে কার্পেটের ওপর, তারপর মাথার ওপর হাত তুলে ধীরে ধীরে ঘুরল একপাক।

সাংঘাতিক এক অস্ত্র আবিষ্কার করল রানা ওর শরীরে। যৌবন। এমন নিটোল সুন্দর শরীর লাখে একটাও মেলে না। ঠিক যেন শিল্পীর সারা জীবনের সাধনা, স্বপ্ন আর কল্পনা মূর্ত হয়ে উঠেছে ওই রক্ত মাংস দিয়ে গড়া প্রতিমায়। শিল্পী না বলে সার্জন বলা উচিত। কারণ ক্ষীণ অস্পষ্ট হলেও প্লাস্টিক সার্জারীর চিহ্ন দেখতে পেয়েছে রানা।

'কার হাতের কাজ?' প্রশ্ন করল রানা। 'কে অস্ত্রোপচার করেছিল? ডক্টর হুয়াং কি?'

ভয়ানকভাবে চমকে উঠল মিসেস গুপ্ত প্রশ্নটা শুনে। কিন্তু আশ্চর্য ক্ষমতার বলে সামলে নিল মুহূর্তে। 'কেন? একথা বলছেন কেন?'

মুচকে হাসল রানা। বলল, 'ঠিক আছে, জবাব না দিলেও চলবে। এবার বলুন, সরোজকে একা রেখে কোথায় গিয়েছিলেন আপনি?'

'সিনেমায়।'

'সে কথা পাশের ঘরের লোকটা জানল কি করে?'

'পোর্টারকে দিয়ে ট্যাক্সি আনিয়েছিলাম, হয়তো তার কাছ থেকে শুনেছে।'

'আপনি যখন এ ঘর ছেড়ে যান, সরোজ তখন জীবিত ছিল?'

'নিশ্চয়ই। আপনি আবোল তাবোল প্রশ্ন করছেন, মিস্টার আব্বাস মির্জা। হত্যাকারীকে আপনি নিজ হাতেই আহত, নিরস্ত্র এবং বন্দী করেছেন। অন্তত আপনার বক্তব্য তাই। এখন আমার একটা প্রশ্নের জবাব দেবেন দয়া করে। আপনি এখানে কেন? আমি যতদূর জানি, আপনার ওপর আদেশ আছে, প্রাথমিক কন্ট্যাক্টের পর কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমার সাথে যোগাযোগ করবেন না...'

'আমার কাজ শেষ। আপনাদের সাহায্যে রেঙ্গুন থেকে পালাবার কথা ছিল, তাই এসেছি।'

'কাজ শেষ? আজ সন্ধেবেলাতেও আপনাকে দেখে মনে হলো কাজ শুরুই করেননি, আর এখন এসে বলছেন কাজ শেষ। এক সন্ধ্যায় কি কাজ উদ্ধার করলেন আপনি?'

'আমার কাজে বেশি সময় লাগে না।' হাসল রানা। 'আপনার পুরো নাম কি মিসেস ফ্যান সু গুপ্ত?'

'আপনি জানলেন কি করে?' তেরছা চোখে চাইল মিসেস গুপ্ত রানার চোখে।

'আজ সন্ধ্যায় উ-সেনের ওখানে ডিনারের দাওয়াত ছিল আমার।'

ভুরু কুঁচকে গেল মিসেস গুপ্তের। বসে পড়ল ড্রেসিং টেবিলের সামনের টুলে পায়ের উপর পা তুলে। রানা বুঝল দ্রুত চিন্তা চলছে ওর মাথায়। অনেকটা আপন মনে বলল, 'সেকথা বোঝা উচিত ছিল আমার আগেই। আজ সন্ধ্যায় স্যুই থির সাথে আপনাকে দেখে...' মাথা ঝাঁকিয়ে একগুচ্ছ অবাধ্য চুল পেছনে সরিয়ে দিল মিসেস গুপ্ত, সরাসরি চাইল রানার দিকে। 'আমার সম্পর্কে কতটা জানেন আপনি?'

'ইচ্ছে করলেই কাপড় পরে নিতে পারেন,' বলল রানা।

'আমার প্রশ্নের জবাব দিন।' গম্ভীর মিসেস গুপ্ত।

'সত্যি কথা বলতে কি, তেমন কিছুই জানি না। আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ছি। আপনার মুখেই শুনতে চাই আপনার সম্বন্ধে।' একটা সিগারেট ধরাল রানা।

'আমার কৌতূহল নিবৃত্ত হলেই আমি সন্তুষ্ট। প্রথমে বলুন উ-সেনের সাথে আপনার কি সম্পর্ক?'

দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট চেপে চুপচাপ কিছুক্ষণ ভাবল ফ্যান সু গুপ্ত। গভীর গোপন কোন সিদ্ধান্ত নিল। রানার আক্ষেপ হলো থট-রিডিং জানা নেই বলে। মধুর করে হাসল ফ্যান সু রানার চোখের দিকে চেয়ে। 'যা বলব, বিশ্বাস করবেন?'

'বিশ্বাসযোগ্য হলে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করব।'

'সব কথা জেনে কি করবেন?'

'সিদ্ধান্ত নেব আপনার সাহায্য নেয়া যায় কিনা। যদি দেখি যায় না, নিঃশব্দে বেরিয়ে যাব আমি এ ঘর থেকে। আপনার গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত কাটবার ইচ্ছে আমার নেই। কথাটা বিশ্বাস করলে সুখী হব।'

'আমি যদি বলি আমি একজন ডাবল এজেন্ট, তবুও শাস্তি না দিয়েই চলে যাবেন?'

'আপনাকে শাস্তি দেয়ার অধিকার আমার নেই, মিসেস গুপ্ত। তাছাড়া আমি ভারতের স্পাই নই। বাংলাদেশ থেকে এসেছি আমি আমার দেশের শত্রুকে শায়েস্তা করতে, আমার কাজ শেষ, দেশে ফেরার পালা এখন। যতদূর বোঝা যাচ্ছে আপনার সাহায্য নেয়া যাবে না, আমার পথ আমার নিজেকেই করে নিতে হবে।'

'আপনি বাংলাদেশের লোক? তাহলে আপনাকে সাহায্য করার আদেশ দেয়া হলো কেন আমাদের?'

'আমার বর্তমান মিশনের সাথে ভারতের স্বার্থও সংশ্লিষ্ট। ব্যাপারটা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে দুজন বিশ্বস্ত এজেন্টের পরিচয় প্রকাশ পেয়ে যাওয়াটা আপনাদের চীফ তেমন কোন ক্ষতি বলে মনে করেননি।' সিগারেটে টান দিল রানা, ঘড়ি দেখল। 'নিন, শুরু করুন।'

'আমি উ-সেনের লোক।'

'সে কথা আমি জানি। শুধু জানি না, উ-সেনের দলের লোক হয়েও আপনি আক্রান্ত হচ্ছেন কেন?'

'সেই কথাটাই ভাবছি আমি এতক্ষণ ধরে। সরোজকে মেরে ফেলা মানে আমার সাহায্যের আর কোন প্রয়োজন নেই ওদের। ওরা ভাল করেই জানে, আমার কাছ থেকে এর ফলে ভবিষ্যতে কোনরকম সহযোগিতা পাওয়া যাবে না। তবু যখন কাজটা করেছে, তখন বুঝতে হবে, আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে ওদের কাছে। সেক্ষেত্রে আমাকে বাঁচিয়ে রাখবারও কোন মানে হয় না। আমি জানি, শুধু সরোজকে হত্যা করতে পাঠানো হয়নি ওকে। আমাকেও, এবং খুব সম্ভব আপনাকেও হত্যা করতে পাঠানো হয়েছে।' হঠাৎ কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করে বলল, 'আমি একটা ফোন করতে পারি?'

এক সেকেন্ড ভেবে বলল রানা, 'পারেন।'

রিসেপশনিস্টের কাছে বাইরের লাইন চাইল মিসেস গুপ্ত। লাইন পেয়ে

ডায়াল করল। মিনিটখানেক রিং হলো, কিন্তু ধরল না কেউ। এবার অন্য একটা নম্বরে ডায়াল করল সে। ওপাশে রিসিভার ওঠাবার শব্দ হলো।

'হ্যালো? ইয়ান লাও ডিপার্টমেন্টাল স্টোর এক্সচেঞ্জ? দেখুন, আপনাদের পনেরোতলার মিস্টার উ-সেনের নাম্বারে রিং করছি গত দশ মিনিট ধরে, আপনি কি বলতে পারবেন ওর টেলিফোনটা খারাপ কি না?' চুপচাপ শুনল মিসেস গুপ্ত বেশ কিছুক্ষণ, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কখন? মানে, কয়টার সময়?' আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ শুনে নামিয়ে রাখল রিসিভার।

রানা ভুরু নাচাল। 'কি বলল?'

'ঘণ্টা খানেক আগে উ-সেনকে নিয়ে ডক্টর হুয়াং কি, স্যুই থি এবং আরও দুজন বিদেশী ভদ্রলোক চলে গেছে এয়ারপোর্টে। উ-সেনকে স্ট্রেচারে করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ভয়ানক অসুস্থ দেখাচ্ছিল তাকে।' চোখজোড়া ছোট হয়ে এল মিসেস গুপ্তের, নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে চিন্তা করল এক সেকেন্ড। 'উ-সেনের এই হঠাৎ অসুস্থতার সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই তো, মিস্টার আব্বাস মির্জা? কিছু একটা আঁচ করতে পারছি যেন আমি। আপনাকে চিনি কিনা জানতে চাওয়া হলো আমার কাছে রাত আটটায়, আপনি ডিনার খেলেন উ-সেনের সাথে রাত নয়টায়, আর অসুস্থ উ-সেনকে নিয়ে চলে গেল ওরা এয়ারপোর্টে রাত দশটায়। ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলবেন?'

'খুবই সাধারণ ব্যাপার। উ-সেনকে হত্যা করে ওর কাছ থেকে কিছু কাগজপত্র উদ্ধার করবার জন্যে পাঠানো হয়েছিল আমাকে। আমার কাজ শেষ।'

হাঁ হয়ে গেল মিসেস গুপ্তের মুখ, চোখ দুটো বিস্ফারিত–যেন ঠিক বুঝতে পারছে না রানার কথাগুলো। জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল, ঢোক গিলল একটা। 'অসম্ভব! মিথ্যো কথা! নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছেন আপনি!'

'মিথ্যে কেন বলব?' গেঞ্জির নিচে থেকে ফাইলটা বের করে দেখাল রানা। 'এটাও কি মিথ্যে? বাংলাদেশকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়ার প্ল্যান রয়েছে এটার মধ্যে। নিশ্চয়ই চাওয়ামাত্র ভদ্রতা রক্ষার খাতিরে তুলে দেয়নি এটা উ-সেন আমার হাতে?'

'মারা গেছে উ-সেন?'

'সন্দেহ নেই তাতে। কিন্তু আমি ভাবছি, এত রাতে কি প্লেন পাবে ওরা?'

'প্লেন নয়, হেলিকপ্টার ব্যবহার করে ওরা। উ-সেনের নিজস্ব...'

'কোথায় গেছে আন্দাজ করতে পারেন?'

'অনুমান করার দরকার কি? আমি জানি কোথায় গেছে। মান্দালয়।'

'আপনাকে হত্যা করবার আদেশটা কে দিল? ডক্টর হুয়াং, না স্যুই থি?'

'ওরা দুজনই অপছন্দ করে আমাকে–হয়তো দুজনেই দিয়েছে।'

'যাক, কারা আদেশ দিয়েছে বোঝা যাচ্ছে, এবার বলুন দেখি, কেন আদেশটা দেয়া হলো?'

উঠে দাঁড়িয়ে কার্পেটের উপর থেকে শাড়িটা তুলে আলগোছে কোনমতে পেঁচিয়ে নিল সে শরীরে। আবার বসল টুলের উপর। বলল, 'সিগারেট আছে?'

সিগারেটের প্যাকেট এবং ম্যাচটা ফেলল রানা ওর কোলের উপর। স্থিরদৃষ্টিতে লক্ষ করল, সামলে নিয়েছে মিসেস গুপ্ত, একটুও কাঁপল না হাত সিগারেট ধরাতে গিয়ে।

'ব্যাপারটা গোড়া থেকেই বলছি। ব্যাংককের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে আমার জন্ম। আশ্চর্য এক মস্তিষ্ক নিয়ে জন্মেছিলাম আমি। পাঁচ বছর বয়সেই আমি মুখে মুখে বিরাট সব যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করতে পারতাম। আমার আই. কিউ. ছিল একশো তিরাশি–অর্থাৎ জিনিয়াসের ইন্টেলিজেন্স কোশিয়েন্ট। কিন্তু এক মোটর দুর্ঘটনায় বাবা-মা মারা যাওয়ায় ছয় বছর বয়সেই ভয়ানক অসুবিধায় পড়ে গেলাম। লেখাপড়া তো দূরের কথা, দুবেলা খাবার জোগাতেই আমার ছোট্ট মাথাটা প্রচুর পরিমাণে ঘামাতে হয়েছে। ভয়ানক কষ্ট করতে হয়েছে আমাকে বারোটা বছর। সেসব কষ্টের কথা ভাবতেও ভয় হয় এখন আমার। কোথাও কারও কাছে এতটুকু স্নেহ ভালবাসা পাইনি আমি। মানুষের দোষ দিয়ে লাভ নেই। ভয়ঙ্কর বীভৎস কুৎসিত ছিলাম আমি দেখতে। আমার মা পর্যন্ত ভয় পেয়েছিল জন্মের পর প্রথম আমার মুখ দেখে। আমার দিকে চাওয়ার সাথে সাথেই মুখ না ঘুরিয়ে নিয়ে উপায় ছিল না। সন্ধের পর কোনদিন ঘর থেকে বেরোতাম না আমি রাস্তার লোকজন ভয় পাবে বলে।' পর পর দু'তিনটে টান দিল সে সিগারেটে। 'সেই সময় পরিচয় হয় উ-সেনের সাথে। আমার এই রূপ, এই সুন্দর দেহ, সবই উ-সেনের দান। যদিও কোনদিন পছন্দ করতে পারিনি আমি লোকটাকে, পরিষ্কার জানি নিজের স্বার্থোদ্ধারই ওর এই সাহায্যের একমাত্র উদ্দেশ্য, আমাকে ব্যবহার করবার জন্যেই এত টাকা খরচ করেছে সে আমার পেছনে–কিন্তু কৃতজ্ঞতা বোধকে কিছুতেই সরাতে পারিনি মন থেকে। ওর কথামত ভালবাসার অভিনয় করে বিয়ে করি আমি সরোজকে। অভিনয় করতে গিয়ে কখন যে ওর প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম টের পাইনি, টের পেলাম বিয়ের ছয় মাস পর যখন সরোজের বিরুদ্ধে একটা কাজ করবার আদেশ দিল আমাকে উ-সেন। কিছুতেই করতে পারলাম না সেটা, কেঁদে পড়লাম উ-সেনের কাছে। সেবারের মত মাফ করে দিল উ-সেন আমাকে, কিন্তু বিশ্বস্ততার লিস্ট থেকে কেটে দিল সে আমার নাম।'

গল্পটা লম্বা হয়ে যাচ্ছে। রানা বুঝল এভাবে ঢালাও সুযোগ দিলে রাত কাবার করে দেবে মিসেস গুপ্ত। কাজেই দ্রুত কাহিনী শেষ করতে সাহায্য করল সে।

'উ-সেন আপনার সাহায্য গ্রহণ করা বন্ধ করে দিল?'

'ঠিক তা নয়। কাজ আমি ঠিকই করতে থাকলাম, উ-সেন বুঝে নিল সরোজের কোন ব্যক্তিগত ক্ষতি আমাকে দিয়ে করানো যাবে না, কিন্তু অন্যান্য সব তথ্য পাবে সে আমার কাছে ঠিক ঠিকই। কাজেই আপনার

সম্বন্ধে আমার দেয়া রিপোর্ট সে বিশ্বাস করেছিল অকপটে।'

'ভুল রিপোর্ট দিতে গেলেন কেন?'

'কথাটা বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, সরোজের প্রতি ভালবাসা আমার ক্রমে ভারতের প্রতি ভালবাসায় রূপ নিচ্ছিল অনেকদিন থেকেই। ভারতের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা আমার কাছে সরোজের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার সমান অপরাধ বলে মনে হচ্ছিল কিছুদিন থেকে। আপনাকে সত্যি কথাই বলব, আগে যদি জানতাম আপনার পরিচয়, কিছুতেই মিথ্যা বলতাম না উ-সেনের কাছে। আপনি যে ওর বিরুদ্ধে কোন মিশন নিয়ে এসেছেন সেকথা কল্পনাতেও আসেনি আমার। আমি এটাকে মনে করেছিলাম উ-সেনের রুটিন চেক–নতুন কেউ রেঙ্গুনে এলেই তার সম্পর্কে খোঁজ খবর করা উ-সেনের নিয়ম। আমি ভেবেছিলাম, অনর্থক একজন ভারতীয়কে ব্ল্যাকমেইলের শিকার না করে ছোট্ট একটা মিথ্যা বলে দিলে কারও কোন ক্ষতি হবে না। আমি জানতাম না, এই ছোট্ট মিথ্যা কথার ফলে আকাশ ভেঙে পড়বে আমার মাথার ওপর, সরোজকে হারাতে হবে, নিজের প্রাণের উপর হামলা আসবে, চিরশত্রু হয়ে যাব গোটা দলটার, উ-সেনের মৃত আত্মার কাছে চিরদিন অপরাধী থাকতে হবে, চিরদিন নিজেকে অকৃতজ্ঞ নরকের কীট ছাড়া কিছু ভাবতে পারব না আর। জানলে এ কাজ করতাম না।'

রানা বুঝল সত্যি সত্যিই কি ভয়ঙ্কর অবস্থায় পড়েছে মিসেস গুপ্ত সামান্য একটু ভুলের জন্যে। বেঁচে থাকাই মহা সমস্যা হয়ে যাবে ওর!

'আপনার মনের কথা পরিষ্কার জানিয়ে দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ। এখন কি করবেন স্থির করেছেন কিছু? যা ঘটবার সে-তো ঘটেই গেছে, এবার আপনার প্রোগ্রাম কি?'

এক মুহূর্ত দেরি হলো না মিসেস গুপ্তের উত্তর দিতে। সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে অনেক আগেই।

'সবকিছু এমন গোলমাল পাকিয়ে গেছে যে এখন পালানো ছাড়া আর কোন গত্যন্তর দেখছি না। অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে রেঙ্গুন এখন আমার জন্যে। আপনার জন্যেও!'

'আমার কথা আপনাকে ভাবতে হবে না। আপনার নিজের নিরাপত্তার কথা ভাবুন।'

'আমার কথা ভাবতে গিয়ে আপনার কথা এসে পড়ে স্বাভাবিক ভাবেই। কিছুই করতে পারব না আমি এখন আপনার সাহায্য ছাড়া।'

'আমাকে সরোজ সাজিয়ে নিয়ে এখান থেকে পালাবার কথা ভাবছেন এখনও?'

'এছাড়া আর কোন উপায় দেখতে পাচ্ছি না।'

'উ-সেনের লোকের কাছে ধরা পড়বার সম্ভাবনা নেই?'

'আমার মনে হয় না। আমার ধারণা, ইয়েন ফ্যাঙকে আমাদের মেরে ফেলার হুকুম দিয়েই চলে গেছে হুয়াং মান্দালয়ে। এই ধরনের আদেশ

গোপনে দেয়াই স্বাভাবিক। খুব সম্ভব আর কেউ জানে না। হুয়াং-এর অনুপস্থিতিতে আমরা অনায়াসে চলে যেতে পারব ব্যাংকক।'

'ইয়েন ফ্যাঙকে চেনেন না বলেছিলেন কেন?'

'আপনি কতদূর কি জানেন জানা ছিল না বলে।'

'ওকে কি করবেন ভাবছেন?'

'মেরে ফেলব।'

'তারপর লাশ দুটো?'

'ও দুটো পাশের কোন খালি রুমে রেখে দেব আমরা দুজন মিলে টেনে নিয়ে গিয়ে। এই ফ্লোরে প্রায় প্রত্যেকটা ঘরই খালি। সরোজের দাড়ি কামিয়ে ফেলব, ফলে কেউ বুঝতে পারবে না পাশের ঘরের মৃত যুবক আসলে বৃদ্ধ সরোজ গুপ্ত। সকাল বেলা ফোন করে টিকেট বুক করব। রিসেপশনে জানিয়ে দেব হঠাৎ বেড়ে গেছে মিস্টার গুপ্তের অসুস্থতা, আজই চলে যাচ্ছি আমরা ব্যাংকক।'

দুই সমকামী বন্ধু, তাদের ঝগড়া, ফলে একজন অপরজনকে গুলি করে, তারপর শোকে উদভ্রান্ত হয়ে হোক, পুলিসের ভয়ে হোক, আত্মহত্যা করা–মিসেস গুপ্তের চিন্তাধারাটা কোন্ খাতে বইছে টের পেয়ে হাসল রানা মনে মনে। তবে বুদ্ধিটা যে ভাল বের করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে থাকলে আর দুএকটা প্রশ্ন করে এতেই হয়তো রাজি হয়ে যেত সে, কিন্তু পালানো সম্ভব নয় এখন ওর পক্ষে। সোফিয়ার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সে।

'ব্যাংককে গিয়ে কি করবেন? ওখানেও তো উ-সেনের লোক আছে।'

'ব্যাংককের ভারতীয় ইন্টেলিজেন্স চীফের কাছে রিপোর্ট করব প্রথমে, তারপর ব্যবসা গুটানোর ভার তার ওপর দিয়ে আমি চলে যাব কলকাতায়। ওখানে আমার নাগাল পাবে না উ-সেনের দল। আপনি চলে যাবেন আপনার কাজে।'

'ব্যবসাটা কি সরোজের ব্যক্তিগত ছিল?'

'হ্যাঁ। এর প্রতিটা পাই পয়সা ওর নিজের ইনভেস্টমেন্ট।'

'গুড।' উঠে দাঁড়াল রানা। মিসেস গুপ্তের কোলের ওপর থেকে তুলে নিল সিগারেটের প্যাকেট আর ম্যাচ। 'আপনার প্ল্যানটা ভাল, কিন্তু এটার কিছুটা অদল বদল করতে হবে।'

'কি রকম?' সপ্রশ্ন দৃষ্টি তুলল মিসেস গুপ্ত রানার মুখে।

'আমি আপনার সাথে যাচ্ছি না।'

'তাহলে?' হতাশা ফুটে উঠল মিসেস গুপ্তের চোখেমুখে। 'আমার কি হবে? আপনার সাহায্য না পেলে আমি পালাব কি করে? একজন সরোজ গুপ্ত ছাড়া যে একেবারে অচল হয়ে যাব আমি, মিস্টার আব্বাস মির্জা। প্লীজ! আমাকে সাহায্য করতেই হবে আপনার। নইলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে খুন হয়ে যাব আমি ওদের হাতে।'

'ইয়েন ফ্যাঙকে নিয়ে যান সরোজ হিসেবে।' আঙুল দিয়ে পাশের ঘরের দিকে ইঙ্গিত করল রানা। এই সহজ সমাধানটা কেন মিসেস গুপ্তের মনে আসেনি, ভেবে একটু বিস্মিত হলো সে মনে মনে।

'কি করে? ও কো-অপারেট করবে কেন!' মিসেস গুপ্তের চোখ বিস্ফারিত।

'ঘুমের ওষুধ খাওয়ালেই সহযোগিতা পাওয়া যাবে ওর। ঘুম পাড়িয়েই নিয়ে যেতে পারবেন ওকে ব্যাংকক পর্যন্ত। সরোজের হত্যাকারীকেও তুলে দিতে পারবেন চীফের হাতে।'

হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল মিসেস গুপ্তের চোখমুখ। 'ঠিক বলেছেন। দারুণ বুদ্ধি আপনার মাথায়! ঘুমের ওষুধ লাগবে না, চমৎকার একটা ওষুধ আছে আমার কাছে।' একটা তাকের উপর রাখা ফার্স্ট এইডের বাক্সের দিকে চাইল সে। 'আমাকে একটু সাহায্য করতে হবে, মিস্টার মির্জা। জাস্ট এক মিনিটের ব্যাপার। একটু ধরতে হবে লোকটাকে।'

'ঠিক আছে, আসুন আপনি···আমি দেখি জ্ঞান ফিরেছে কিনা লোকটার।'

দরজাটা খুলেই ধক করে উঠল রানার বুকটা। ইজিচেয়ারের উপর নেই ইয়েন ফ্যাঙ। পরমুহূর্তেই চোখ গেল ওর মেঝের দিকে। বাঁধন খুলতে পারেনি, কিন্তু ছেঁচড়ে নেমে গেছে ফ্যাঙ নিচে। গড়িয়ে গড়িয়ে দরজার দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছে।

দুই কাঁধ ধরে টেনে তুলে দিল রানা আবার ওকে ইজিচেয়ারের ওপর। খানিক বাদেই একটা সিরিঞ্জ হাতে ঘরে ঢুকল মিসেস গুপ্ত। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে প্রাণপণ শক্তিতে ছটফট শুরু করল ইয়েন ফ্যাঙ। হাত পা এমনভাবে নাড়াচ্ছে যেন কিছুতেই সুচ ঢোকানো সম্ভব না হয়।

ঠেসে ধরল রানা। কিন্তু লোকটাকে সামলানো মুশকিল। দারুণ শক্তি ওর গায়ে। দুই হাতে ঠেসে ধরেও নড়াচড়া বন্ধ করা যাচ্ছে না। বাম হাঁটু তুলে দিল রানা ওর বুকের ওপর। চেপে ধরল।

এগিয়ে এল মিসেস গুপ্ত। রানার পাশে এসে দাঁড়াল। ছটফট করছে ইয়েন ফ্যাঙ, কিন্তু ঠেসে ধরায় নড়তে পারছে না বেশি।

হঠাৎ তীক্ষ্ণ একটা ব্যথা অনুভব করল রানা পিঠের কাছে, মেরুদণ্ডের উপর। চমকে পিছু ফিরল সে। দেখল সরে যাচ্ছে একটা সিরিঞ্জ ধরা হাত, এককোঁটা ওষুধও নেই আর ওতে।

কয়েক পা সরে গেল মিসেস গুপ্ত। মধুর হাসি হাসল রানার দিকে চেয়ে।

'মাফ করবেন। ইয়েন ফ্যাঙের চেয়ে আপনাকেই আমার বেশি পছন্দ। প্ল্যানটা খানিক বদলে নিয়েছি আমি ইতিমধ্যেই। ব্যাংকক যাচ্ছি না আমরা।'

রক্তের রঙ-২

প্রথম প্রকাশ : ১৯৭৩

এক

ইয়েন ফ্যাঙকে ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল রানা।

ঘুরে উঠল মাথাটা। অবাক হলো রানা ওষুধের প্রভাবের দ্রুততা দেখে। পরিষ্কার বুঝতে পারল, দ্রুত ফুরিয়ে আসছে সময়, যা করবার এক্ষুণি করতে হবে।

ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা মিসেস গুপ্তের উপর। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল মিসেস গুপ্ত, আশ্চর্য গতিতে সরে গেল। হুমড়ি খেয়ে কপাটের গায়ে ধাক্কা খেল রানা। পড়ে যাচ্ছিল, কপাট ধরে সামলে নিল। ফিরল মিসেস গুপ্তের দিকে। ওয়ারড্রোবের গায়ে হেলান দিয়ে হাঁপাচ্ছে সে, ওর চোখে স্পষ্ট ভীতি দেখতে পেল রানা। সিরিঞ্জটা ফেলে দিয়েছে হাত থেকে। চোখের ওপর থেকে সরিয়ে দিল এক গোছা চুল। প্রস্তুত রয়েছে সে রানার জন্যে। ঠোঁট দুটো ঈষৎ ফাঁক হয়ে থাকায় সাদা দাঁত দেখা যাচ্ছে।

এগোল রানা। কিন্তু ইতোমধ্যেই অত্যন্ত শ্লথ হয়ে এসেছে ওর নড়াচড়া। অসম্ভব ঘুরছে মাথাটা। হাত পা নড়তে চাইছে না। মনে হচ্ছে সীসা দিয়ে তৈরি ওগুলো। মনে হচ্ছে পানির ভিতর দিয়ে এগোচ্ছে সে। হাত দুয়েক থাকতেই একটু কুঁজো হয়ে লাফ দিল মিসেস গুপ্ত। কাঁধ দিয়ে প্রচণ্ড এক গুঁতো দিল সে রানার সোলার প্লেক্সাসে। দুই হাতে ধরে ফেলল রানা ওর দুই বাহু। কপালটা ওর বুকে ঠেসে ধরে ঠেলে নিয়ে চলেছে ওকে পিছন দিকে, সেই সাথে পা বাধিয়ে ল্যাং মারল মিসেস গুপ্ত ওর পায়ে। হুড়মুড় করে পড়ে গেল রানা কার্পেটের উপর। ছুটে গেল হাত।

মন্থর বেগে জুডো চপ মারল রানা ওর ঘাড়ের পাশে। ককিয়ে উঠল একটু, তারপর এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে সরে গেল মিসেস গুপ্ত কয়েক হাত তফাতে। শাড়িটা খসে গেছে, ভ্রূক্ষেপ নেই সেদিকে। ভীত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে সে রানার চোখের দিকে। হাঁপাচ্ছে।

আর উঠে দাঁড়াবার শক্তি নেই রানার। ইয়েন ফ্যাঙের চোখের উপর চোখ পড়ল রানার। বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে সে। হঠাৎ পিস্তলটার কথা মনে পড়ল। দেহের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে বহু কষ্টে ধীরে ধীরে পকেট থেকে পিস্তলটা বের করল রানা। তিন মন ওজন এখন নাইন এম. এম. ল্যুগারটার, সাইলেন্সারের ভারেই নেমে যেতে চাইছে মুখটা নিচের দিকে। অনেক চেষ্টা করে পিস্তলের মুখটা ঘুরাল রানা মিসেস গুপ্তের দিকে। পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে মিসেস গুপ্ত। সোজা বুক লক্ষ্য করে টিপে

দিল রানা ট্রিগার।

কই, গুলি তো বেরোল না!

রানা বুঝতে পারল, মনে মনে টিপেছিল সে ট্রিগারটা। আঙুলে কোন সাড়া নেই আর। দুটো মিসেস গুপ্ত দেখতে পাচ্ছে সে, হঠাৎ চারটা হয়ে গেল, পরমুহূর্তে আটটা, তারপর ষোলোটা—আবার একটা দেখা যাচ্ছে এখন। রানার মনে হচ্ছে সারা শরীর ওর সীসা দিয়ে তৈরি, ডুবে যাচ্ছে সে অতল সমুদ্রে। ডুবছে তো ডুবছেই, কোনদিন ভেসে উঠতে পারবে না সে আর। মনে মনে আরও বার কয়েক গুলি করে হত্যা করল সে মিসেস গুপ্তকে, তারপর খসে পড়ে গেল পিস্তলটা হাত থেকে। ঘরটা দুলছে চোখের সামনে, কেমন যেন উদাস হয়ে গেছে মনটা, যেন কিছুতেই কিছু এসে যায় না।

এগিয়ে এল মিসেস গুপ্ত, তুলে নিল পিস্তলটা, বসল রানার মাথার কাছে, বাম হাতের বুড়ো আঙুল ও তর্জনী দিয়ে যতদূর সম্ভব ফাঁক করল রানার একটা চোখ, তারপর সন্তুষ্ট হয়ে হাসল।

'রীতিমত ভয়ই পাইয়ে দিয়েছিলেন। আমি ভাবছিলাম, হয়তো কোন বিশেষ কারণে ধরবে না ওষুধটা আপনাকে। হয়তো কোন ধরনের ইমিউনিটি রয়েছে আপনার শরীরে লাইটিক ককটেলের বিরুদ্ধে। এর নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই। পঞ্চাশ গ্রাম প্রমেথাজাইনের সাথে একশো গ্রাম পেথিডিন মিশিয়ে সবটা আবার মেশাতে হয় পঞ্চাশ গ্রাম ক্লোরোপ্রমাজাইনের সাথে। চোখ মুখ ফ্যাকাসে হয়ে এসেছে এখুনি, খানিক বাদে বিন্দুমাত্র নড়াচড়ার ক্ষমতা থাকবে না আপনার। চিন্তা চলবে মাথার ভিতর, কিন্তু প্রকাশ করার ক্ষমতা থাকবে না। আশে পাশে কি ঘটছে টের ঠিকই পাবেন, কিন্তু সবকিছু আবছা ঠেকবে আপনার কাছে। যেন স্বপ্নের ঘোরে ঘটে যাচ্ছে সব।' উঠে দাঁড়াল মিসেস গুপ্ত। বলল, 'উফ্, অনেক কাজ পড়ে রয়েছে। এক এক করে সেরে ফেলতে হবে এখন। কিছু মনে করবেন না, মিস্টার আব্বাস মির্জা, আপাতত কিছুক্ষণ মেঝেতেই শুয়ে থাকতে হবে আপনাকে। কাজ শেষ করে তারপর বাকি রাতটুকু প্রেম করব আমরা।' রানার সর্বাঙ্গে দৃষ্টি বুলাল মিসেস গুপ্ত, হাসল, 'নিশ্চয়ই অনুভব করতে পারছেন, অসম্ভব যৌন উত্তেজনা আসছে এই ওষুধের প্রভাবে। আপনার নড়াচড়া করবার ক্ষমতা থাকবে না, কিন্তু ভয় নেই, আমি সাহায্য করব আপনাকে।'

অশ্লীল একটুকরো হাসি মিসেস গুপ্তের ঠোঁটে। পিস্তল হাতে এগিয়ে গেল সে ইয়েন ফ্যাঙের দিকে।

'রক্তের দাগ থাকা চলবে না। কাজেই এমন ভাবে কাজটা করতে হবে যাতে এক ফোঁটা রক্ত কোথাও না লাগে। সরোজের বালিশ-চাদর শেষ, ওগুলো বদলি না করে উপায় নেই, কিন্তু এই পুরু কার্পেট যদি আমাকে বইতে হয় তাহলে বারোটা বেজে যাবে আমার।' কথা বলতে বলতেই, যেন এমন কিছুই ব্যাপার না, এমনি ভঙ্গিতে ইয়েন ফ্যাঙের মাথার চাঁদিতে ধরল সে পিস্তলটা। আঁতকে উঠল ফ্যাঙ, নড়াচড়া করার চেষ্টা করল, কিন্তু নির্বিকার ভঙ্গিতে টিপে দিল মিসেস গুপ্ত ট্রিগার। দুপ করে একটা শব্দ হলো। একবার

ভয়ানক ভাবে কেঁপে উঠেই স্থির হয়ে গেল ফ্যাঙের দেহটা। গুলিটা তালু ভেদ করে খাড়া ভাবে ঢুকে গেছে শরীরের ভিতর, গলা বেয়ে নেমে গেছে হয়তো পাকস্থলীতে—বাইরে থেকে বোঝার কোন উপায় নেই। অনেক খুঁজে বের করতে হবে পুলিসকে চুলের ভিতরের জখমটা। সন্তুষ্ট চিত্তে জখমটা একবার পরীক্ষা করে ফ্যাঙের মাথাটা সোজা রাখার জন্যে শরীরটা একটু নিচে নামিয়ে মাথাটা ঠেকিয়ে দিল মিসেস গুপ্ত ইঞ্জিচেয়ারের হাতলের সাথে। গুনগুন করে গান ধরেছে সে আপন মনে। রানার দিকে চোখ পড়তেই হাসল। 'কি? উত্তেজিত বোধ করছেন না? দাঁড়ান, কাজটা সেরে নিই আগে।' পাশের ঘরের দিকে চাইল মিসেস গুপ্ত।

'আগে সরোজের ব্যবস্থাটা করে ফেলি, তারপর ধরব একে— ততক্ষণে একটু ঠাণ্ডা হয়ে নিক ব্যাটা।'

পাশের ঘরে চলে গেল মিসেস গুপ্ত। মিনিট পাঁচেক খুট খাট শব্দ শুনল রানা পাশের ঘর থেকে। তারপর দেখল বেরিয়ে আসছে সে সরোজ গুপ্তকে কোলে নিয়ে। রানা লক্ষ্য করল একটি দাড়িও নেই সরোজ গুপ্তের গালে। করিডরের দরজাটা একটু ফাঁক করে বাইরের দিকে উঁকি দিয়ে দেখল একবার, তারপর বেরিয়ে গেল মিসেস গুপ্ত। ছয়-সাত মিনিট পর ফিরে এল পাশের কোন কামরার খাট থেকে তোশক, বালিশ আর চাদর নিয়ে। বেডরুমের ভিতর আবার তিন-চার মিনিট খশখশ, মচমচ, খুটখাট শব্দ। এবার রক্তাক্ত চাদর, বালিশ আর তোশক নিয়ে বেরিয়ে এল সে বেডরুম থেকে। মহিলার গায়ে কি অসম্ভব শক্তি টের পেল রানা ভার বহনের অনায়াস ভঙ্গি দেখে। কয়েক মিনিট পর ফিরে এল মিসেস গুপ্ত খালি হাতে। রানার অসহায় অবস্থা দেখে হাসল খিলখিল করে। এগিয়ে গেল ইয়েন ফ্যাঙের দিকে। হাত-পা-মুখের বাঁধন খুলে বেল্ট ও টাই পরাল ফ্যাঙকে, তারপর অনায়াসে তুলে নিল লাশটা কাঁধের উপর। বেরিয়ে গেল করিডরে একবার সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। মিনিট দশেক পর ফিরল এবার মিসেস গুপ্ত, হাঁপ ছাড়ল, হাতের তালু থেকে ধুলো ঝাড়ল তালি দিয়ে। হাসল রানার দিকে চেয়ে, দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে এগিয়ে এল।

পিঠের নিচে এক হাত আর হাঁটুর নিচে অপর হাত ভরে দিয়ে কোলে তুলে নিল সে রানাকে। মুখটা নামিয়ে আলতো করে চুমো খেল রানার ঠোঁটে, তারপর নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল সরোজের বিছানায়। চোখ দুটো খোলা আছে রানার, সব দেখতে পাচ্ছে, সব শুনতে পাচ্ছে—কিন্তু মনে হচ্ছে ক্রমেই তলিয়ে যাচ্ছে সে আরও দ্রুত বেগে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ থেকে যেন ছিটকে বেরিয়ে গেছে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে রানার কোলের কাছে বসে পড়ল মিসেস গুপ্ত। কনুইটা রানার বুকের ওপর রেখে হেলান দিল রানার গায়ে। অসম্ভব ব্যথা পাচ্ছে রানা, কিন্তু একবিন্দু নড়তে পারল না সে, কথা বলতে চেষ্টা করল, ঘড় ঘড় আওয়াজ হলো শুধু গলা দিয়ে। মুচকি হেসে কনুইটা সরিয়ে নিল মিসেস গুপ্ত বুকের ওপর থেকে। অর্ধেক খাওয়া সিগারেটটা ধরিয়ে দিল রানার ঠোঁটে।

বলল, 'পরীক্ষা করে দেখলাম। ব্যথার অনুভূতিটা ঠিকই রয়েছে, কিন্তু হাত-পা নড়ানো যাচ্ছে না, তাই না? এই ওষুধের মজাটাই এখানে। বিন্দুমাত্র সন্দেহ করতে পারবে না কেউ। আপনাকে মৃত বা অজ্ঞান ভাবতে পারবে না। বেশির ভাগ সময়ই ঝিমোবেন, কিন্তু কাঁধের উপর একটা টোকা দিলেই জেগে গিয়ে লোকজনের সন্দেহ দূর করবেন; অসুস্থ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারবে না কেউ। অসুবিধা শুধু একটাই। বেশিক্ষণ থাকে না এই ওষুধের এফেক্ট, কয়েক ঘন্টা পর পরই একটা করে ইঞ্জেকশন দিতে হয়। অবশ্য ডোজটা কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেয়া যেত, কিন্তু তাতে ভয়ানক কোন জখম হয়ে যেতে পারে শরীরের ভিতর। সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় ডেলিভারী দিতে চাই আমি আপনাকে।' রানার ঠোঁটে ঠোঁট ঘষল মিসেস গুপ্ত, এক এক করে খুলে ফেলল কোট, টাই, শার্ট, গেঞ্জি। এবার প্যান্ট ও জাঙ্গিয়াও নামিয়ে দিল। রানার আপাদমস্তক দেখল লোভাতুর দৃষ্টিতে। ঘড়ি দেখল।

'চারটি ঘন্টা সময় আছে এখন আমাদের হাতে। ভোর রাতে মেকাপ করতে বসব আপনাকে। বৃথা নষ্ট না করে আসুন সময়টা কাজে লাগানো যাক। বহুদিন এমন সুঠাম, ঋজু, দৃঢ় পুরুষের দেখা পাইনি।' কামনা মদির দৃষ্টিতে আবার পরীক্ষা করল সে রানাকে আপাদমস্তক। উঠে গিয়ে বাতি নিভিয়ে দিল। তারপর চলে এল বিছানায়। রানার বুকের ওপর।

বিভীষিকাময় চারটি ঘন্টা কেটে গেল শেষ পর্যন্ত। ভোর হয়ে আসতেই মুক্তি দিল মিসেস গুপ্ত রানাকে। সিরিঞ্জে করে ওষুধ নিয়ে এল আবার, রানাকে উপুড় করে ঢুকিয়ে দিল সূচটা ওর মেরুদণ্ডে। ভয়ঙ্কর ক্রোধ ছাড়া আর কোন অনুভূতি রইল না রানার ভিতর।

গোটা কয়েক বালিশ পিঠের কাছে দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় বসাল সে রানাকে, তারপর শেভিং ক্রীম আর ক্ষুর নিয়ে এল বাথরুম থেকে। অত্যন্ত অযত্নের সাথে রানার দাড়ি-গোঁফ কামাল মিসেস গুপ্ত, কয়েক জায়গায় কেটে গেল, ভ্রূক্ষেপও করল না, ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে সোজা উল্টো যেমন খুশি ক্ষুর চালিয়ে সাফ করে দিল সব। তারপর বসল একরাশ নকল চুল দাড়ি নিয়ে। একটা দুটো করে লাগাতে শুরু করল নকল গোঁফ-দাড়ি। দাঁতের ফাঁকে জিভের ডগা দেখা যাচ্ছে অতি-মনোযোগের ফলে। আধঘন্টা পর সন্তুষ্ট চিত্তে খানিকটা দূরে সরে গিয়ে পরীক্ষা করল সে রানাকে। কয়েকটা রঙিন পেনসিল দিয়ে কিছু জটিল দাগ টানল রানার কপালে, তারপর সরোজ গুপ্তের জামা কাপড় পরাতে শুরু করল ওর গায়ে। সারা রাতের পরিশ্রমের ফলে ঘামের গন্ধ বেরোচ্ছে মিসেস গুপ্তের শরীর থেকে, এতক্ষণে খেয়াল পড়ল তার নিজের দিকে। চট করে স্নান সেরে এল বাথরুম থেকে। একটা চেয়ারে বসে সিগারেট ধরাল।

'আপনার নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে করছে, কেন আপনাকে বন্দী করলাম, কি করব আপনাকে নিয়ে? আপনার কৌতূহল নিবৃত্ত করা আমার কর্তব্য। যদিও আপনার ইচ্ছা অনিচ্ছার তোয়াক্কা না রেখেই আমার যা খুশি তাই করব আমি, তবু নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানার অধিকার আপনার আছে, এবং

আমারও বলতে আপত্তি নেই। আসলে ব্যাপারটা আত্মরক্ষা ছাড়া আর কিছুই নয়। আপনার বিনিময়ে আমি নিজের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে নিচ্ছি। কথাটা নিশ্চয়ই স্বার্থপরের মত শোনাচ্ছে, মনে হচ্ছে আমার মত এমন নীচ জঘন্য চরিত্রের মেয়েলোক পৃথিবীতে আর একটিও আছে কিনা সন্দেহ, কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা রেখে যদি কখনও চিন্তা করবার সুযোগ পান তাহলে বুঝবেন, এছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিল না। উ-সেন বেঁচে থাকলে হয়তো কোন ব্যবস্থা করে নেয়া অসম্ভব হত না, আমার প্রতি দুর্বলতা ছিল ওর, কিন্তু ওর লোকজনের কাছে বিন্দুমাত্র সহানুভূতি আশা করি না আমি। বহুদিন সুযোগের অপেক্ষা করেছে হুয়াং আর স্যুই থি, দুচোখে দেখতে পারে না ওরা আমাকে—তার প্রমাণ নিজের চোখেই দেখতে পেয়েছেন, দলের লোক হওয়া সত্ত্বেও একটা কথা পর্যন্ত জিজ্ঞেস করবার প্রয়োজন বোধ করেনি, পাঠিয়ে দিয়েছে আমাদের খুন করবার জন্যে ইয়েন ফ্যাঙকে। আমাদের মধ্যেকার পারস্পরিক অপছন্দ আর রাখা ঢাকা নেই। ওদের শক্তি অনেক, ওদের সাথে টক্কর দিয়ে আমার পক্ষে টিকে থাকা অসম্ভব। আপনাকে মিথ্যে বলেছিলাম, ভারতে গিয়ে আসলে নিস্তার পাব না আমি ওদের হাত থেকে। আরও অনেক দূরে সরে যেতে হবে আমাকে। এর একমাত্র উপায় হিসেবে আপনাকে বেছে নিয়েছি আমি। ওদের হাত থেকে নিস্তার পেতে হলে ওদের কাছেই ফিরে যেতে হবে আমাকে। কিন্তু ওদের কাছে আত্মসমর্পণ না করেও উপায় আছে আমার। আপনাকে তুলে দেব আমি পাকিস্তানী জেনারেলের হাতে, বিনিময়ে চাইব একটা আমেরিকান পাসপোর্ট এবং প্লেনের টিকেট।'

ফাইলটা তুলে নিল মিসেস গুপ্ত হাতে, পাতা উল্টে দেখল। মৃদু হাসি ফুটে উঠল ঠোঁটে। বলল, 'এটা সাথে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। যাবার সময় রিসেপশনিস্টকে দিয়ে যাব, সাতদিন পর পোস্ট করবে সে এটা নির্দিষ্ট ঠিকানায়।' কিছুক্ষণ চুপচাপ সিগারেট টানল মিসেস গুপ্ত। 'ইয়েন ফ্যাঙকে মেরে ফেলার দরকার ছিল। সরোজ মারা গেছে একথা এখন আমি আর আপনি ছাড়া কেউ জানে না। বেশ কিছুক্ষণ খবরটা চেপে রাখতে চাই আমি। ওকে ছেড়ে দিলে ব্যাপারটা প্রকাশ হয়ে যেত আগেই, তাহলে আর বারগেনিং-এর সুযোগ থাকত না।' ঘড়ি দেখল মিসেস গুপ্ত, রানার দিকে চাইল, বলল, 'ওষুধের প্রভাবটা এখন কি অবস্থায় আছে দেখে নিয়ে নাস্তার জন্যে বলব।'

হঠাৎ জ্বলন্ত সিগারেটটা ঠেসে ধরল সে রানার হাতের তালুতে।

হাতটা সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল রানা, অবাক হয়ে চেয়ে রইল হাতটার দিকে, একটা আঙুল নড়াবারও ক্ষমতা নেই ওর। ব্যথার চোটে চোখের পাপড়িগুলো কাঁপল শুধু বার কয়েক। সন্তুষ্ট চিত্তে সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিল মিসেস গুপ্ত অ্যাশট্রেতে। ফুঁ দিয়ে রানার হাতের তালু থেকে ছাইগুলো উড়িয়ে দিল। রানার মাথার মধ্যে দাউ দাউ করে জ্বলল প্রচণ্ড ক্রোধ। কটমট করে চেয়ে রইল সে মিসেস গুপ্তের চোখের দিকে। রানার ভাবটা পরিষ্কার

বুঝতে পেরে হাসল মিসেস গুপ্ত।

'এই ওষুধের আর একটা গুণ, মনের ভাবটা চেপে রাখতে পারবেন না। আপনি রেগে গেছেন আমার ওপর, অবশ্য সেটাই স্বাভাবিক, আমার বক্তব্য শোনার পর রেগে যাওয়া ছাড়া উপায় কি?' টেলিফোনের রিসিভার কানে তুলে নিল মিসেস গুপ্ত। 'গুড মর্নিং। আমি মিসেস গুপ্ত বলছি। হঠাৎ শরীরটা খারাপ হয়ে গেছে আমার স্বামীর, বেড়ে গেছে আর্থ্রিটিস। আজই মান্দালয়ে ফিরে যেতে হচ্ছে আমাদের।...না না, চিন্তার কিছুই নেই। ডাক্তার লাগবে না। আগেও তো দেখেছেন, মাঝে মাঝেই হয় এরকম। এমন কিছুই নয়। বিশ্রাম ছাড়া আর কোন চিকিৎসা নেই এখন।....হ্যাঁ, খুবই দুর্ভাগ্যজনক। যাই হোক, নাস্তা খেয়েই রওনা হচ্ছি আমরা, একটা ট্যাক্সির ব্যবস্থা করে দিতে পারলে ভাল হয়। সোজা রেল স্টেশন।...নাস্তার পর। গুড। থ্যাংকিউ।'

আরেকটা সিগারেট ধরাল মিসেস গুপ্ত, তারপর ফাইলটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আমি একটু ঘুরে আসছি। আশেপাশের অবস্থাটা বুঝে নিতে হবে একটু—এটারও ব্যবস্থা করে আসি সেই সাথে।' হাতের ফাইল দিয়ে চুলকাল পিঠটা। 'তবে একটা ব্যাপারে আপনার স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার, মিস্টার আব্বাস মির্জা, কোন রকম গোলমাল করার চেষ্টা করে লাভ নেই। কোন উপায় নেই আপনার। সম্পূর্ণভাবে আমার হাতের মুঠোর মধ্যে আপনি এখন। কাজেই দুর্ভাগ্যকে মেনে নিয়ে হাল ছেড়ে দেয়াই এখন বুদ্ধিমানের কাজ হবে। শরীর যখন চলছে না, তখন মনে মনে হাজারো প্ল্যান এঁটে কি লাভ? শুধু শুধুই কষ্ট বাড়ানো। তার চেয়ে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন বরং।'

রানার কাপড়-চোপড় ভাঁজ করে একটা সুটকেসে ভরে ফেলল মিসেস গুপ্ত, তারপর বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। আধশোয়া হয়ে বসে রইল রানা। মাথাটা ঘুরছে এখনও, মনে হচ্ছে শূন্যে ঝুলে রয়েছে সে। চিন্তার গতিও যেন মন্থর হয়ে এসেছে।

রানার পরিচয় জানা নেই ফ্যান সু গুপ্তের—জানা থাকলে আরও অনেক কিছু দাবি করতে পারত সে কর্নেল শেখের কাছে, রানাকে বন্দী করার বিনিময়ে বহু কিছুই দিতে প্রস্তুত থাকত পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স। পরিষ্কার বুঝতে পারছে রানা, ঠিক পথেই চলেছে এই মেয়েলোকটা, যা চায় তা ঠিকই আদায় করে নিতে পারবে জেনারেল এহতেশামের মাধ্যমে, ডক্টর হুয়াং বা স্যুই থি আটকাতে পারবে না ওকে হাজার ইচ্ছে থাকলেও। মনে মনে মিসেস গুপ্তের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারল না রানা। যা করছে এটাই মিসেস গুপ্তের বাঁচবার একমাত্র পথ।

হাত দুটো মুঠো পাকাবার চেষ্টা করল রানা, কোন সাড়া নেই। আগামী কয়েক ঘণ্টা থাকবেও না। এই অবস্থায় কি করতে পারে সে? কিভাবে মুক্ত করবে নিজেকে? গত রাতে রানাকে ফিরে না যেতে দেখে কি ভাববে সোফিয়া? কি করবে? ওকি এখানে খোঁজ নিতে আসবে? এলেই বা কি, দেখবে মিস্টার অ্যান্ড মিসেস গুপ্ত চলে যাচ্ছে হোটেল ছেড়ে, টেরও পাবে না সরোজ গুপ্তের ছদ্মবেশে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে রানাকে। তাছাড়া টের পেলেও

যে কোন সাহায্য করতে পারবে তা মনে হয় না।

একটা খটাং শব্দ শুনে চমকে উঠল রানা। আশ্চর্য! মনে মনেই চমকাল সে, বাইরে তার কোন প্রকাশ হলো না। ঘাড় ফেরাতে পারছে না বলে দেখতে পাচ্ছে না রানা কে এল। এত তাড়াতাড়ি ফিরবে না মিসেস গুপ্ত। তাহলে কে?

না। সোফিয়া না। বেয়ারা। ট্রলিতে করে ঠেলে নিয়ে এসেছে চা-নাস্তা। এক এক করে নামিয়ে রাখছে টেবিলের উপর। রানার দিকে একবার চেয়ে নিজের কাজে মন দিল সে। সমস্ত মানসিক শক্তি একত্রিত করে ওর মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করল রানা।

টেবিলটা সাজিয়ে রানার দিকে ফিরল বেয়ারা, বলল, 'নাস্তা দিয়ে গেলাম, স্যার। মেম সাহেব এখুনি এসে পড়বেন।'

'হেল্প মি!' বলল রানা। কিন্তু গলা দিয়ে অস্পষ্ট একটা শব্দ বেরোল শুধু।

'কি বললেন?' কথাটা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল বেয়ারা।

রানা বুঝল কথা দিয়ে কিছুই বোঝাতে পারবে না সে। অস্বাভাবিক কিছু একটা করতে হবে ওর সন্দেহ উৎপাদন করতে হলে। এমন ভাবে সে বসে আছে যে একটু বাঁয়ে সরতে পারলেই মেঝেতে পড়ে যাওয়া সম্ভব হবে। প্রাণপণ চেষ্টায় একটু কাত হলো রানা। ধীরে ধীরে পড়ে যাচ্ছে সে বিছানা থেকে।

রানাকে উত্তর দিতে না দেখে বেয়ারা ভেবেছিল শুনতে ভুল করেছিল সে, চলে যাচ্ছিল, কিন্তু রানাকে পড়ে যেতে দেখে ছুটে এল। ধরে ফেলার আগেই পড়ে গেল রানা মেঝেতে মুখ থুবড়ে। ঠিক এমনি সময়ে ঘরে এসে ঢুকল মিসেস গুপ্ত।

'কি হয়েছে?' দ্রুত পায়ে এগিয়ে এল মিসেস গুপ্ত। ব্যাপার বুঝতে পেরে বেয়ারাকে বলল, 'একটু ধরতে হবে। তুমি পায়ের দিকটা ধরো।'

'কি যেন বলতে চেষ্টা করছিলেন উনি, ঠিক বুঝতে পারলাম না।' বলল বেয়ারা। 'মনে হচ্ছিল খুব কষ্ট হচ্ছে ওনার।'

'অসুখটা বেড়েছে।' সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল মিসেস গুপ্ত। দুজন মিলে তুলে দিল রানাকে বিছানায়। রানার প্রতি মায়া ঝরে পড়ছে মিসেস গুপ্তের দৃষ্টিতে। বলল, 'ইশ্‌শ্ দেখো তো, কপালটা ফুলে গেছে কি রকম! এত অস্থির হলে কি চলে? বিশ্রাম দরকার এখন তোমার। চুপচাপ শুয়ে থাকো, দু'দিনে ঠিক হয়ে যাবে।' বেয়ারার দিকে চেয়ে বলল, 'কাল সারা রাত ছট ফট করেছে বেচারা। ওর মনে হয়েছে চারদিক থেকে গোলমাল শুনতে পাচ্ছে।'

'গোলমাল!' অবাক হলো বেয়ারা। 'গোলমাল হবে কি করে? পাঁচশো তিনে এক ফ্যামিলি আছে, তাছাড়া পুরো ফ্লোরই তো খালি।'

'আমি তা জানি, কিন্তু ওনাকে বোঝাবে কে বলো?' হাসল মিসেস গুপ্ত। 'চা-টা গরম আছে তো?'

'একেবারে গরম, ম্যাডাম, তিন মিনিট আগে ঢালা হয়েছে ফুটন্ত পানি।'

'গুড। নাস্তাটা সেরেই রওয়ানা হব আমরা, তখন তোমার সাহায্য দরকার

পড়বে।'

'ঠিক আছে, ম্যাডাম।'

বেরিয়ে গেল বেয়ারা। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এল মিসেস গুপ্ত। ফুটন্ত চায়ের পটটা হাতে তুলে নিয়ে বিছানার পাশে এসে বসল।

'বারণ করা সত্ত্বেও চেষ্টার ক্রুটি রাখছ না তুমি, আব্বাস মির্জা। পেলে কোন সাহায্য বেয়ারার কাছ থেকে?' বাঁকা করে হাসল মিসেস গুপ্ত। 'চেষ্টা করে কোন লাভ নেই। নাও, চা খাও!'

মুখটা সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু নড়াতে পারল না। পটের নলটা রানার দুই ঠোঁটের মাঝখানে ভরে দিয়ে কাত করল মিসেস গুপ্ত। ঠোঁট, জিভ পুড়ে গেল রানার, গাল বেয়ে নামল ফুটন্ত চা। চট করে একটা তোয়ালে টান দিয়ে নিয়ে মুছে দিল মিসেস গুপ্ত বাইরের চাটুকু, জামা কাপড় নষ্ট হতে দিল না। তারপর হাসল মধুর করে।

'অভিজ্ঞতাটা যন্ত্রণাদায়ক। কিন্তু যারা আগুন নিয়ে খেলা করে তাদের আগুনের তাপটা জানা থাকা দরকার। বশ্যতা স্বীকার না করে উপায় নেই তোমার, আব্বাস মির্জা।'

দুই

দুইজন পোর্টার পাঁজাকোলা করে তুলে শুইয়ে দিল রানাকে হুইল চেয়ারে। চেয়ারটা ঠেলে নিয়ে লিফটে উঠল মিসেস গুপ্ত। লাউঞ্জে ওদের বিদায় দেয়ার জন্যে এসে হাজির হলো হোটেল ম্যানেজার, প্রচুর দুঃখ প্রকাশ করল, কোন রকম সাহায্যে আসতে পারে কিনা জিজ্ঞেস করল। যথেষ্ট বিনয়ের সাথে সমস্ত সাহায্য প্রত্যাখ্যান করে, বিল চুকিয়ে দিয়ে চোখের সামনে যত বেয়ারা আর পোর্টার দেখতে পেল সবার হাতে দশ টাকার একটা করে নোট গুঁজে দিতে শুরু করল মিসেস গুপ্ত।

হঠাৎ চোখ পড়ল রানার সোফিয়ার উপর। কাউন্টারের পাশে দাঁড়িয়ে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে রানার দিকে! অনেক চেষ্টা করে তিন বার চোখের পাপড়ি ফেলল রানা, পাঁচ সেকেন্ড পর আবার তিন বার। আশা—যদি কোন মতে সন্দেহের উদ্রেক করতে পারে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। চিনতে পারার কোন লক্ষণই প্রকাশ পেল না সোফিয়ার মধ্যে। মিসেস গুপ্ত একবার কড়া চোখে চাইল সোফিয়ার দিকে। রানা ঠিক বুঝতে পারল না, গত পরশু দেখা অ্যাংলো মেয়েটাকে বার্মিজ পোশাকে ভিন্ন পরিবেশে চিনতে পারল কিনা মিসেস গুপ্ত। ট্যাক্সিতে তোলা হলো রানাকে। আরেকবার চোখ পড়ল ওর সোফিয়ার ওপর। ঠিক একই ভঙ্গিতে, যেন কারও জন্যে অপেক্ষা করছে এমনি ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। ওর মধ্যে কোন রকম চাঞ্চল্যের আভাস দেখতে না পেয়ে একেবারে হতাশ হয়ে গেল রানা। বুঝল, সোফিয়ার কাছ

থেকে কোন সাহায্য পাওয়া যাবে না। মনে মনে একটু যেন স্বস্তিও বোধ করল সে। এই বিষাক্ত সাপের বিরুদ্ধে লাগতে যাওয়াটা সোফিয়ার মত সহজ সরল মেয়ের পক্ষে ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক হত; ভালই হয়েছে টের পায়নি মেয়েটা কিছুই, টের পেলে নিজের বিপদ ডেকে আনা ছাড়া আর কিছুই করতে পারত না সে।

গাড়িতে উঠেই রানাকে সান্ত্বনা দেয়ার ভঙ্গিতে ওর হাতের তালুতে দুই আঙুল দিয়ে মৃদু টোকা দিল মিসেস গুপ্ত। কোন সাড়া পেল না রানা হাতের তালুতে। রানার যাতে আরাম হয় সেজন্যে ভাল করে হেলান দিয়ে বসিয়ে দিল, একহাতে জড়িয়ে ধরল রানার কাঁধ। হুইল চেয়ারটা ভাঁজ করে গাড়ির বুটে তুলে দিল পোর্টার। ব্যাগ, সুটকেস উঠে যেতেই গাড়ি ছেড়ে দিল ড্রাইভার।

'সোজা রেল স্টেশনে যাব, ম্যাডাম?'

'হ্যাঁ, স্টেশনের দিকেই যাও, কিন্তু পথে জেনারেল পোস্ট অফিসের সামনে একটু রেখো গাড়িটা কয়েক মিনিটের জন্যে। একটা ট্রাংকল করব। পাঁচ সাত মিনিট লাগবে।'

জি. পি.ও-র সামনে থেমে দাঁড়াল ট্যাক্সি। আরেকবার রানার হাতের তালুটা পরীক্ষা করে নেমে গেল মিসেস গুপ্ত। সামান্য একটু শিরশিরে অনুভূতি হলো রানার হাতে। মিসেস গুপ্ত টের পেল না, কিন্তু ভিতর ভিতর আশান্বিত হয়ে উঠল রানা। আর আধঘন্টা সময় পেলেই ফিরে আসবে ওর হৃতশক্তি। খোদার কাছে প্রার্থনা করল সে যেন ট্রাংক লাইন পেতে দেরি হয় শয়তান মেয়েলোকটার।

ট্যাক্সিওয়ালাকে সাবধান করল মিসেস গুপ্ত। 'আমার স্বামী ভয়ানক অসুস্থ। নার্ভাস ব্রেক ডাউন। যদি কোন কথা বলতে চায়, সাথে সাথে ডাকবে আমাকে। বুঝেছ?'

গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এবং সেইসাথে মোটা বকশিশের ভরসা পেয়ে বিনীত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল বিগলিত ড্রাইভার। ড্রাইভিং সীটে পাশ ফিরে বসে হাঁ করে চেয়ে রইল রানার মুখের দিকে কোন কথা বলে কিনা দেখার জন্যে।

রানার প্রার্থনা বিফল করে দিয়ে ঠিক সাত মিনিটের মধ্যে ফিরে এল মিসেস গুপ্ত। ছুটল ট্যাক্সি রেল স্টেশনের দিকে। খুশি খুশি লাগছে মিসেস গুপ্তকে। গুন গুন করে গান ধরেছে।

স্টেশনে ওপেন টিকেটটা কনফার্ম করাতে মিনিট দশেক ব্যয় হয়ে গেল। দু'জন কুলির জিম্মায় রেখে গিয়েছিল রানাকে, ফিরে এসে ট্রেনে ওঠাবার ইঙ্গিত করল মিসেস গুপ্ত কুলিদের। ধরাধরি করে তোলা হলো রানাকে হুইল চেয়ারসহ ট্রেনের করিডরে। তারপর ঠেলে নিয়ে ঢোকানো হলো ছোট্ট একটা কম্পার্টমেন্টে। ব্রিটিশ আমলের পুরানো বগি বদলে আধুনিক হয়ে গেছে বার্মা রেলওয়ে।

'মাঝের সীটে, মাঝের সীটে।' বলল মিসেস গুপ্ত। 'জানালার ধারে বসতে অপছন্দ করেন উনি।'

তিনজন মিলে ধরে শুইয়ে দিল ওরা রানাকে মাঝের সীটে। একটা রাবারের বালিশ ফুঁ দিয়ে ফুলিয়ে রানার মাথার নিচে দিয়ে দিল মিসেস গুপ্ত। তৃতীয়বার পরীক্ষা করল রানার হাতের তালু। লাফ দিয়ে উঠল দুটো আঙুল রানার তালুতে মৃদু ঘষা দিতেই। ভুরু জোড়া কুঁচকে গেল মিসেস গুপ্তের। তাড়া দিল কুলিদের, 'যাও, তাড়াতাড়ি লাগেজগুলো নিয়ে এসো।'

বেরিয়ে গেল কুলি দু'জন। সতর্ক দৃষ্টিতে রানার উপর নজর রাখল মিসেস গুপ্ত। একটু বিচলিত দেখাচ্ছে ওকে। ইতোমধ্যে হাতের কব্জি থেকে কনুই পর্যন্ত সাড়া ফিরে পেয়েছে রানা। দ্রুত দূর হয়ে যাচ্ছে অসাড়ত্ব।

ফিরে এল কুলি দু'জন মাল-সামান নিয়ে, কিছু বাঙ্কের উপর তুলে দিল, কিছু নামিয়ে রাখল পাশের খালি সীটের উপর। দশ টাকার দুটো নোট ধরিয়ে দিল মিসেস গুপ্ত ওদের হাতে। খুশি হয়ে বেরিয়ে গেল ওরা হাঁটু পর্যন্ত মাথা নুইয়ে সালাম করে। দরজাটা বন্ধ করে করিডরের পাশে জানালার ফ্রস্টেড কাচগুলো নামিয়ে দিল মিসেস গুপ্ত। করিডর দিয়ে লোকজনের চলাফেরার সময় সামান্য একটু ছায়া দেখা যাচ্ছে কেবল। যাত্রীদের সবার চোখ থেকে সম্পূর্ণ আড়াল হয়ে গেল ছোট্ট কম্পার্টমেন্টটা। অপর পাশের জানালায় কনুইয়ের ভর দিয়ে প্ল্যাটফরমের দিকে চেয়ে রইল মিসেস গুপ্ত। প্ল্যাটফরমের ব্যস্ততা দেখছে। একজন লোককে জিজ্ঞেস করল, ট্রেন ছাড়বে কখন; এক্ষুণি ছাড়বে শুনে কিছুটা নিশ্চিন্ত হলো। প্রতি তিন সেকেন্ড অন্তর অন্তর ঘাড় ফিরিয়ে রানাকে দেখছে সে।

ডান হাতটা মুঠি করে পরীক্ষা করল রানা শক্তি ফিরে এসেছে কিনা। পুরো সাড়া ফিরে আসেনি এখনও, কিন্তু বেশ জোর পাচ্ছে সে হাতে। কাঁধ পর্যন্ত বোধ ফিরে এসেছে, কিন্তু কাঁধটা নড়ানো যাছে না। মনে হচ্ছে ওই অংশটা মরে গেছে।

জানালার কাচের দিকে চোখ রেখেছিল মিসেস গুপ্ত। রানার এই নড়াচড়া লক্ষ্য করল সে কাচের গায়ে। সরে এল জানালা থেকে। বাঙ্কের উপর থেকে কসমেটিক কেসটা নামাল। বলল, 'ট্রেনটা ছাড়লে পরে ইঞ্জেকশন দেব ভেবেছিলাম, পাছে লোকজন এসে ডিসটার্ব না করে; কিন্তু দেখতে পাচ্ছি দেরি করলে বিপদে পড়ে যাব।'

কসমেটিক কেসটা পাশের সীটের উপর রেখে তার মধ্যে থেকে একটা ছোট অ্যালুমিনিয়ামের বাক্স বের করল মিসেস গুপ্ত। ঘাড়ে এখনও শক্তি পাচ্ছে না রানা। এগিয়ে এল মিসেস গুপ্ত সিরিঞ্জ হাতে। 'তোমাকে উপুড় করে নিতে হবে। অসুবিধে নেই, কাপড়ের ওপর দিয়েই ইঞ্জেক্ট করা যাবে। নড়াচড়া কোরো না, শুধু শুধু ব্যথা পাবে তাহলে।' আরও একটু এগিয়ে এল সে।

লম্বা করে দম নিল রানা। তারপর বিদ্যুৎ বেগে ডান হাতে ধরে ফেলল মিসেস গুপ্তের বাম হাত। তাজ্জব হয়ে গেল মিসেস গুপ্ত। এতটা সে আশা করেনি। চোখে চোখে চেয়ে রইল দু'জন কয়েক সেকেন্ড। 'বোকামি কোরো না, আব্বাস মির্জা।' ঠাণ্ডা গলায় বলল মিসেস গুপ্ত। 'এটা রিজার্ভ করা কম্পার্টমেন্ট। কেউ আসবে না। কারও সাহায্য পাবে না তুমি। হাত ছাড়ো।'

ততক্ষণে বাম হাতটা উঁচু করে ফেলেছে রানা। বিপদ টের পেয়ে প্রাণপণ শক্তিতে ঠেলা দিয়ে উপুড় করার চেষ্টা করল মিসেস গুপ্ত রানাকে, সেই সাথে এগিয়ে আসছে সিরিঞ্জটা। সর্ব শরীর এখনও অসাড় হয়ে আছে রানার। কিন্তু বাম হাতে ভর দিয়ে ঝট করে সরে গেল সে খানিকটা। একেবারে কাছে এসে গিয়েছিল সূচটা—রানা সরে যেতেই ঘ্যাচ করে ঢুকে গেল গদির ভিতর। এইবার কোমর পেঁচিয়ে ধরে হ্যাঁচকা টান দিল রানা বাম হাতে। সীটে বেধে গেছে মিসেস গুপ্তের উরু, শরীরটা বাঁকা হয়ে যাচ্ছে পিছন দিকে।

'উহ্, ছাড়ো! ব্যথা লাগছে।' ককিয়ে উঠল মিসেস গুপ্ত। ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেছে ওর মুখ।

মনে মনে হাসল রানা। মনে মনেই বলল, 'আরাম দেয়ার জন্যে এটা করছি না, সুন্দরী।' আরও শক্ত করে পেঁচিয়ে ধরে আরও জোরে টানল ওকে সামনের দিকে। ডান হাত সহ কোমর জড়িয়ে ধরেছে বলে কজিটুকু ছাড়া হাতটা নড়াতে পারছে না মিসেস গুপ্ত, তবু বার কয়েক চেষ্টা করল সে সূচটা রানার শরীরে ঢুকিয়ে দেবার।
যখন বুঝল এ চেষ্টা বৃথা, তখন হাত থেকে সিরিঞ্জটা ফেলে দিয়ে শারীরিক বল দিয়েই রানার মোকাবিলা করবার জন্যে প্রস্তুত হলো সে।

রানা জানে কি অবিশ্বাস্য শক্তি আছে মিসেস গুপ্তের গায়ে। বাইরে থেকে দেখলে কেউ কল্পনাও করতে পারবে না মেয়েমানুষের গায়ে এত জোর থাকতে পারে। অন্যের ক্ষেত্রে এই বিস্ময় এবং আকস্মিকতা প্রতিপক্ষকে হতচকিত করে দিয়ে পরাজিত করতে পারে হয়তো, কিন্তু রানা জানে এখন একটু ঢিল দিলেই সব আশা ভরসা শেষ হয়ে যাবে ওর। কাজেই মিসেস গুপ্তের ব্যথায় নীল হয়ে যাবার ছল বিন্দুমাত্র বিভ্রান্ত করতে পারল না ওকে। 'ছাড়ো, উহ্! ব্যথা লাগছে। ধরে রাখা ছাড়া আর কিছুই করতে পারবে না তুমি। ছাড়ো, বোকামি কোরো না। মিছেমিছি...' বলতে বলতে হঠাৎ প্রবল ভাবে টানা-হেঁচড়া শুরু করল মিসেস গুপ্ত। প্রস্তুত ছিল রানা। দাঁতে দাঁত চেপে আঁকড়ে ধরে রইল সে। বাম হাতে টানছে সামনে, ডান হাতে ঠেলছে পিছনে। ডান হাতটা কজি ছেড়ে উঠে এসেছে কাঁধের দুর্বল একটা নার্ভ সেন্টারে। ফিরে আসছে ওর শক্তি।

নিশ্চিত পরাজয় উপলব্ধি করতে পেরে-ককিয়ে উঠল মিসেস গুপ্ত। চোখ দুটো উদ্‌ভ্রান্ত দেখাচ্ছে, ধস্তাধস্তি কমে গেছে। ফোঁপাচ্ছে এখন, চোখ বেয়ে পানি গড়াচ্ছে, ব্যথার চোটে দাঁত বেরিয়ে গেছে, গাল দুটো কাঁপছে থর থর করে। সামনে ঝুঁকে কামড় দেয়ার চেষ্টা করল রানার নাকে। মাথাটা সরিয়ে নিল রানা। সারা পিঠ এখনও অবশ হয়ে আছে, কিন্তু ঘাড়ে ফিরে এসেছে বোধশক্তি।

ঠিক এমনি সময়ে খুলে গেল করিডরের দরজা। একজন স্যুট পরা বর্মী ভদ্রলোক মাথা ঢুকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আসতে পারি? সীট আছে?' কথাটা বলেই থমকে গেল সে দুই যাত্রীর অবস্থা দেখে।

'এটা রিজার্ভড্ কম্পার্টমেন্ট,' কোন মতে বলল মিসেস গুপ্ত। 'আমার স্বামী

অত্যন্ত অসুস্থ। দয়া করে গার্ডকে ডেকে দেবেন?'

লোকটা থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কি করবে বুঝতে না পেরে ইতস্তত করছে। চিৎকার করে উঠল মিসেস গুপ্ত, 'গার্ড! গার্ডকে ডাকুন! জলদি!'

দরজা ভিড়িয়ে দিয়েই ছুটল লোকটা গার্ডের উদ্দেশে। রানা বুঝল সময় ফুরিয়ে আসছে। জিভ নড়াতে পারছে না, কাজেই কোন কথাই বোঝাতে পারবে না সে কাউকে। আবার একটা ইঞ্জেকশন পড়লেই একেবারে অসহায় হয়ে যাবে সে আবার। কিন্তু ইতোমধ্যে কি করা যায় বুঝতে পারছে না সে। আর পাঁচটা মিনিট এইভাবে ধরে রাখতে পারলে সারা শরীরে সাড়া ফিরে আসত ওর, তখন ধীরে সুস্থে একটা ব্যবস্থা করলেই চলত—এখন শুধু ধরে রাখা ছাড়া আর কিছুই করবার নেই ওর। সাহায্যের সম্ভাবনা দেখতে পেয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে হুড়োহুড়ি শুরু করল মিসেস গুপ্ত। এঁকে বেঁকে রানার হাত থেকে ছুটবার চেষ্টা করছে সে। ডান পা-টা সীটের উপর তোলার চেষ্টা করছে। সেদিকে সুবিধে করতে না পেরে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সে মেঝেতে।

দরজা খুলে গার্ড ঢুকল। 'কি হয়েছে?' বলেই ব্যাপার বুঝতে পেরে একলাফে এগিয়ে এসে রানার দুই কাঁধ চেপে ধরল লোকটা।

'ওকে ব্যথা দেবেন না।' চিৎকার করে উঠল মিসেস গুপ্ত।

'কিন্তু, ম্যাডাম··· লোকটা···'

'ও আমার স্বামী। অসুস্থ। নার্ভাস ব্রেকডাউন। দয়া করে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে একটু সাহায্য করুন আমাকে।'

'যান, যান, সবাই যান এখান থেকে। এটা প্রাইভেট কম্পার্টমেন্ট—যান সবাই, তামাশার কিছু নেই।' দু'তিন জন অতি উৎসাহী দর্শককে ঠেলে বের করে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল গার্ড। এগিয়ে এল রানার দিকে।

সারাটা পিঠ অবশ হয়ে রয়েছে। রানা বুঝল, হেরে গেছে সে। কথা বলবার চেষ্টা করল, কিন্তু আড়ষ্ট জিভ দিয়ে কোন শব্দ উচ্চারণ করতে পারল না। আপনা আপনি ঢিল হয়ে গেল ওর দুই হাত। এক ঝটকায় সরে গেল মিসেস গুপ্ত। আবার কথা বলবার চেষ্টা করল রানা, কোলা ব্যাঙের মত কর্কশ আওয়াজ বেরোল শুধু।

'ডাক্তার ডাকা দরকার,' বলল গার্ড।

'না, না। ডাক্তারের কোন দরকার নেই,' বলল মিসেস গুপ্ত। কাঁধটা ডলছে সে ডান হাত দিয়ে। মুছে ফেলেছে চোখের পানি। 'একটা ঘুমের ওষুধ ইঞ্জেক্ট করলেই ঠিক হয়ে যাবে এক্ষুণি। একটু ধরুন ওকে।' সিরিঞ্জটা তুলে নিল সে মেঝে থেকে।

অনেক চেষ্টা করেও একটি কথাও বলতে পারল না রানা। দু'জনে মিলে ধরে উপুড় করে ফেলল ওকে, দুই হাত চেপে ধরল গার্ড, ঘ্যাচ করে ঢুকে গেল সূচটা মেরুদণ্ডের ভিতর। সিরিঞ্জটা বাক্সের ভিতর ভরে সেটা রেখে দিল মিসেস গুপ্ত কসমেটিক কেসে। তারপর মধুর করে হাসল গার্ডের দিকে ফিরে। 'কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কাজ শুরু হয়ে যাবে ওষুধের।'

'এই পাগলের সাথে একা এক কামরায় থাকা তো আপনার জন্যে নিরাপদ

নয়, ম্যাডাম।'

'আপনি আমার স্বামীর সম্পর্কে কথা বলছেন।' একটু উষ্মা প্রকাশ পেল মিসেস গুপ্তের কথায়। পরমুহূর্তে নরম হয়ে গেল আবার। 'উনি আসলে পাগল নন, সাময়িক স্নায়বিক উত্তেজনা ছাড়া কিছুই নয়।'

'কিন্তু ম্যাডাম, যা দেখলাম তাতে আমার মনে হয়, বেকায়দায় পড়ে গেলে মারাও যেতে পারেন...'

'না, না। গত দুই বছর ওর সাথে আছি আমি, সেবা শুশ্রূষা করছি, ওর সবকিছু আমার মুখস্থ। কোন অসুবিধে হবে না আর। আপনার সাহায্যের জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ, দরকার হলে আবার ডাকব আপনাকে।' পঞ্চাশ টাকার একটা নোট বের করে গার্ডের হাতে দিল মিসেস গুপ্ত। বলল, 'এটা আপনার। ঠিক সময় মত এসে উপস্থিত হয়েছিলেন আপনি।'

দুই তিন সেকেন্ড বুঝতে পারল না গার্ড যে টাকাটা ওকে নিতে বলা হচ্ছে, যখন বুঝল তখন ছোঁ মেরে প্রায় কেড়ে নিল সে নোটটা। ভাঁজ করে নোটটা পকেটে রেখে আকর্ণ হাসল। 'থ্যাংকিউ, ম্যাডাম। টাকা দেয়ার কি দরকার ছিল। যখন দরকার হবে ডাকবেন, ছুটে চলে আসব।' রানার দিকে ফিরল। 'কেমন বোধ করছেন এখন?'

'দেখুন না, এখুনি কেমন ঘুম ঘুম ভাব এসে গেছে চোখে।' জবাব দিল মিসেস গুপ্ত। 'আশাকরি আর কোন অসুবিধা হবে না। ঘুমিয়ে পড়লেই সব ঠিক হবে যাবে। আপনি দেখবেন কেউ যেন আমাদের ডিস্টার্ব না করে। কেমন?'

সম্মতি জানিয়ে এবং টাকা দেয়ার জন্যে আরও একবার ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে গেল গার্ড। প্রায় সাথে সাথেই চলতে শুরু করল ট্রেনটা। এবার দরজায় বল্টু লাগিয়ে দিল মিসেস গুপ্ত। বাম কাঁধটা ডলতে ডলতে এসে বসল সামনের সীটে। সিগারেট ধরাল একটা। রানাকে আগুনের দিকে চাইতে দেখে বলল, 'না। আগুনের ছ্যাঁকা দিয়ে তোমাকে বশ্যতা স্বীকার করানো যাবে না, বুঝে নিয়েছি আমি। আশ্চর্য!

অদ্ভুত মানসিক শক্তি আছে তোমার মধ্যে, আব্বাস মির্জা। এত দ্রুত এই ওষুধের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে দেখিনি আমি আর কাউকে। তাছাড়া অসম্ভব শক্তি তোমার গায়ে। এত ভয়ঙ্কর লোকও দেখিনি আমি এর আগে।' খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'স্বাধীনতার আগে নিশ্চয়ই তুমি পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সে ছিলে? ওদের সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনেছি আমি সরোজের মুখে। ওদের মধ্যে একজনকে সরোজ দারুণ শ্রদ্ধা করত, মনে মনে তার মত হবার স্বপ্ন দেখত।' উঠে দাঁড়িয়ে কাপড় ছাড়তে শুরু করল মিসেস গুপ্ত। চক চক করছে চোখ দুটো। রানা দেখল, ঘাড়ের ওপর যেখানটা ও চেপে ধরেছিল, ফর্সা চামড়ার ওপর কালচে দাগ পড়ে গেছে সেখানে। মনে মনে খুশি হয়ে উঠছিল সে, কিন্তু মিসেস গুপ্তকে ব্লাউজ, ব্রেসিয়ার সব খুলতে দেখে ওর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে বিষিয়ে গেল মনটা। কথা বলতে বলতে কাপড় ছাড়ছে মিসেস গুপ্ত। 'তোমাকে দেখে আমার কেবল সেই লোকটার কথা মনে

পড়ছে। যদিও জানি, সে হলে কিছুতেই এরকম বোকার মত পা দিত না আমার ফাঁদে, এস্পায়োনেজের জগতে সে একটা জিনিয়াস বলে পরিচিত, তোমার মত নয়—তবু কেন যেন ওর কথাই মনে আসছে আমার বার বার।' কাপড় ছেড়ে হাঁটু গেড়ে বসল সে রানার পাশে। দ্রুত হাতে জামা কাপড় খুলছে রানার। মুখের কাছে মুখ এনে লিপস্টিকে লাল ঠোঁট দুটো ঘষল রানার ঠোঁটে, ছোট্ট করে কামড় দিল রানার গালে। মধুর হাসি হেসে বলল, 'বারো ঘণ্টার জার্নি, স্টেশন মাত্র আটটা—কেউ ডিস্টার্ব করবে না। যাই হোক, সরোজের সেই দুর্ধর্ষ স্পাইয়ের নামটা কি জানো? মাসুদ রানা।' বুকের ওপর উঠে এল মিসেস গুপ্ত। 'সত্যি করে বলো তো, তুমিই কি সেই লোক?'

দুই চোখে গোক্ষুরের বিষ নিয়ে চেয়ে রইল রানা মিসেস গুপ্তের চোখের দিকে।

উত্তর দিতে পারল না।

তিন

ঋজু ভঙ্গিতে হেঁটে বেরিয়ে গেল লোকটা।

পুতুলের মত দাঁড়িয়ে দেখতে দেখতে মনটা হঠাৎ ভয়ানক খারাপ হয়ে গেল সোফিয়ার।

আশ্চর্য এক যাদু আছে লোকটার মধ্যে। ওর দুর্দান্ত, দুর্দমনীয় সাহসই কি এভাবে টানছে মনটাকে? সোফিয়া দেখেছে চিতাবাঘের মত কি আশ্চর্য গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল লোকটা শ্য ড্যাগন প্যাগোডায় মোটা লোকটার উপর, কেমন বিদ্যুৎ বেগে পরাজিত করেছিল ওকে সাঁতরে গিয়ে ইয়টে ওঠার পর, কি চমৎকার দৃপ্ত ভঙ্গিতে টেবিলের ওপর বসে মোকাবিলা করেছিল উ-সেনের লোকদের প্রশ্নগুলোর। আজ রাতে রোমান ক্যাথলিক ক্যাথেড্রালের পাশে ফিয়াটের ড্রাইভিং সীটে বসে বসে দেখেছে সে ঘড়ির দোলকের মত ঝুলতে ঝুলতে কিভাবে পনেরো তলার উপর এক জানালা থেকে আরেক জানালায় চলে গেল লোকটা। বড্ড ভয় লাগছিল ওর, মনে হচ্ছিল এই বুঝি পড়ে যাবে; পড়লে কি অবস্থা হবে ভাবতে গিয়ে গা গুলিয়ে আসছিল। এমন সাহসী লোক জীবনে দেখেনি সে।

কিন্তু সাহসই একমাত্র কারণ নয়, বুঝতে পারে সোফিয়া। অন্যকিছু আছে। কি সেটা? মন? হ্যাঁ, লোকটা মহৎ সন্দেহ নেই; পরোপকারী তাতেও কোন সন্দেহ নেই—কিন্তু কারণটা ঠিক এসবও নয়। ইচ্ছে করলেই বিপদ এড়িয়ে যেতে পারত লোকটা, কোথাকার কোন্ মিস্টার অ্যান্ড মিসেস সরোজ গুপ্ত বিপদে পড়েছে, টেলিফোনে টের পাওয়া গিয়েছে যে ওদের ঘরে অন্য লোক ঢুকেছে, ব্যস ছুটল লোকটা। নিজের বিপদের কথাটা ভাবল না একটি বারও। কিন্তু এটাও আসল কারণ নয়।

আসলে এইসব এই লোকটার সত্যিকার পরিচয় নয়, বাইরের ভূষণ মাত্র। আশ্চর্য এক পৌরুষ আছে এর মধ্যে—এবং সেইটাই এর আসল পরিচয়। কঠিন আর কোমলে মেশানো। দয়া-মায়া আর নির্মমতা একই সাথে বাস করে ওর বুকের ভিতর। ওর চোখ জোড়া যেমন কামনায় দগ্ধ করে দিতে পারে নারীর হৃদয়, তেমনি নিস্পৃহ হয়ে যেতে পারে মৌন ধ্যানী ঋষির মত। অদ্ভুত এক মানুষ।

বুকের ভিতর কেমন যেন চিনচিনে ব্যথা অনুভব করছে সোফিয়া ওকে যেতে দিয়ে। নির্বিকার হেঁটে চলে গেল লোকটা বিপদের মুখে নারীর আলিঙ্গন মুক্ত হয়েই—সোফিয়া জানে এটা নারীর প্রতি অনাসক্তি নয়, বলিষ্ঠ চরিত্রের স্বাভাবিক প্রকৃতি।

বাঙালীরা এরকম জানত না সোফিয়া। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের খবর অত্যন্ত আগ্রহের সাথে পড়েছে সে একাত্তরের নয়টি মাস, শান্তিপ্রিয় ভাবুক বাঙালী জাতির অসমসাহসিক বীরত্বের কথা পড়েছে সে খবরের কাগজে; কিন্তু আজ সত্যিকার একজন বাঙালীকে দেখে বুঝতে পারল কেন একটা ঝঞ্ঝাটপ্রিয় শক্তিশালী সশস্ত্র যোদ্ধা জাতি এমন চরম পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হলো, এমন শোচনীয় ভাবে পর্যুদস্ত হয়ে গেল ভাবুক বাঙালী জাতির কাছে। এদের মধ্যে আগুন আছে। গভীর মনোযোগের সাথে চেয়ে না দেখলে বোঝা যায় না কি আশ্চর্য শক্তি, কি অমিত তেজ রয়েছে এদের বুকের ভিতর, চরিত্রে। বাঙালী জাতি অনেক উপরে উঠবে, উপলব্ধি করতে পারল সোফিয়া অন্তরের অন্তস্তলে।

ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল সোফিয়া চিলেকোঠায়। রানার ফেলে দেয়া একটা সিগারেটের টুকরো থেকে ধোঁয়া উঠছে। সেই ধোঁয়ার দিকে চেয়ে চেয়ে মিনিট দুয়েক চিন্তা করল সে ভবিষ্যৎ কর্তব্য সম্পর্কে। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল মনে মনে। স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন পিস্তলটা পরীক্ষা করল নেড়েচেড়ে। তারপর সেটা ভ্যানিটি ব্যাগে পুরে নিয়ে নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে।

ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারল না সোফিয়া।

নানকিং হোটেলের ছয়তলায় লম্বা করিডরের শেষ মাথায় টয়লেটের দরজাটা সামান্য ফাঁক করে রেখে কয়েকটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করল সে। মিসেস গুপ্তকে ঘরে ফিরতে দেখল। তারপর কেটে গেল অনেকক্ষণ। ঘরের ভিতর কি হচ্ছে বোঝার উপায় নেই—শুধু একঘেয়ে অপেক্ষা। শেষ পর্যন্ত অধৈর্য হয়ে গিয়ে দরজায় কান পাতার সিদ্ধান্ত নিয়ে যেই টয়লেট থেকে বেরোতে যাবে, এমনি সময় দেখতে পেল ধীরে ধীরে খুলে গেল পাঁচশো আশির দরজা। একটু পরেই কাঁধের উপর একটা ভারী বোঝা নিয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে মিসেস গুপ্ত। বোঝাটা যে একজন মানুষের লাশ সেটা বুঝতে অসুবিধে হলো না সোফিয়ার। করিডরের ম্লান আলোয় চেহারাটা দেখতে পেল সে এক সেকেন্ডের জন্যে। ওটা যে একটা লাশ বুঝতে পেরেই ধক করে

উঠেছিল সোফিয়ার বুকের ভিতরটা, কিন্তু মুখের চেহারা দেখে আশ্বস্ত হলো কিছুটা। না, আব্বাস মির্জা নয়।

আলুথালু বেশ মিসেস গুপ্তের। মনে হচ্ছে কামরার ভিতর ধস্তাধস্তি হয়েছে। পাঁচ ছয়টা কামরা পেরিয়ে এসে একটা কামরার তালা খুলে ঢুকে পড়ল মিসেস গুপ্ত। আব্বাস মির্জা কোথায়? ওই কামরার ভিতর মারামারি হয়েছে, মানুষ মারা গেছে, লাশ গোপন করবার চেষ্টা করছে মিসেস গুপ্ত—বোঝা গেল, কিন্তু ক'জন মানুষ মারা গেছে, আব্বাস মির্জার খবর কি, বোঝা যাচ্ছে না। সে যদি সুস্থ থাকে, তাহলে মেয়েলোক লাশ বইছে কেন? নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে লোকটার। কি হয়েছে? জখম না মৃত্যু?

ছুটে গিয়ে দেখতে ইচ্ছে হলো ওর, কিন্তু সামলে নিল। একবার মনে হলো সরাসরি মিসেস গুপ্তকে নিজের পরিচয় দিয়ে জিজ্ঞেস করবে। কথাটা মনে আসতেই টয়লেট থেকে বেরোতে যাচ্ছিল, এমনি সময় বেরিয়ে এল মিসেস গুপ্ত করিডরে, এপাশ ওপাশ চাইল, তারপর দ্রুতপায়ে চলে গেল নিজেদের স্যুইটে। মেয়েলোকটার চলাফেরার মধ্যে কেমন যেন অস্বাভাবিক একটা কিছু টের পেল সোফিয়া, কি সেটা বুঝতে পারল না, কিন্তু মনে হলো এর কাছে খোলাখুলি কিছু বলতে যাওয়া এখন ঠিক হবে না। দেখা যাক, এরপর কি করে।

লোকটা আব্বাস মির্জা বা সরোজ গুপ্ত নয়, এটা বুঝতে পেরেছে সোফিয়া। তার মানে ওরা দু'জন ওই কামরার ভিতরেই আছে এখন। কি করছে আব্বাস মির্জা? গিয়ে হাজির হবে সে? হঠাৎ ইতস্তত ভাবটা কেটে গেল সোফিয়ার। পরিষ্কার মনে পড়ল, ইয়টে সে প্রশ্ন করেছিল আব্বাস মির্জাকে মিসেস গুপ্ত তার মিত্র কিনা, উত্তর পেয়েছিল—জানি না। এই কারণেই মনের ভিতর থেকে বাধা পাচ্ছিল সে মিসেস গুপ্তের কাছে সরাসরি নিজের পরিচয় দিতে। নিঃসন্দেহ না হয়ে কিছু করা এখন বোকামি হবে। ঠায় দাঁড়িয়ে রইল সে। তোশক, বালিশ আনা নেয়া দেখল, ইয়েন ফ্যাঙকে দেখল—মাথার মধ্যে চিন্তা চলেছে, কিন্তু পরিষ্কার হচ্ছে না কিছুই।

পুরো একটি ঘণ্টা অপেক্ষা করবার পরেও যখন মিসেস গুপ্ত আর ঘর থেকে বেরোল না, তখন পা টিপে চলে এল সে লাশ-লুকানো কামরার সামনে। হ্যান্ডেলে চাপ দিতেই খুলে গেল দরজাটা। দরজা লাগিয়ে দিয়ে বাতি জ্বেলে ভাল করে পরীক্ষা করল সে লাশ দুটো। ইয়েন ফ্যাঙকে চিনতে পারল সে। অপর লোকটা কে? বার্মিজ নয়। খুব সম্ভব ভারতীয়। অর্থাৎ গুপ্ত দম্পতির শত্রুপক্ষ নয়। আচ্ছা ! এই লোকটাই সরোজ গুপ্ত নয় তো? কিন্তু তাহলে দাড়ি গেল কোথায়?

সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় শুয়ে আছে লোকটা। যত্নের সাথে সাজিয়েছে মিসেস গুপ্ত ঘটনাটা। হোমোসেক্শুয়াল স্যাডিস্ট-ম্যাসোশিস্টের কারবার। পিস্তলটা পড়ে আছে কার্পেটের উপর। নিশ্চয়ই ইয়েন ফ্যাঙের আঙুলের ছাপ রয়েছে এখন ওটার গায়ে। এখানে দেখবার আর কিছুই নেই। সাবধানে, ঘরের কোন কিছু স্পর্শ না করে বেরিয়ে এল সোফিয়া করিডরে, গুপ্ত দম্পতির

স্যুইটের দরজায় কান পাতল, কিছুই শোনা গেল না, ফিরে এল আবার টয়লেটে।

ভোর বেলায় বেরিয়ে এল মিসেস গুপ্ত। হাতে আব্বাস মির্জার উদ্ধার করা ফাইল। লিফটে করে নেমে গেল সে নিচে। মুখে মৃদু হাসি। আব্বাস মির্জা কোথায়? খোঁজ করে দেখবে সে ঘরের ভিতর? এখন ও ঘরে না ঢোকাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে স্থির করল সোফিয়া। একাধিক লোক থাকার সম্ভাবনা আছে ও ঘরে।

দু'জনের জন্যে চা নাস্তা নিয়ে বেয়ারা ঢুকল পাঁচশো আশি নম্বর কামরায়। কোন্ দু'জন? সরোজ গুপ্ত আর আব্বাস মির্জা, না, মিসেস গুপ্ত আর আব্বাস মির্জা? বেয়ারার প্রবেশ দেখেই বোঝা গেল ওই ঘরে অস্বাভাবিক কিংবা গোপনীয় কিছুই নেই। এত ভোরে বোর্ডার নয় এমন কোন লোককে ওই ঘরে দেখলে অস্বাভাবিক ঠেকবে বেয়ারার কাছে—কাজেই যুক্তি সঙ্গত ভাবেই ধরে নেয়া যায়, ওই কামরায় রয়েছে অসুস্থ সরোজ গুপ্তের ছদ্মবেশে আব্বাস মির্জা। একা। সরোজ গুপ্ত মারা গেছে।

বোঝা যাচ্ছে, পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্ল্যান পরিবর্তন করেছে আব্বাস মির্জা। এখন প্রশ্ন, স্বেচ্ছায়, না, অনিচ্ছায়? ওকে কিছুই না জানিয়ে চলে যাবে লোকটা দেশ ছেড়ে, একটা খবর পর্যন্ত দেবে না, এমন হতেই পারে না। গত রাতে ফিরে আসার কথা ছিল আব্বাস মির্জার, কথা ছিল ফাইলটা মিস্টার অ্যান্ড মিসেস গুপ্তের হাতে তুলে দিয়ে ওরা যাবে মান্দালয়ে ওর বাবাকে উদ্ধার করতে। সবকিছু ভুলে গিয়ে হঠাৎ প্ল্যান বদলে ওকে একটা খবর পর্যন্ত না দিয়ে চলে যাবে লোকটা দেশ ছেড়ে একথা ভাবতেই পারে না সে। এমন অবশ্য হতে পারে যে হোটেলের কামরা থেকে ওর নাম্বারে ফোন করে ওর সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেছে লোকটা। কেউ ফোন ধরেনি। কিন্তু তাহলে তো সোফিয়ার কোন বিপদ হয়েছে মনে করে খোঁজ খবর করাই স্বাভাবিক। অন্তত এই লোকটার পক্ষে কিছু না বলে পালিয়ে যাওয়া মোটেই স্বাভাবিক নয়। দেখা যাক কি হয়।

খানিক বাদে ফিরে এল মিসেস গুপ্ত। বেরিয়ে গেল বেয়ারা। আর বেশিক্ষণ এই টয়লেটে থাকা নিরাপদ নয়। যে কোন সময় এখন জমাদার এসে ঢুকতে পারে ঝাড়ু দেবার জন্যে। একবার করিডরের এপাশ ওপাশ দেখে নিয়ে বেরিয়ে এল সোফিয়া। লিফট ব্যবহার করল না, সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল নিচে। লাউঞ্জে বসে নাস্তা সারল। আধ ঘণ্টার মধ্যেই নেমে এল মিসেস গুপ্ত। হুইল চেয়ার ঠেলে। মালপত্র নিয়ে আসছে পোর্টার।

অর্থাৎ চলে যাচ্ছে। এগিয়ে গিয়ে কাউন্টারের পাশে দাঁড়াল সোফিয়া। ম্যানেজারের সাথে কথা বলছে মিসেস গুপ্ত। সরাসরি চাইল সে মিস্টার গুপ্তের দিকে। দাড়ি গোঁফ থাকা সত্ত্বেও আব্বাস মির্জাকে চিনতে একটুও কষ্ট হলো না সোফিয়ার। আশ্চর্য চোখ দুটো লুকাবে কোথায়? কেমন যেন একটা অভিমান উথলে উঠতে চাইল ওর বুকের ভিতর। ওকে কিছু না জানিয়েই চলে যাচ্ছে লোকটা।

হঠাৎ ব্যাপারটা বুঝতে পারল সোফিয়া। মুখটা এমন ফ্যাকাসে কেন? চোখ দুটোই বা এমন ভাবে এপাশ ওপাশ নড়ছে কেন? মনে হচ্ছে, স্থির রাখতে পারছে না চোখের মণি। ড্রাগড্? কোন ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে ওকে?

মিসেস গুপ্তের কথা শুনে বোঝা যাচ্ছে মান্দালয়ে যাচ্ছে ওরা। কেন? এখান থেকে সোজা ব্যাংকক যাওয়ার কথা। তা না গিয়ে মান্দালয়ে চলেছে কেন? চোখের পাপড়ি ছাড়া আব্বাস মির্জার সারা শরীরে বিন্দুমাত্র প্রাণের চিহ্ন নেই কেন?

পর পর তিনবার চোখের পাপড়ি ফেলল লোকটা। কিছু একটা ইঙ্গিত দিচ্ছে? আবার তিনবার পড়ল চোখের পাপড়ি। কি বোঝাতে চাইছে আব্বাস মির্জা? এখন হৈ-চৈ করে প্রকাশ করে দেবে সে সবকিছু? ব্যাপারটা চেপে যাওয়ার জন্যে ইঙ্গিত দিচ্ছে, নাকি অনুসরণ করতে বলছে ওকে। কি করা উচিত এখন?

এখন গোলমাল করলে দুটো খুনের সাথে জড়িয়ে গিয়ে মহা ঝামেলায় আটকে যেতে পারে ওরা। কাজেই গোপনে অনুসরণ করাই স্থির করল সে। আবছা ধারণা নিয়ে কোন কাজ করা উচিত হবে না। যখন পরিষ্কার বুঝতে পারবে কি করা উচিত, কেবল মাত্র তখনি কিছু একটা করার চেষ্টা করবে সে। যেন কিছুই দেখেনি, কিছুই বোঝেনি এমনি ভাব করে দাঁড়িয়ে রইল সে। মিসেস গুপ্তের ট্যাক্সি ছেড়ে দিতেই বিল চুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল সে হোটেল থেকে।

স্টেশনের পথে একটা গাঢ় রঙের সানগ্লাস আর ছোট্ট একটা অটোমেটিক ড্রিল কিনল সে ট্যাক্সি থামিয়ে। স্টেশনে পৌঁছে লোকজনের ভিড়ে মিশে অপেক্ষা করল মিসেস গুপ্তের জন্যে। বুঝতে পেরেছে সোফিয়া, মস্ত বিপদে পড়েছে এখন আব্বাস মির্জা, খুব সম্ভব আবার উ-সেনের লোকের হাতে তুলে দিতে নিয়ে চলেছে ওকে মিসেস গুপ্ত কোন ওষুধের সাহায্যে কাবু করে। কাজেই এখন প্রতিটা পদক্ষেপ সাবধানে ফেলতে হবে ওকে, নইলে মহা বিপদ হবে আব্বাস মির্জার।

এল ওরা। টিকেট কনফার্মেশন হয়ে যেতেই ট্রেনে তোলা হলো আব্বাস মির্জার ইনভ্যালিড চেয়ার। কুলি দু'জন এবার ল্যাগেজ নিয়ে যাচ্ছে। মিসেস গুপ্ত রয়ে গেছে ট্রেনের ভিতরেই।

কুলিদের পিছু পিছু ট্রেনে উঠল সোফিয়া। কোন্ কম্পার্টমেন্টে ঢুকল ওরা লক্ষ্য করল। একজন রেল কর্মচারী রিজার্ভড্ লেখা একটা প্লাস্টিক সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দিচ্ছে মিসেস গুপ্তের কম্পার্টমেন্টে। ঠিক পাশের কম্পার্টমেন্টে বসে পড়ল সোফিয়া। মাঝারী কম্পার্টমেন্ট। ছয় সাতজন যাত্রী, সবাই পুরুষ।

খানিকক্ষণ পরই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে হন্তদন্ত হয়ে গার্ডকে ডাকতে ডাকতে ছুটে গেল পিছন দিকে একজন ভদ্রলোক পাশের কামরা থেকে বেরিয়ে। ভিড়ের সাথে মিশে গেল সোফিয়া, দাঁড়িয়ে রইল রিজার্ভড্ কামরার দরজার সামনে উৎসুক দর্শকদের জটলায়।

গার্ড এসে দরজা খুলতেই প্রথম চোখ পড়ল সোফিয়ার মিসেস গুপ্তের উপর, তারপর আব্বাস মির্জার উপর। মেঝেতে পড়ে থাকা সিরিঞ্জটা দৃষ্টি আকর্ষণ করল ওর, ওপাশের সীটের উপর রাখা কেসটাও চোখ এড়াল না। বজ্রমুষ্ঠিতে ধরে আছে আব্বাস মির্জা, মিসেস গুপ্তের চোখে পানি, গার্ডকে দেখে আব্বাস মির্জার হতাশ ভঙ্গি, মিসেস গুপ্তের স্বস্তি—সবই দেখে ফেলল সে দরজাটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগেই।

আর কিছুই বুঝতে বাকি রইল না ওর। সব লোককে আব্বাস মির্জার ইয়টে তুলে দেশে পাঠিয়ে দেয়ায় নিজের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হলো ওর। মস্ত বোকামি হয়ে গেছে। আজকে জনা দশেক লোক থাকলে এখন আব্বাস মির্জাকে উদ্ধার করা দশ মিনিটের কাজ ছিল। এক্ষুণি হুড়মুড় করে ঢুকে তুলে নিয়ে গেলে কারও কিছু করবার সাধ্য ছিল না।

যাই হোক, এখন সেকথা ভেবে কোন লাভ নেই।

হয়তো শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে আব্বাস মির্জার নির্দেশে সবাইকে দেশে পাঠিয়ে দেয়াই উচিত হয়েছে। না বুঝে তো আর নির্দেশ দেয়নি লোকটা। এখন ওর কর্তব্য হচ্ছে যে করে হোক কৌশলে আব্বাস মির্জাকে উদ্ধার করা। কিন্তু কিভাবে?

বাথরুমে ঢুকল সোফিয়া ট্রেনটা চালু হতেই।

এক ইঞ্চির আট ভাগের তিন ভাগ ব্যাসের একটা আগর বিট লাগাল সে অটোমেটিক ড্রিলের মাথায়। ঠিক কোন্ অ্যাঙ্গেলে ড্রিল করলে পাশের কামরার বেশির ভাগ অংশ চোখে পড়বে আন্দাজ করে নিয়ে শুরু করল সে কাঠ খোঁড়া। খুব ধীরে ধীরে চাপ দিচ্ছে সে ড্রিলের হ্যান্ডেলে। এক সুতো, দুই সুতো করে ঢুকতে শুরু
করল আগর বিট বাথরুমের কাঠের ভিতর। ছোট্ট একটা ফুটো হয়ে গেল দুই মিনিটের মধ্যেই। ঠিক তিন ইঞ্চি দূরে আরেকটা ফুটো করল সে একই মাপের। ভিতরের দৃশ্য দেখার জন্যে অতটা তাড়া বোধ করল না সে। প্রথমেই কাঠের গুঁড়োগুলো ফেলে দিল সে কমোডের ফোকড় দিয়ে, সামান্যতম এক আধ কণাও যেন না থাকে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য দিল। কারও সন্দেহ যাতে না হয়, সেদিকে যত্ন নিতে হবে। চারদিকে চোখ বুলিয়ে যখন নিশ্চিন্ত হলো, তখন ছোট্ট ফুটো দুটোতে চোখ রাখল সোফিয়া।

ভিতরের দৃশ্য দেখে চক্ষুস্থির হয়ে গেল ওর।

মিনিট খানেক চেয়ে থেকে কান গরম হয়ে উঠল ওর। দ্রুত হাতে আব্বাস মির্জার কাপড় খুলছে নগ্ন মিসেস গুপ্ত। মহিলা নিঃসন্দেহে পারভার্টেড। চোখ সরিয়ে নিতে বাধ্য হলো সোফিয়া দু'মিনিট পর। কপাল ঘেমে গেছে ওর। হার্ট বিট বেড়ে গেছে। ঢিব ঢিব শব্দ শুনতে পাচ্ছে সে নিজেই। বার দুই শিউরে উঠল শরীরটা আপনা আপনি। আবার চোখ রাখল সে ফোকড়ে। মন্ত্রমুগ্ধের মত দেখল দুই মিনিট। শিরশির করছে শরীরটা। দুই কান, গাল গরম হয়ে উঠেছে, মনে হচ্ছে ভাপ বেরোচ্ছে নাক দিয়ে। ছিটকে সরে এল সোফিয়া। এপাশ ওপাশ মাথা নেড়ে দূর করে দেয়ার চেষ্টা করল কুৎসিত দৃশ্যটা মন

থেকে।

খেয়াল হলো, এতক্ষণ বাথরুমে থাকাটা ঠিক শোভন হচ্ছে না। চোখে মুখে পানি ছিটিয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে বসল সে সীটে। চোখের সামনে ভাসছে পাশের কম্পার্টমেন্টের দৃশ্যটা। ফেরিওয়ালার কাছ থেকে কাগজ কিনল একটা, কিন্তু মন বসাতে পারছে না কাগজে। ছটফট করছে সোফিয়া। বারো ঘন্টা সময় কাটাবে কি করে সে?

আধঘণ্টা পর আবার গিয়ে ঢুকল সে বাথরুমে। মড়ার মত পড়ে আছে আব্বাস মির্জা। বুক পর্যন্ত একটা শাড়ি দিয়ে ঢাকা। মিসেস গুপ্তের শরীরে কোন পরিচ্ছদ নেই। পায়ের উপর পা তুলে কাত হয়ে বসে আছে পাশের সীটে, হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। মেয়েলোকটার আশ্চর্য সুন্দর ফিগার দেখে হিংসে হলো সোফিয়ার। শরীরের কোথাও বাড়তি বা কমতি কিছু নেই, ঠিক যেখানে যেমনটি দরকার তাই দিয়েছে ওকে বিধাতা। আশ্চর্য রূপ মহিলার। লোভাতুর দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে আব্বাস মির্জার দিকে। বিশ্রাম নিচ্ছে।

বেরিয়ে এল সোফিয়া। কেমন একটু লজ্জা লজ্জা লাগছে ছয়জন পুরুষ সহযাত্রীর সামনে ইতোমধ্যেই দুইবার বাথরুমে ঢোকার জন্যে। সামান্য একটু মাথা ঝাঁকিয়ে দূর করে দিল সে লজ্জাটা—একশো বার বাথরুমে গেলেই বা কার কি?

পেগু জংশনে ট্রেন থামতেই নেমে গেল সোফিয়া।

স্টেশনের গায়ে লাগানো পোস্ট অফিস থেকে ফোন করল মান্দালয়ে ওর এক বান্ধবীর কাছে, স্টেশনে গাড়ি পাঠাবার জন্যে। ট্রেন ছাড়ার পূর্ব মুহূর্তে এসে উঠল আবার গাড়িতে গোটা দুয়েক ইংরেজী থ্রিলার হাতে নিয়ে। ঘণ্টা খানেক পর আবার ঢুকল সে বাথরুমে।

আবার সেই দৃশ্য। কিন্তু এবার দুই একটা টুকরো কথা ভেসে আসছে। ফুটোয় কান পাতল সোফিয়া।

'...ভালই করেছ। বেঁচেছি আমি। উ-সেনের কাছে নিজেকে আমার নিতান্ত নগণ্য একটা পণ্য সামগ্রী মনে হত। ওর তুলনায় আমি কিছুই না। ওর মৃত্যুতে খুশি হয়েছি আমি, এখন আমি মুক্ত। কিন্তু উন্নতির চরম শিখরে উঠে যখন সে দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করছে, তখন তোমার মত একজন অতি সাধারণ লোক, উ-সেনের তুলনায় কানা কড়ির যোগ্যতাও যার নেই, হঠাৎ এসে হাজির হয়ে এক সন্ধ্যার মধ্যে তাকে হত্যা করে বেরিয়ে আসতে পারল, এটা আমার ভয়ানক খারাপ লাগছে। নিজেকে আরও ছোট মনে হচ্ছে অযোগ্য লোকের অধীনে এতদিন কাজ করেছি বলে। মনে মনে কৃতজ্ঞ ছিলাম, ওর অতুলনীয় প্রতিভাকে শ্রদ্ধা করতাম আমি, কিন্তু এত ঘৃণাও বোধ হয় পৃথিবীতে আর কাউকে করতাম না আমি। মৃত মানুষের বিরুদ্ধে কিছু বলতে নেই, কিন্তু প্লাস্টিক সার্জারীর পর একটি বছর আমার শরীরটা নিয়ে যা খুশি তাই করেছে সে, ওর বিকৃত কামনার লোলুপতা দেখে নিয়েছি আমি সেই একটি বছর। কি পাশবিক অত্যাচার সহ্য করেছি আমি বারোটা মাস তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। আকর্ষণ কমে যেতেই ডাস্টবিনে ছুঁড়ে

ফেলে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি সে, আমাকে ব্যবহার করেছে আজ এর পিছনে কাল ওর পিছনে কুৎসিত এক গণিকার ভূমিকায়। এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে সরোজের ঘাটে এসে ভিড়ল আমার তরী। বেঁচে থাকার অন্য অর্থ শিখলাম আমি ওরই কাছে।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। আবার ফুটোতে চোখ রাখতে যাচ্ছিল সোফিয়া, এমনি সময়ে ভেসে এল মিসেস গুপ্তের কণ্ঠস্বর। 'আমি জানি, তোমাকে পাকিস্তানীদের হাতে তুলে না দিয়েও আমার প্রাণ রক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল। ইচ্ছে করলে তোমার মাধ্যমেই তোমাদের সরকারের সাহায্য নিয়ে প্রাণ বাঁচাতে পারতাম। কিন্তু এই পথটাই বেছে নিলাম দুটো কারণে। প্রথমত: আমি ল্যান্ড অভ প্যারাডাইসে যেতে চাই। সোনার দেশ আমেরিকা, আমার স্বপ্নের দেশ। তোমার সাহায্যে সেখানে যেতে পারতাম না আমি। আর দ্বিতীয়ত: কথাটা শুনতে অদ্ভুত লাগবে, কিন্তু এটাই আসল সত্য, উ-সেনের প্রেমে পড়েছিলাম আমি। উ-সেনই আমার জীবনের প্রথম পুরুষ। ওর সমস্ত অত্যাচার হাসি মুখে সহ্য করতে পারতাম আমি যদি না আমাকে দূর করে দিয়ে স্যুই থিকে নিয়ে ও ঢলাঢলি করত।
যদি না আমাকে সামান্য এক পণ্য হিসেবে গণ্য করত। একথা জানত উ-সেন, আমার অকৃত্রিম ভালবাসা মনে মনে উপভোগও করত, সেজন্যেই বিশ্বাস ভঙ্গ করবার পরও ডক্টর হুয়াং আর স্যুই থির অনুরোধ ঠেলে কাজে বহাল রেখেছিল আমাকে। তুমি উ-সেনের হত্যাকারী—তোমার সর্বনাশ না করা পর্যন্ত শান্তি হবে না আমার।'

বেরিয়ে এল সোফিয়া। চোখাচোখি করল দুজন অল্প বয়সী যাত্রী। থ্রিলারে মন দিল সোফিয়া ওদের উপেক্ষা করে। ধীরে ধীরে কথা বার্তা শুরু করেছে যাত্রীরা নিজেদের মধ্যে। কে কোথায় কি করে ইত্যাদি দিয়ে শুরু হলো প্রাথমিক আলাপ। বই পড়ায় ব্যস্ততার ভান করে সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেল সোফিয়া সবাইকে। যুবকদের একজন বাথরুম হয়ে এল। ফুটো দুটো লক্ষ্য করল কিনা কে জানে। বইয়ের মধ্যে ডুবে গেল সোফিয়া। একটা কিছু প্ল্যান তৈরি করবার চেষ্টা করছে সে মনে মনে।

সাড়ে বারোটা নাগাদ চতুর্থ বারের মত সোফিয়া ঢুকল বাথরুমে। উপেক্ষা করল যুবক দুজনের মুচকি হাসি। লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু এছাড়া আর উপায় কি? এখনও জানতে পারেনি সে যা জানতে চায়।

এতক্ষণে কপাল ফিরল সোফিয়ার! কসমেটিক কেসটা নামাচ্ছে মিসেস গুপ্ত। ছোট অ্যালুমিনিয়ামের বাক্সটা বের করছে ওর ভিতর থেকে, সেই সাথে কথা বলছে। কান পাতল সোফিয়া।

'...আছে। লাইটিক ককটেলের প্রভাব দূর হয়ে যাবে দুই মিনিটের মধ্যেই। যদি দেখি ওদের সাথে নেগোসিয়েশন ঠিক পথে যাচ্ছে না, তখন প্রয়োজন মনে করলে কোন এক সুযোগে এই ওষুধটা ইঞ্জেক্ট করব আমি তোমার শরীরে। ওদের সাথে কোন কারণে পড়তা না পড়লে তোমার সাহায্য দরকার হতে পারে আমার নিরাপদে বেরিয়ে আসার জন্যে। বুঝতে পেরেছ?'

কথা বলতে বলতে একটা শিশি থেকে ওষুধ নিল মিসেস গুপ্ত সিরিঞ্জে, এগিয়ে গেল আব্বাস মির্জার দিকে। 'আরও খানিক পরে দিলেও চলত, কিন্তু একবার যা দেখিয়েছ, তারপর আর কোন রকম রিস্ক নেয়া ঠিক হবে না।' উপুড় করল সে আব্বাস মির্জার নগ্ন শরীরটা। সে নিজেও নগ্ন। পিঠে, শিরদাঁড়ার কাছাকাছি ঢুকিয়ে দিল সূচটা। সিরিঞ্জটা যথাস্থানে তুলে রাখল। বলল, 'এবার এসো, আরেক রাউন্ড হয়ে যাক, তারপর দুপুরের খাওয়াটা খেয়ে আসব রেস্টুরেন্ট-কার থেকে।' এগিয়ে গেল সে আব্বাস মির্জার দিকে।

চোখ সরিয়ে নিল সোফিয়া। বাথরুম থেকে বেরিয়েই বয়স্ক টাক পড়া এক ভদ্রলোকের কথা কানে গেল ওর। ভদ্রলোক বেশ জমিয়ে ফেলেছেন সহযাত্রীদের সাথে, ছোকরা দুটোও অবাক হয়ে গেছে তাঁর পাণ্ডিত্যের বহর দেখে, হাঁ করে গিলছে কথাগুলো।

'...গ্লুকোজ। শরীরটা আর গ্লুকোজ অ্যাবযর্ব করতে পারে না বলে রক্তের মধ্যে জমা হতে থাকে শুগার, এজন্যে ফুসফুস আর হৃৎপিণ্ড ঠিক মত কাজ করতে পারে না, ফলে মৃত্যু হয় রোগীর সঠিক চিকিৎসা না হলে। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রমাণ হলো, প্যানক্রিয়াসের সাথে এই রোগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। প্যানক্রিয়াস হচ্ছে পাকস্থলীর পিছনে, অ্যাবডোমেনের ঠিক এই জায়গাটায় অবস্থিত একটা বড় সড় গ্ল্যান্ড। ইতর প্রাণীর উপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেল এই গ্ল্যান্ডটা কেটে বাদ দিয়ে দিলেই এই রোগের আক্রমণ হয় প্রায় তৎক্ষণাৎ। আরও পরে জানা গেল প্যানক্রিয়াসের কয়েক গুচ্ছ সেল থেকে এক জাতীয় হরমোন তৈরি ও সিক্রিশন হয়ে রক্তের সাথে মেশে, এবং এই হরমোনই গ্লুকোজ অ্যাবযর্বশনে সাহায্য করে। এর নাম দেয়া হলো ইনসুলিন হরমোন।'

এতক্ষণে আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করতে পেরে দুই কান লাল হয়ে উঠল সোফিয়ার। মাথাটা নিচু হতে হতে বইয়ের সাথে নাক ঠেকবার উপক্রম হলো ওর। কিন্তু বিদ্বান্ লোকটির সেদিকে খেয়াল নেই। অনর্গল কথা বলে যাচ্ছেন তিনি:

'১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ডক্টর ব্যান্টিং ও প্রফেসর ম্যাকলিওড ইতর প্রাণীর প্যানক্রিয়াস থেকে ইনসুলিন বের করে নেয়ার কৌশল আবিষ্কার করলেন। নোবেল প্রাইজ পেলেন ওঁরা এই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের জন্যে। আজকের দিনে ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র আর ততটা ভয়ঙ্কর অসুখ নয়। প্রোটামাইম-যিংক ইনসুলিনের একটা ইঞ্জেকশনেই যে কেউ নিশ্চিন্ত থাকতে পারে চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে। কিন্তু তাই বলে ডোজ বাড়িয়ে দেবার উপায় নেই। ইনসুলিনের মাত্রা বেশি পড়ে গেলে আবার শুগার স্টার্ভেশন দেখা দেবে। ঘর-বাড়ি দুলবে চোখের সামনে, সর্বশরীর কাঁপতে শুরু করবে, চোখের তারা এক জায়গায় স্থির থাকবে না,—মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে এর ফলে। আসল কথা, রক্তের মধ্যে শর্করার পরিমিতি রক্ষা করতে হবে। তাহলেই স্বাভাবিক সুস্থ মানুষের মত চলাফেরা করতে পারবে যে কোন ডায়াবেটিস রুগী।' কেউ যাতে মনে না করে যে ওর বক্তব্য শেষ হয়ে গেছে, সেজন্যে শাসনের ভঙ্গিতে এক আঙুল

তুললেন বৃদ্ধ। আরও কথা আছে। কথা বলেই চললেন তিনি। 'পাগল চিকিৎসার ক্ষেত্রেও ইনসুলিন দারুণ কার্যকরী ওষুধ বলে প্রমাণিত হয়েছে। হরদম ব্যবহার হচ্ছে পাগলা গারদে। যার ডায়াবেটিস নেই, এমন পাগলের ভেইনে ইনসুলিন ইঞ্জেকশন দিলে তীব্র একটা শক পাবে ওর শরীর, জ্ঞান হারাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই, শুরু হয়ে গেল শুগার স্টার্ভেশন।—কিছুক্ষণ এভাবে রেখে তারপর গ্লুকোজ ইঞ্জেকশন দিলে দেখা যায় অনেক ধরনের পাগলামি সেরে যায়। এসব অবশ্য এক্সপার্ট ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া করতে গেলে মারা যেতে পারে রুগী। তবে...'

বক বক করে চললেন পণ্ডিত বৃদ্ধ। যেন কিছুই শুনতে বা বুঝতে পারছে না এমনি ভাবে বই পড়ে চলল সোফিয়া।

আধঘণ্টা পর আড় চোখে দেখতে পেল সে পাশের কামরা থেকে বেরিয়ে রেস্টুরেন্ট-কারের দিকে চলে গেল মিসেস গুপ্ত। এক মিনিট আন্দাজ সময় দিয়ে উঠে দাঁড়াল সোফিয়া। বেরিয়ে এল করিডরে। মিসেস গুপ্তের লাল শাড়িটা অদৃশ্য হয়ে গেল রেস্টুরেন্ট-কারের দরজা দিয়ে। চট করে ঢুকে পড়ল সোফিয়া রিজার্ভড্ কম্পার্টমেন্টের ভিতর।

চোখ মেলে শুয়ে আছে আব্বাস মির্জা। বুক পর্যন্ত চাদর দিয়ে ঢাকা। খোলা দুই চোখে স্পষ্ট বিস্ময় দেখতে পেল সে। দ্রুত কাজ সারতে হবে এখন।

প্রথমেই হ্যাঙ্গারে ঝোলানো কোটটা সরিয়ে দিল সোফিয়া। ঢাকা পড়ল দেয়ালের গায়ের ছোট্ট গর্ত দুটো। কসমেটিক কেসটা নামিয়ে ছোট বাক্সটা বের করে রাখল সে সীটের উপর। বাক্সের মধ্যে দুটো একই মাপের শিশি, আর একটা গোল বলের মত কাচের কি একটা জিনিস। একটা শিশির গায়ে লেবেল আছে, অপরটা লেবেলহীন। লেবেলের গায়ে শুধু একটা শব্দ লেখা—লাইটিক। অর্থাৎ, লেবেলহীন শিশির ভিতর রয়েছে লাইটিকের প্রভাব মুক্ত করার ওষুধ। এই ওষুধটা ইঞ্জেক্ট করলেই দুই মিনিটের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে আব্বাস মির্জা। দুই মিনিটের মধ্যে নিশ্চয়ই ফিরে আসবে না মিসেস গুপ্ত? তবু দরজাটা সামান্য ফাঁক করে একবার দেখে নিল সে করিডরটা।

বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে আব্বাস মির্জা। দ্রুত হাতে সিরিঞ্জের মধ্যে খানিকটা ওষুধ টেনে নিল সোফিয়া লেবেলহীন শিশি থেকে। ইঞ্জেকশন দিতে তেমন কোন অসুবিধে হলো না, সূচ ফোটানোর দাগ রয়েছে পিঠে, ঠিক সেই বরাবর ঢুকিয়ে দিয়ে টিপে দিল সোফিয়া। সিরিঞ্জটা বাক্সের ভিতর রেখেই মনে পড়ল ওর হ্যান্ডব্যাগে রাখা পিস্তলটার কথা। হুইল চেয়ারের গদির নিচে রেখে দিল সে আব্বাস মির্জার দেয়া স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন। চট করে দরজাটা খুলে চোখ রাখল বাইরে।

ভয়ানক ভাবে চমকে উঠল সোফিয়া। ফিরে আসছে মিসেস গুপ্ত। উদ্‌ভ্রান্তের মত এদিক ওদিক চাইল সে। বলল, 'ধরা পড়ে গেলাম বোধহয়। ফিরে আসছে মেয়েলোকটা। দরজা খুলেই দৌড় দেব আমি। পিস্তলটা রইল

ওই চেয়ারের গদির নিচে। যেমন ভাল বুঝবেন করবেন।'

হঠাৎ আশ্চর্য ভাবে সহায় হলো সোফিয়ার ভাগ্য। একটা কম্পার্টমেন্ট থেকে কে যেন ডাকল মিসেস গুপ্তকে। থেমে দাঁড়িয়ে সেই কামরায় গিয়ে ঢুকল সে। সীটের উপর রয়েছে কসমেটিক কেসটা, কোটটা আগের জায়গায় রাখা হলো না, সময় নেই। এক্ষুণি এসে পড়বে মহিলা। করিডরে বেরিয়ে এল সোফিয়া। ধীর পায়ে চলে গেল রেস্টুরেন্ট-কারের দিকে।

চার

ঝড়ের মত ঢুকে ঝটপট কাজ সেরে ঝড়ের মতই বেরিয়ে গেল সোফিয়া।

রানা বুঝল, নানকিং হোটেলে ওকে ঠিকই চিনতে পেরেছিল মেয়েটা, ফলে পিছু নিয়েছে; কোন কৌশলে জানতে পেরেছে লাইটিক ককটেলের কথা, ফ্যান সু গুপ্ত কামরা ছেড়ে বেরোতেই ছুটে এসেছে রানাকে উদ্ধার করতে। এখন দুটো মিনিট সময় দরকার। দুই মিনিট সময় পেলেই অবস্থা আয়ত্তে এসে যাবে ওর। আসছে মিসেস গুপ্ত—কামরায় ঢুকেই কি সে টের পেয়ে যাবে যে লাইটিকের প্রভাব কেটে যাচ্ছে রানার শরীর থেকে?

খুলে গেল দরজা। কামরায় ঢুকেই থমকে দাঁড়াল মিসেস গুপ্ত। ভুরু জোড়া কুঁচকে গেছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রানাকে পরীক্ষা করল সে, চোখ জোড়া সরে গেল ওপাশের সীটের উপর নামিয়ে রাখা ডালা খোলা কসমেটিক কেসটার উপর। পাশেই পড়ে আছে ছোট বাক্সটা। সারাটা কামরা ঘুরে এসে আবার স্থির হলো দৃষ্টিটা রানার চোখের উপর।

দরজা লাগিয়ে দিয়ে ছুটে গেল সে কসমেটিক কেসটার কাছে। ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছে সে। ছোট বাক্সটা খুলে প্রথমেই সিরিঞ্জটা শুঁকে দেখল সে। লেবেল লাগানো শিশিটা হাতে তুলে নিয়ে পরীক্ষা করল, মুখটা খুলে গন্ধ শুঁকল, তারপর বাক্সে ভরে রেখে দিল কসমেটিক কেসের ভিতর। এবার রানার একটা চোখের পাতা দুই আঙুলে যতদূর সম্ভব ফাঁক করে পরীক্ষা করল সে। তারপর হাসল।

মনে মনে হিসেব করে দেখল রানা দুই মিনিট পার হয়ে গেছে। ওষুধের প্রভাবটা কেটে যাওয়ার সাথে সাথেই প্রথমে কি করবে, তারপর কি করবে সব ঠিক করা আছে ওর; কিন্তু চেষ্টা করেও এক ইঞ্চিও নড়াতে পারল না সে হাত বা পা। মিথ্যে কথা বলেছিল নাকি মেয়েলোকটা?

'বোঝা যাচ্ছে, এই ট্রেনে তোমার অন্তত একজন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বন্ধু রয়েছে। বন্ধু না বলে বান্ধবী বলাই বোধহয় ভাষার দিক থেকে বেশি শুদ্ধ। দারুণ এক্সপার্ট মেয়ে বোঝা যাচ্ছে। তবে গার্ডের ডাকে ওপাশের একটা কামরায় না ঢুকলে খুব সম্ভব হাতে নাতেই ধরতে পারতাম ওকে।'

কামরার চারপাশের দেয়ালে চোখ বুলাল মিসেস গুপ্ত। বলল, 'কিন্তু

কোনখান থেকে চোখ রাখছে ও আমাদের উপর? তোমার কোটটা দুই আঙটা সরানো হয়েছে কেবল, এছাড়া ঘরের আর কিছুই এদিক ওদিক করা হয়নি। কাজেই আমার বিশ্বাস, ওইখানেই কোন ফুটোয় কান পেতে শুনেছে ও আমার কথাবার্তা। দেখেছে সবকিছু।'

কোটটা সরিয়ে ফুটোয় চোখ রাখল মিসেস গুপ্ত, তারপর সরে এল।

'যা ভেবেছিলাম তাই। কিন্তু আর কোন সুযোগ পেতে হচ্ছে না। আর এক মিনিটের জন্যেও চোখের আড়াল করছি না আমি তোমাকে। প্রয়োজন হলে পুলিসের সাহায্য নেব। চিনেছি আমি ওকে নানকিং হোটেলেই।'

খাবার নিয়ে এল বেয়ারা।

খাবারের গন্ধে জিভে পানি এসে গেল রানার। ভয়ানক খিদে পেয়েছে। কিন্তু খাওয়ার উপায় নেই। গোগ্রাসে গিলল মিসেস গুপ্ত। বিল চুকিয়ে মোটা বকশিশ দিল বেয়ারাকে। তারপর দরজা বন্ধ করে এসে আরাম করে পাশের সীটে বসে সিগারেট ধরাল।

রাত আটটা।

অঝোর বৃষ্টি মাথায় নিয়ে পৌঁছল ট্রেন মান্দালয়ে।

সোফিয়াকে কোথাও দেখতে পেল না রানা। প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে থাকা স্যুই থিকে দেখতে পেল।

'ইনি আমার স্বামী, মিস্টার সরোজ গুপ্ত,' পরিচয় করিয়ে দিল ফ্যান সু গুপ্ত। 'আর এর কথা তো তোমাকে বহুবার বলেছি সরোজ, এ-ই সেই সুন্দরী স্যুই থি।'

কণ্ঠস্বরে আন্তরিকতা টেনে আনার চেষ্টা করল মিসেস গুপ্ত, কিন্তু রানা বুঝল, সাপে নেউলে সম্পর্ক ওদের দুজনের মধ্যে। বিষ নজরে দেখছে দুজন দুজনকে। এক বিন্দু হাসি নেই স্যুই থির মুখে। গম্ভীর ভাবে নিরাসক্ত কণ্ঠস্বরে বলল, 'গ্ল্যাড টু মিট ইউ।' কুলিদের ইঙ্গিত করল এগোবার জন্যে, নিজেও পা বাড়াল সামনের দিকে। ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল একবার মিসেস গুপ্তের মুখ, বলল, 'সবাই অপেক্ষা করছে তোমার বক্তব্য শোনার জন্যে। যতটা দাবি করছ ঠিক ততটা গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য না থাকলে এখান থেকে কেটে পড়াই তোমার পক্ষে মঙ্গল বলে মনে করি।'

'উপদেশের জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ, স্যুই।' তরল কণ্ঠে বলল মিসেস গুপ্ত। 'কিন্তু তোমার উপদেশ ছাড়াই বহুদূর চলে এসেছি আমরা। দোরগোড়া থেকে ফিরে যেতে আসিনি। কি হয়েছিল রেঙ্গুনে বলো তো?'

'তোমাকে কিছু বলবার হুকুম নেই। আমার কাজ তোমাদের স্টেশনে রিসিভ করে আস্তানা পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া।'

'পাকিস্তানী জেনারেলকে অনুরোধ করেছিলাম থাকবার জন্যে, তিনি আছেন তো? এটুকু জানাতে বারণ করেনি নিশ্চয়ই কেউ?'

'আছেন। জরুরী কাজ ফেলে অপেক্ষা করছেন তোমার বক্তব্য শোনার জন্যে।'

কুলিদের সাহায্যে গাড়িতে তোলা হলো রানাকে। সিক্সটি নাইন মডেলের

মার্সিডিস বেঞ্জ। গাড়ি ছেড়ে দিল স্যুই থি। প্রায় নির্জন রাস্তা। এক আধটা গাড়ি ছাড়া রাস্তায় লোকজন নেই। ঝম ঝম বৃষ্টি, আর সেই সাথে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমক। ওয়াইপার চলছে, কিন্তু তবু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না পথঘাট।

'উ-সেনের লাশ কি করেছ?' আবার প্রশ্ন করল মিসেস গুপ্ত।

'শোক মিছিলে শরিক হতে এসেছ বুঝি?'

'উ-সেন কেবল একা তোমার সর্দারই ছিল না, আমারও ছিল।'

'কেবল সর্দারই নয়, আরও কিছু। তাই না?' মুচকি হাসল স্যুই থি। 'তোমার আমার মধ্যে মিল আছে এই একটা ব্যাপারে।'

'কিন্তু তোমার মধ্যে তেমন শোকের ছায়া দেখতে পাচ্ছি না, স্যুই থি।'

'তোমার মধ্যেও না।' রানার দিকে চাইল সে। 'তোমার স্বামী খুবই চুপচাপ মানুষ দেখছি?'

'ওর শরীর খারাপ। ঘুমের ওষুধ খাওয়াতে হয়েছে।'

আর কিছুই বলল না স্যুই থি। চুপচাপ গাড়ি চালাচ্ছে, আর মাঝে মাঝে রিয়ার ভিউ মিররের দিকে চাইছে। হঠাৎ স্পীড বাড়িয়ে দিল সে। বলল, 'কাউকে পিছু লাগিয়েছ নাকি, ফ্যান সু?'

'না তো! কি ব্যাপার?' কথাটা বলেই হঠাৎ সচকিত হয়ে পিছন দিকে চাইল মিসেস গুপ্ত।

দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছে একটা গাড়ি। একেবারে কাছাকাছি এসে পড়েছে। বেপরোয়া ভাবে গাড়ি চালাচ্ছে পিছনের ড্রাইভার। পাশাপাশি এসে পড়ল গাড়িটা, এবার ওভারটেক করছে। লাল একটা ওপেল রেকর্ড। অস্পষ্ট আলোতেও পরিষ্কার চিনতে পারল মিসেস গুপ্ত। বিস্ফারিত চোখে দেখল ওই গাড়ির বেপরোয়া ড্রাইভার আর কেউ নয়—সেই অ্যাংলো মেয়েটা। সামান্য একটু সামনে এগিয়েই বাঁয়ে চাপতে শুরু করল লাল গাড়িটা।

'বাঁয়ে কাটো! স্যুই থি! অ্যাক্সিডেন্ট করবে ওই গাড়িটা! ও আমাদের থামাবার চেষ্টা করবে।'

পাকা ড্রাইভার স্যুই থি। আধ মিনিট আর এগোতে দিল না পাশের গাড়িটাকে। বরং বেশি চেপে এসেছিল বলে ঝট করে ডাইনে স্টিয়ারিং কেটে ছোট্ট একটা গুঁতো মারল ওপেলের পেট বরাবর। সরে গেল লাল গাড়িটা, কিন্তু স্পীড কমল না একটুও। যতদূর যায় ততদূর টিপে ধরেছে সোফিয়া অ্যাক্সিলারেটর। একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছে সে সামনে। পাগলের মত চালাচ্ছে গাড়ি।

হঠাৎ স্টিয়ারিং কাটল স্যুই থি। বিপজ্জনক একটা শার্প টার্ন নিয়ে ঢুকে গেল বাম পাশের অন্ধকার গলিতে। 'কেঁউ' করে আর্তনাদ করে উঠল একটা কুকুর, চাপা পড়ল চাকার তলায়। পিছন ফিরে দেখল মিসেস গুপ্ত, এ গাড়ির সাথে সাথে টার্ন নিয়েছিল লাল গাড়িটা। কিন্তু প্রস্তুত ছিল না বলে দেরি করে ফেলেছে এক সেকেন্ড। সামলাতে পারল না। প্রচণ্ড বেগে গিয়ে ধাক্কা খেল একটা দোকানের দেয়ালের সাথে।

'গাড়ি থামাও, স্যুই। ধরে আনি হারামজাদিকে।'

গাড়ি থামাবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না স্যুই থির মধ্যে। বলল, 'তুমি চেনো ওকে?'

'চিনি না, কিন্তু রেঙ্গুন থেকে অনুসরণ করে এসেছে ও আমাকে। ওকে ধরা দরকার।'

'ধরা যাবে। মান্দালয়ে লাল ওপেল রেকর্ড খুব বেশি নেই। কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট করবার চেষ্টা করছিল কেন ও?'

'কেন ও কি করছে ওর কাছ থেকেই জানা যেত,' বিরক্ত হয়ে জিভ দিয়ে পচ্চ্চা।' শব্দ করল মিসেস গুপ্ত। 'দলের লোক হয়েও আমাকে কেন এত সন্দেহ করছ বুঝতে পারছি না আমি, স্যুই।'

'সবই বুঝতে পারবে তুমি, ফ্যান সু। কিছুক্ষণের মধ্যেই সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে তোমার কাছে। এবং সম্ভবত আমাদের কাছেও।'

বার কয়েক মোড় ঘুরে আবার বড় রাস্তায় উঠে এল মার্সিডিস টু টোয়েন্টি। রাস্তাঘাট কিছুই চিনতে পারছে না রানা। বাঁকগুলো টের পাচ্ছে কেবল। ওর মনে হচ্ছে গোলক ধাঁধার রাস্তায় অনন্তকাল ধরে ওরা শুধু চলছে তো চলছেই। পথ আর ফুরাচ্ছে না। ওদিকে সোফিয়ার কি অবস্থা কে জানে।

মিনিট দশেক পর ঠিক রেঙ্গুনের ইয়ান লাও ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের মত দেখতে একটা প্রকাণ্ড দালানের সামনে এসে দাঁড়াল গাড়িটা। ঠিক একই আর্কিটেকচারাল ডিজাইন, তবে এটা এগারোতলা। আন্ডারগ্রাউন্ড কার পার্কে গাড়িটা থেমে দাঁড়াতেই দু'পাশ থেকে দু'জন লোক এগিয়ে এল। এক নজরেই বোঝা যায় দুজনই সশস্ত্র। কেবল সশস্ত্রই নয়, সতর্কও। ইনভ্যালিড চেয়ারে তুলে দেয়া হলো রানাকে। ওটা ঠেলার ব্যাপারে কেউ সাহায্য করল না মিসেস গুপ্তকে, পিছু পিছু এল লিফট পর্যন্ত, কিন্তু লিফটে উঠল না প্রহরী দুজন।

নাইনথ্ ফ্লোরে পৌঁছে লিফটের দরজা খুলে যেতেই আরও দুজন সশস্ত্র প্রহরীর দেখা পাওয়া গেল। পিছু পিছু এল ওরা ড্রইংরূম পর্যন্ত, দাঁড়িয়ে রইল দরজায়। ড্রইংরূমে বসে আছে ডক্টর হুয়াং, জেনারেল এহতেশাম এবং কর্নেল শেখ। উঠে দাঁড়াল সবাই।

পরিচয়ের পালা সারা হলো সংক্ষেপে।

কর্নেল শেখ বলল, 'আপনার স্বামীর শরীরটা ভাল নেই মনে হচ্ছে?'

'ও বলছে ঘুমের ওষুধ খাইয়েছে।' বলল স্যুই থি।

'রেঙ্গুনের গোলমালটার কথা জানেন নিশ্চয়ই?' কাজের কথায় এল কর্নেল শেখ।

'হ্যাঁ। সেজন্যেই আসতে হলো আমাদের।' বলল মিসেস গুপ্ত। 'আমি জানি, উ-সেনের মৃত্যুর ব্যাপারে আমার করবার আর কিছুই নেই। কিছুটা আমার দোষে ঘটেছে এই দুঃখজনক ঘটনাটা। দোষ না বলে ভুল বলাই ভাল। যাই হোক, এজন্যে ক্ষতিপূরণ দিতে পারি আমি, সেই কথাই জানাতে এসেছি আমরা।'

সবাই বসল। হুইল চেয়ারটায় ব্রেক কষে দিয়ে মিসেস গুপ্তও গিয়ে বসল একটা সোফায়।

'ক্ষতিপূরণ?' অবাক হলো ডক্টর হুয়াং। 'উ-সেনের মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ?'

'উ-সেনের মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ হয় না। আমার অফার আপনার জন্যে নয়, ডক্টর হুয়াং। জেনারেলের সাথে আমি একটা চুক্তিতে আসতে চাই। আপনার কাছে আমি আর কিছুই আশা করি না, আমি জানি আপনাদের কাছ থেকে মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই প্রাপ্য নেই আমার।'

'একথা কেন বলছ, ফ্যান সু?' যেন অন্তরে ব্যথা পেয়েছে, এমনি ভাবে বলল ডক্টর হুয়াং।

'আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে গতকাল রাতে ইয়েন ফ্যাঙ গিয়েছিল আমাদের হোটেল কামরায় আমাদের খুন করবার জন্যে। রেঙ্গুনে। এরপর আপনাদের কাছ থেকে আর কি আশা করতে পারি আমি বলুন?' রানার দিকে চাইল মিসেস গুপ্ত। 'সেই জন্যেই সরোজের আজ এই অবস্থা।'

'ফ্যাঙকে পাঠানো হয়েছিল আব্বাস মির্জা বলে সেই লোকটাকে ঠেকাবার জন্যে।' বলল ডক্টর হুয়াং।

'ব্যর্থ হয়েছে সে।'

'বলেন কি?' আঁতকে উঠল কর্নেল শেখ। 'ব্যর্থ হয়েছে? তাহলে কোথায় সে?'

সোজা জেনারেলের দিকে চাইল মিসেস গুপ্ত। 'আমার হাতে। বন্দী।'

'তোমার হাতে!' এক সাথে কথা বলে উঠল হুয়াং এবং স্যুই থি।

'অসম্ভব!' বলল কর্নেল শেখ।

'খুবই সম্ভব, কর্নেল।' বিজয়িনীর ভঙ্গিতে সবার দিকে চাইল মিসেস গুপ্ত। 'ও এখন আমার হাতে বন্দী। সম্পূর্ণ সুস্থ, সবল, জীবিত। একমাত্র আমি জানি কোথায় আছে ও। আপনারা ওর ব্যাপারে উৎসাহী হতে পারেন মনে করে এসেছি আমি আপনাদের কাছে। ইচ্ছে করলেই আমার সাথে একটা চুক্তিতে আসতে পারেন আপনারা।'

'মিছে কথা বলছে,' বলল স্যুই থি।

'আশ্চর্য! আপনি যা দাবি করছেন···নাহ্, অসম্ভব···' মাথা নাড়ল কর্নেল শেখ।

খল খল করে হেসে উঠল মিসেস গুপ্ত। কসমেটিক কেসটার গায়ে তবলা বাজাল, ওটা খুলে ওর ভিতর থেকে সিগারেট আর লাইটার বের করে ধরাল, লম্বা করে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল ছাতের দিকে। বলল, 'জল খাব এক গ্লাস।' উঠে গিয়ে রানাকে একটু আরাম করে বসবার ব্যবস্থা করে দিল টানা হ্যাঁচড়া করে এখানে ওখানে বালিশ গুঁজে দিয়ে। রানার হাতের তালুতে দুই আঙুল দিয়ে ঘষা দিল। লাফ দিয়ে উঠল দুটো আঙুল।

রানা নিজেও উপলব্ধি করতে পারছে, কিছুক্ষণ থেকেই বোধ ফিরে আসছে ওর হাতে। সবশেষের ইঞ্জেকশনটা তেমন কার্যকরী হয়নি। খুব সম্ভব ইচ্ছে করেই কম করে দিয়েছে মিসেস গুপ্ত ওষুধের ডোজ। এখন আর ঘর বাড়ি দুলছে না চোখের সামনে।

সামান্য একটু কুঁচকে গেল মিসেস গুপ্তের ভ্রূ জোড়া। ফিরে গিয়ে বসল সে

সোফায়। 'কই, কেউ জল খাওয়াবে না?'

'স্যুই, ওকে একগ্লাস জল দাও।' বলল হুয়াং। তারপর ফিরল মিসেস গুপ্তের দিকে। 'তুমি বলতে চাও, জেনারেলের সাথে গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে বলতে তুমি আব্বাস মির্জাকে গ্রেপ্তারের কথা বুঝিয়েছিলে? মানে, সত্যিই তুমি ওই ভয়ঙ্কর লোকটাকে বন্দী করেছ?'

'ঠিক তাই। উ-সেনকে খুন করে সোজা নানকিং হোটেলে আমাদের স্যুইটে এসে হাজির হয়েছিল আব্বাস মির্জা। ওখানে ইয়েন ফ্যাঙ অপেক্ষা করছিল ওর জন্যে।' স্যুই থির হাত থেকে পানির গ্লাস নিয়ে ঢক ঢক করে কয়েক ঢোকে শেষ করল মিসেস গুপ্ত শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত। 'ফ্যাঙকেও খুন করেছে লোকটা। সত্যিই বলেছেন, লোকটা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর।' গ্লাসটা ফিরিয়ে দিল স্যুই থির হাতে।

'আপনি সিনেমা থেকে ফিরেই বন্দী করে ফেললেন ভয়ঙ্কর লোকটাকে?' বলল কর্নেল শেখ। 'কেমন যেন অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে আমার কাছে।'

'কৌশলে ওর বিশ্বাস উৎপাদন করেছিলাম আমি। বাকিটুকু খুবই সহজ কাজ।'

'তোমার কথা যদি সত্য বলে ধরে নেয়া যায়, তাও ব্যাপারটা অপরিষ্কার থেকে যাচ্ছে,' বলল ডক্টর হুয়াং। 'তুমি নিশ্চয়ই ওর কাছেই শুনেছ যে মারা গেছে উ-সেন? ওকে তৎক্ষণাৎ হত্যা না করে মান্দালয় পর্যন্ত আমাদের পিছু পিছু এসেছ তুমি কি করতে?'

'নিজস্ব কোন পরিকল্পনা আছে ওর,' বলল স্যুই থি।

'নিশ্চয়ই।' জোরের সাথে বলল মিসেস গুপ্ত। 'খামোকা আসতে যাব কেন? আগেই বলেছি, জেনারেলের সাথে আমি একটা চুক্তিতে আসতে চাই।'

'টাকা?' প্রশ্ন করল স্যুই থি।

'হ্যাঁ। টাকা, পাসপোর্ট এবং নিরাপত্তা।' গম্ভীর মিসেস গুপ্ত।

'ভগবান! মাথা খারাপ হয়ে গেছে ওর!' বলল স্যুই থি বিস্মিত কণ্ঠে।

'না, মাথা আমার ঠিকই আছে। আমাদের দুজনকে নির্বিচারে হত্যার আদেশ দেয়ার পরেও যদি তোমাদের দলে থাকতে চাইতাম তাহলে বলতে পারতে আমার মাথার গোলমাল আছে। উ-সেনকে ঘৃণা করতাম আমি। ওর জন্যে কাজ করতাম কেবল কৃতজ্ঞতা বোধটা সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দিতে পারিনি বলে। কৃতজ্ঞ ছিলাম ওর কাছে, তাই ওর মত একজন জঘন্য চরিত্রের লোককে সহ্য করেছি গত কয়েকটা বছর। যাই হোক, ওকে সহ্য করেছি বলেই তোমাদের দুজনকেও সহ্য করবার কোন কারণ আমি দেখতে পাই না। তোমাদের অধীনে কাজ করবার মানসিকতা আমার নেই।' জেনারেলের দিকে ফিরল মিসেস গুপ্ত। 'ওদের সাথে কাজ করা সম্ভব নয় বলেই আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমি। আমাকে নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতা ওদের কারও মধ্যে আছে বলে মনে করি না আমি। আমি আব্বাস মির্জাকে বন্দী করেছি, ওকে আপনার হাতে তুলে দিতে পারি যদি আপনি আমার জন্যে একটা আমেরিকান পাসপোর্ট, প্লেনের টিকেট, কিছু টাকা এবং নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করতে

পারেন।'

'যদি না পারি?' প্রশ্ন করল জেনারেল এহতেশাম।

'তাহলে শুধু হাতেই ফিরে যেতে হবে আমাকে। অন্য অল্টার্নেটিভ ভেবে রেখেছি আমি।'

মুচকি হাসল ডক্টর হুয়াং। বলল, 'তা বেশ। কিন্তু একটা ব্যাপার লক্ষ্য করছি। তুমি শুধু তোমার নিজের নিরাপত্তার জন্যে বলছ। তোমার স্বামীর কি হবে? তাকে আর দরকার নেই?'

'না। উ-সেনের নির্দেশে ওকে বিয়ে করেছিলাম আমি। ওর সাথে কোন সম্পর্ক রাখার ইচ্ছে নেই আমার। সোনার দেশ আমেরিকায় নতুন ভাবে আবার শুরু করতে চাই আমার জীবন।'

এতক্ষণে আবার কথা বলল কর্নেল শেখ। বলল, 'ওই লোকটার বিনিময়ে আপনি যা চাইছেন তা দিতে আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে রাজি হয়ে যেতাম, কারণ তুলনামূলক ভাবে আপনার দাবি খুবই সামান্য, সম্ভবত ওর সত্যিকার পরিচয় আপনার জানা নেই বলেই; ওকে—হাতের মুঠোয় পাওয়ার জন্যে আরও অনেক কিছুই দিতে রাজি থাকতাম আমরা, কিন্তু…'

কর্নেলের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে স্যুই থি বলল, 'কিন্তু দুঃখের বিষয়, তোমার কথার সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ দূর হচ্ছে না কর্নেলের। আমরা যেমন জানি, ওঁরাও তেমনি জানেন, মিথ্যে বলছ তুমি। আসল উদ্দেশ্য তোমার অন্য কিছু।'

'মিথ্যে বলছি তা টের পেলে কি করে?' বাঁকা চোখে চাইল মিসেস গুপ্ত স্যুই থির দিকে।

'যাকে বন্দী করেছ বলছ, তার সত্যিকার পরিচয় জানলে এই মিথ্যার আশ্রয় নিতে না তুমি।'

'ওর নাম আব্বাস মির্জা নয়,' বলল কর্নেল শেখ। 'আপনাকে ঠিক অবিশ্বাস করতে চাই না, কিন্তু কিছু মনে করবেন না, আমার কাছে অবিশ্বাস্যই লাগছে ব্যাপারটা। ওর সত্যিকার নাম হচ্ছে মাসুদ রানা। সেকেন্ড ম্যান অভ বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স।'

'মাসুদ রানা!' বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে গেল মিসেস গুপ্তের দুই চোখ। নিজের অজান্তেই দৃষ্টিটা একবার ঘুরে এল রানার উপর থেকে। 'বলেন কি! মাসুদ রানা? অসম্ভব! সে কি করে হবে? ওর সম্পর্কে গল্প শুনেছি আমি সরোজের কাছে।' মাথা নাড়ল মিসেস গুপ্ত। 'আশ্চর্য!' ধরা পড়ার ভয়ে আর রানার দিকে চাইল না সে। 'অসম্ভব…'

'ঠিক বলেছেন। অসম্ভব।' গোঁফে তা দিল কর্নেল শেখ। 'মাসুদ রানার হাতে ইয়েন ফ্যাঙের মৃত্যুটা বিশ্বাসযোগ্য। আমি ডক্টর হুয়াংকে নিষেধ করেছিলাম ফ্যাঙকে একা পাঠাতে। রানার বিরুদ্ধে অন্তত চারজন ইয়েন ফ্যাঙকে পাঠানো দরকার ছিল। আমি ওর সাথে কাজ করেছি, ব্যক্তিগত ভাবে চিনি আমি ওকে। পাকিস্তানের সেরা স্পাই ছিল সে। আপনি যদি বলতেন, হঠাৎ অতর্কিতে গুলি করে বা বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছেন ওকে, কথাটা

বিশ্বাসযোগ্য হত। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, ওকে বন্দী করেছেন এই কথাটা নিশ্চিত প্রমাণ ছাড়া আমাদের পক্ষে বিশ্বাস করা এত কঠিন কেন?'

হঠাৎ হেসে উঠল মিসেস গুপ্ত হিস্টিরিয়া রুগীর মত। সবাই অবাক হয়ে চেয়ে রয়েছে ওর মুখের দিকে, কিন্তু কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই ওর। হেসেই চলেছে খল খল করে। আধ মিনিট পর কোন মতে বলল, 'অসম্ভব, হি হি হি। উ-সেনের হত্যাকারীকে বন্দী করেছি আমি তাতে কোন সন্দেহ নেই। সে যত বড় স্পাই হোক না কেন, আমার হাতে এখন বন্দী।'

সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। কাঁধ ঝাঁকাল ডক্টর হুয়াং। বোকা হয়ে গেছে সবাই।

'তাই যদি হয়...' শুরু করেছিল কর্নেল, কিন্তু ওর কথায় বাধা দিল স্যুই থি।

'বিশ্বাস করবেন না ওর কথা। মিথ্যে বলায় ওর জুড়ি নেই। উ-সেন বলেছেন আমাকে একথা।'

'বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করা আপনাদের ইচ্ছের উপর নির্ভর করে।' হাসি থামিয়ে বলল মিসেস গুপ্ত। স্যুই থির দিকে ফিরল সে। 'আমার সম্পর্কে উ-সেনের মতামত জেনে সুখী হলাম। সত্যিই আমি কখন মিথ্যে বলছি, কখন সত্যি বলছি বুঝবার ক্ষমতা ছিল ওর। কিন্তু আজ যদি উ-সেন বেঁচে থাকত তাহলে পরিষ্কার বুঝতে পারত যে সত্যি কথাই বলছি আমি। যাই হোক, আমার বক্তব্য শুনেছেন আপনারা।' কর্নেল শেখের দিকে ফিরল মিসেস গুপ্ত। 'পৃথিবী বিখ্যাত স্পাই মাসুদ রানার বিনিময়ে আমার সামান্য দাবি পূরণ করতে রাজি আছেন আপনারা?'

'আমার মনে হয় সত্যি কথাই বলছে ফ্যান সু।' মিসেস গুপ্তের পিছন থেকে ভেসে এল উ-সেনের গুরু গম্ভীর ভরাট কণ্ঠস্বর।

পাঁচ

চমকে উঠল মাসুদ রানা।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত আড়ষ্ট হয়ে গেল মিসেস গুপ্ত। কিন্তু সে শুধু তিন সেকেন্ডের জন্যে। তারপর ঝট করে ফিরল সে উ-সেনের দিকে।

রানার মনে হলো বারবার ইঞ্জেকশন দেয়ার ফলে মাথার মধ্যে কোন গোলমাল হয়ে গেছে ওর। স্পষ্ট অনুভব করতে পারছে সে, ওষুধের গুণ অত্যন্ত দ্রুত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—মাথা ঘোরাটা একেবারেই নেই, দুই হাত, কাঁধ, এমন কি পিঠে পর্যন্ত বোধশক্তি ফিরে এসেছে; ইচ্ছে করলেই পা নড়াতে পারে সে এখন। কিন্তু মাথাটায় কিছু হলো নাকি? মৃত উ-সেন আবার বেঁচে ওঠে কি করে? ব্যাপারটা কেবল অবিশ্বাস্যই নয়, ভীতিপ্রদও। শিরশির করে মেরুদণ্ড বেয়ে একটা শীতল স্রোত উঠে এল ঘাড়ের কাছে, শিউরে উঠল রানা।

উ-সেনের লাশ দেখেছে সে মেঝেতে শুয়ে আছে, অপলক প্রাণহীন দুই চোখ চেয়ে রয়েছে ছাতের দিকে, অভিব্যক্তিহীন। সেই লোকটাই এসে দাঁড়াল ঘরের মধ্যে। একটা ডিভান ঘুরে এগিয়ে এল রানার দিকে। তেমনি আড়ষ্ট হাঁটার ভঙ্গি। পিঠ, কাঁধ আড়ষ্ট, সোজা। যখন ঘুরছে, ঘাড় না ফিরিয়ে সারাটা শরীর ঘোরাচ্ছে। আরেকবার শিউরে উঠল রানার শরীর।

'মিস্টার সরোজ গুপ্ত, এতদিন আপনার নামই শুনেছি কেবল, আজ আপনার সাথে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়ে সত্যিই আনন্দ বোধ করছি।' কাছাকাছি এসে দাঁড়াল উ-সেন। ওর হাত ধরে হুইল চেয়ারের কাছে এসে দাঁড়াল স্যুই থি। রানার গাল, দাড়ি, গোঁফ, নাক, কপাল ছুঁয়ে দেখল উ-সেন। দম আটকে পড়ে রইল রানা। ওদিকে মিসেস গুপ্তের অবস্থাও তথৈবচ। ফ্যাকাসে মুখে চেয়ে রয়েছে সে এদিকে। কথা বলেই চলেছে উ-সেন। 'অবশ্য আপনি আমার অপরিচিত নন। আপনার কথা এতই শুনেছি ফ্যান সুর কাছে যে সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকলেও আপনার নিত্যনৈমিত্তিক অনেক অভ্যাস, এমন কি মুদ্রাদোষ পর্যন্ত জানা হয়ে গেছে আমার। আপনার প্রতি ফ্যান সুর অকৃত্রিম ভালবাসার কথা জেনে এক সময় রীতিমত ঈর্ষা বোধ করেছিলাম আমি, কিন্তু আজ আপনার জন্যে দুঃখই বোধ করছি। কি ভয়ঙ্কর নাগিনীর পাল্লায় আপনি পড়েছেন ভাবতেও গা শিউরে উঠছে।' সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল উ-সেন। 'হুয়াং, তোমার একখানা চুরুট ছাড়ো তো ভায়া।' সোফার দিকে এগোল উ-সেন। রানা লক্ষ করল, দরজায় দাঁড়ানো প্রহরী দুজন কখন যেন আলগোছে এসে দাঁড়িয়েছে হুইল চেয়ারের চার হাতের মধ্যে। 'তুমি কোনজন? ফ্যান সু?' বলল উ-সেন।

সিগারেটের চেয়েও সরু একটা সিগার বের করে দিল ডক্টর হুয়াং উ-সেনের হাতে, ঠোঁটে লাগাতেই আগুন ধরিয়ে দিল সেটায়। বলল, 'তিন নম্বর সোফায়।'

মিসেস গুপ্তের সামনে এসে দাঁড়াল উ-সেন। ছুঁয়ে দেখল মুখটা। বলল, 'বাহ, কি সুন্দর! কে বিশ্বাস করবে এই সৌন্দর্যের অন্তরালে লুকিয়ে আছে ভয়ঙ্কর এক উদ্যতফণা গোক্ষুর—পিছন ফিরলেই এক মুহূর্ত দ্বিধা করবে না যে ছোবল দিতে?'

'ও আমাকে বলেছিল মারা গেছ তুমি,' ফ্যাঁসফেঁসে কণ্ঠে বলল মিসেস গুপ্ত। 'মাসুদ রানা বলেছিল খুন করেছে তোমাকে।'

মিসেস গুপ্তের পাশের সোফায় বসে পড়ল উ-সেন। 'আর তুমি তা বিশ্বাস করেছিলে। বোকার মত।' হাসল উ-সেন। হুয়াং-এর দিকে ফিরে বলল, 'ডাক্তার, সরোজ গুপ্তকে সুস্থ মনে হচ্ছে না কেন?'

'ফ্যান সু বলছে ওকে ঘুমের ওষুধ খাইয়েছে।'

'ও। স্যুই থি, চুরুটটা নিভে গেছে—ধরিয়ে দাও তো, লক্ষ্মী।' কর্নেল শেখের দিকে ফিরল উ-সেন। 'দেখলেন? আমি বলেছিলাম না, রেঙ্গুন থেকে এতদূর আমাদের পিছু পিছু ধাওয়া করে আসার পিছনে ফ্যান সুর বিশেষ কোন মতলব আছে? প্রমাণ হলো?' হাসল সে। 'আসলে বেশ কিছুদিন যাবৎ

আমার মৃত্যু কামনা করে আসছে ও মনে মনে, তাই মাসুদ রানার কথায় খুব সহজেই বিশ্বাস করে বসেছে। তাই না, ফ্যান সু? ওকে নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করবার প্রয়োজনও বোধ করোনি, কিভাবে হত্যা করেছে আমাকে? মাথার খুলির ঠিক নিচে ঘাড়ের ওপর প্রচণ্ড জোরে আঘাত করেছিল সে আমাকে। যে কোন সাধারণ লোক ওই আঘাতে অক্কা পেতে এক সেকেন্ডের বেশি দেরি করবে না।'

'হায় হায়!' প্রায় ফিস ফিস করে বলল মিসেস গুপ্ত। নিজের অজান্তেই রানার দিকে চাইল সে। রক্তশূন্য ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ওর মুখটা। রানা বুঝল, সাবধান না হলে ধরা পড়ে যাবে সবার কাছে মিসেস গুপ্ত।

'এখন আর হায় হায় করে কি লাভ, ফ্যান সু? খুন করতে পাঠাবার সময় ওকে বলে দেয়া উচিত ছিল তোমার। ওই বেচারার দোষ নেই। দোষ তোমার। ও জানবে কি করে যে আমার ঘাড় আগে থেকেই মটকানো ছিল?' রানার দিকে ফিরল উ-সেন। 'এই আধ-পাগলা সার্জন মেরামত করেছিল আমাকে প্লেন ক্র্যাশের পর, মিস্টার সরোজ গুপ্ত। কিছু কিছু জিনিস সে ফিরিয়ে দিতে পারেনি আমাকে। যেমন দৃষ্টি শক্তি। কিন্তু বাদ বাকি সবই করেছে সে সাধ্য মত।' মাথার পিছন দিকটায় টোকা দিল সে দুটো। 'অডন্টয়েড প্রসেসকে প্রোটেকশন দেয়ার জন্যে এই চামড়ার নিচে আছে একটা স্টীল প্লেট। যদিও মাসুদ রানার প্রচণ্ড আঘাতটা চুল পরিমাণে এদিক ওদিক হয়নি, একেবারে ডেড সেন্টারে ঠিক জায়গা মত পড়েছে, বেচারার দুর্ভাগ্য, স্টীলের পাত ভেদ করবার ক্ষমতা দেয়নি ভগবান তাকে।' কয়েকটা টান দিল সে সরু চুরুটে। 'এখনও মাথাটা ধরে আছে, এছাড়া আর কোন ক্ষতি হয়নি আমার। আমার কপাল ভাল, আমার আর সব সহযোগীরা ফ্যান সুর মত যখন তখন রঙ বদলায় না, আমার প্রতি ভালবাসায় বা বিশ্বস্ততায় কোন খাদ নেই ওদের।'

'তুমি আমাকে ভুল বুঝছ, উ-সেন,' কসমেটিক কেস থেকে সিগারেট বের করে ধরাল মিসেস গুপ্ত। রানা লক্ষ করল হাতটা কাঁপছে ওর। 'তোমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি আমি। আমি জানতাম না মাসুদ রানা তোমাকে হত্যা করতে এসেছে রেঙ্গুনে। যখন আমার সামান্য ভুলে ঘটে গেল ঘটনাটা, এবং পরমুহূর্তে এসে হাজির হলো আমাদের মৃত্যুদূত, তখন এছাড়া আর কি করবার ছিল আমার, বলো?' উ-সেনকে চুপ করে থাকতে দেখে কর্নেল শেখের দিকে ফিরল মিসেস গুপ্ত। 'আমি বুঝতে পারছি, এদের সাথে আর কোন ভাবেই আপস হবে না আমার। এরা আমার দিকটা ভাবতে মোটেই প্রস্তুত নয়। কাজেই আবার একবার আমার প্রস্তাবটার কথা ভেবে দেখবার অনুরোধ করছি আপনাদের, কর্নেল। মাসুদ রানা এবং তার ছিনিয়ে নেয়া ফাইলটা এখন আমার হাতে, পেতে হলে আমার সাথে চুক্তি করতে হবে।'

'ধরো যদি আমি বলি মাসুদ রানাকে কব্জায় পাওয়ার জন্যে জেনারেল যতটা উৎসুক, আমিও ঠিক ততটাই—তাহলে?' বলল উ-সেন। 'হাজার হোক আমার ঘাড়টাই ভাঙার চেষ্টা করেছিল সে, কর্নেল বা জেনারেলের নয়।

সেক্ষেত্রে তোমার বক্তব্য কি?'

'বক্তব্য একই। আমার দরকার মার্কিন পাসপোর্ট, প্লেনের টিকেট, কিছু টাকা এবং নিরাপত্তা।'

'সরোজ গুপ্তের প্রতি প্রেম?'

'প্রেম মিছে মায়া।'

'বা বা বা! কেমন বোধ করছেন, মিস্টার সরোজ গুপ্ত? একেই ভালবেসেছিলেন, বিশ্বাস করেছিলেন আপনি। কেমন লাগছে এখন?' কর্নেল শেখকে উসখুস করতে দেখে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে একটা হাত তুলল উ-সেন। 'আমি জানি, মাসুদ রানাকে হাতে পাওয়ার ব্যাপারে আপনি কি পরিমাণ উদ্‌গ্রীব। আপনার অনুভূতি আমি স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারছি, কর্নেল শেখ। আপনি চাইছেন, যদি সত্যিই ওর হাতে মাসুদ রানা বন্দী হয়ে থাকে তাহলে গোলমাল না করে ও যা চাইছে দিয়ে তাকে হস্তগত করা দরকার। কিন্তু আমার কিছু কথা আছে। আমি বিশ্বাস করি, কোন না কোন কৌশলে আটকে ফেলেছে ও মাসুদ রানাকে। কিন্তু তাই বলে ওর অন্যান্য কথা বিশ্বাস করবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আমি দেখতে পাই না। অন্য কোন মতলব আছে ওর। আরও কোন ক্ষতি করবার প্ল্যান এঁটেছে ওরা। মাসুদ রানাকে আপনাদের হাতে তুলে দেয়ার আর কোন কারণই দেখতে পাই না আমি একটি ছাড়া—সেটি হচ্ছে, উ-সেনকে হত্যা করে তৃপ্তি হয়নি ওদের, ওরা আপনাকে এবং জেনারেল এহতেশামকেও হত্যা করতে চায়।'

'যদি তাই হয়,' বলল কর্নেল শেখ, 'তাহলে ওকে বন্দী করা আমাদের জন্যে আরও জরুরী প্রয়োজন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যে করে হোক ওকে আনতে হবে আমাদের হাতের মুঠোয়। তার জন্যে প্রয়োজন হলে মিসেস গুপ্তকে...'

'কিছুই দিতে হবে না।' মুচকি হাসল উ-সেন। 'মাসুদ রানা এখন আমাদের হাতের মুঠোতেই আছে। আপনার তিন হাতের মধ্যে বসে আছে সে, কর্নেল শেখ।' আঁতকে উঠে এদিক ওদিক চাইল কর্নেল শেখ। রানার দিকে না চেয়েই গম্ভীর কণ্ঠে বলল উ-সেন, 'আপনার শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে আমার পরিষ্কার কোন ধারণা নেই, মিস্টার মাসুদ রানা, সত্যিই ঘুমের ওষুধ দেয়া হয়েছে কিনা পরীক্ষা করবে ডাক্তার এক্ষুণি। ইতিমধ্যে যদি একচুল নড়াচড়া করেন তাহলে খুলি ফুটো হয়ে যাবে আপনার। দুটো স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন ম্যাগনাম তাক করে ধরা আছে আপনার মাথার দিকে।'

তড়াক করে উঠে দাঁড়াল কর্নেল শেখ। 'বলেন কি?' আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে সে রানার দিকে। এপাশ ওপাশ চাইল সে রানা যদি হঠাৎ আক্রমণ করে বসে তাহলে কিভাবে আত্মরক্ষা করবে বুঝে নেয়ার জন্যে। কর্নেলের ভয় সঞ্চারিত হয়েছে জেনারেলের মধ্যেও। উঠে দাঁড়িয়েছে সেও।

দ্রুত পায়ে এগিয়ে এল স্যুই থি। হ্যাঁচকা টান দিল রানার দাড়ি ধরে। চড়চড় করে ছিঁড়ে উঠে গেল কয়েকগুচ্ছ দাড়ি, জ্বালা করে উঠল রানার গাল।

ঠাশ ঠাশ দুটো চড় কষাল সে রানার গালে। দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ করল, 'শুয়োরের বাচ্চা!'

উ-সেনের প্রতি মাত্রাধিক আসক্তির পরিচয় পেয়েছে রানা তার প্রতিটা সহযোগীর ব্যবহারে। চুম্বকের মত আশ্চর্য এক আকর্ষণ আছে লোকটার মধ্যে। রানা লক্ষ্য করেছে, সে নিজেও বেশ খানিকটা দুর্বলতা বোধ করেছে এই আশ্চর্য লোকটার জন্যে। অন্ধ লোকটাকে হত্যা করে খুশি হতে পারেনি সে। যদিও সে জানে উ-সেনের প্রতি দুর্বলতা একটা অন্ধ বাঘের খাঁচায় ঢুকে তার জন্যে মমতা বোধ করবারই সমতুল্য—তবু লোকটার বিরুদ্ধে ক্রোধ বা ঘৃণার উদ্রেক করতে পারেনি সে নিজের মধ্যে। এখন মিসেস গুপ্তের কোন কথাই বিশ্বাসযোগ্য হবে না উ-সেনের কাছে, কিন্তু রানা জানে উ-সেন জীবিত আছে জানলে কিছুতেই দলের বিরুদ্ধে যেত না মিসেস গুপ্ত। এই আকর্ষণের উৎসটা কোথায় জানবার বড় ইচ্ছে হলো ওর। কেন এমন মন প্রাণ দিয়ে ভালবাসে ওকে ওর লোকজন?

'মিস্টার মাসুদ রানা জানেন একটু নড়াচড়া করলেই মারা পড়বেন উনি,' বলল উ-সেন। 'কিন্তু তবু একটু যেন বেশি স্থির মনে হচ্ছে ওঁকে। ফ্যান সু, ওঁকে জানিয়ে দাও, তোমাদের খেলা শেষ হয়েছে।'

'ভুল বুঝেছ, উ-সেন। মাসুদ রানা নড়াচড়া করছে না সত্যি সত্যিই নড়বার ক্ষমতা নেই বলে। লাইটিক ককটেল দিয়েছি আমি ওকে। নানান কথায় ওর বিশ্বাস উৎপাদন করেছিলাম, তাই কাবু করতে অসুবিধা হয়নি।'

'ওকে বিশ্বাস করা কত বিপজ্জনক, দেখলেন তো, মিস্টার মাসুদ রানা? যাই হোক, ডাক্তার, দেখো দেখি একটু পরীক্ষা করে, ফ্যান সুর এই কথাটায় বিশ্বাস করা যায় কিনা?'

এগিয়ে এসে রানার একটা চোখ ফাঁক করল হুয়াং দুই আঙুলে, সামান্য ঝুঁকে পরীক্ষা করল।

'যায়। কিন্তু লাইটিকের প্রভাব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে দ্রুত।'

মাথা ঝাঁকাল উ-সেন আপন মনে। 'ব্যাপারটা বেশ ঘোরাল হয়ে উঠছে। কি বলেন, জেনারেল?'

'পিস্তল যখন আছে, ওকে গুলি করলেই তো সবকিছু সহজ হয়ে যায়?' বলল জেনারেল। 'ঘুমন্ত অবস্থাতেও ভয়ঙ্কর এই লোক। এর সম্পর্কে সব শুনেছি আমি শেখের কাছে। আমার মনে হয়, এক্ষুণি গুলি করা উচিত।'

হাঃ হাঃ করে হাসল উ-সেন। 'আপনি দেখছি ভয়ে একেবারে কুঁকড়ে গেছেন। কেন বাঙালীদের হাতে আপনারা তুলোধুনো হয়েছেন বোঝা যাচ্ছে কিছুটা। আপনার মুখে এই কথা আশা করিনি আমি, জেনারেল। যাই হোক, ফ্যান সু, আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই জানতে পারব তোমার এখানে আসার আসল উদ্দেশ্য; তার আগে সত্যি করে বলো দেখি ঠিক কয়টার সময় শেষ ইঞ্জেকশনটা দিয়েছ?'

'ঘণ্টা দুয়েক আগে হাফ ডোজ দিয়েছি। এদের সাথে কথা-বার্তায় পড়তা না পড়লে এখান থেকে বেরোতে ওর সাহায্য দরকার পড়তে পারে মনে

করেছিলাম।' একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মিসেস গুপ্ত। 'তোমার জন্যে আমি দুঃখিত, মাসুদ রানা। তোমার সত্যিকার পরিচয় জানলে হয়তো এখানে এভাবে নিয়ে আসতাম না তোমাকে। এখন বুঝতে পারছি, তোমাকে বুদ্ধি দিয়ে পরাজিত করতে পারিনি আমি আসলে; তোমার মহত্ত্বের সুযোগ নিয়েছি মাত্র।' কোলের উপর রাখা কসমেটিক্ কেসের ভিতর লাইটারটা রেখে দিয়ে ছোট বাক্সটা বের করে আনল সে নিতান্ত অবলীলাক্রমে। উ-সেনের দিকে ফিরে বলল, 'আবার একবার নতি স্বীকার করছি আমি তোমার বুদ্ধির কাছে, উ-সেন। আমি বুঝতে পারছি, আমার প্ল্যান ভেস্তে গেছে, মাসুদ রানা এখন তোমাদের হাতের মুঠোয়, ফাইলটাও কোথায় আছে জেনে যাবে তোমরা ওর ওপর নির্যাতন চালালেই। তোমাদের কাছে আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। কাজেই এখন বিদায় নিতে চাই আমি। অনুমতি দিলেই উঠতে পারি।'

'কী চমৎকার মহিলা, তাই না, কর্নেল?' সব কটা দাঁত বেরিয়ে গেল উ-সেনের। 'এর অস্বাভাবিক বুদ্ধির কথা বলেছি আপনাকে, অতুলনীয় সৌন্দর্য তো দেখতেই পাচ্ছেন চোখের সামনে; সেই সাথে অপূর্ব রস বোধের পরিচয়ও পাওয়া যাচ্ছে, তাই না?'

'রসিকতা আমি করছি না, উ-সেন।' গম্ভীর মিসেস গুপ্তের চোখ মুখ। 'স্যুই থি, উ-সেনকে বলো আমার হাতে কি দেখতে পাচ্ছ। কেউ আমার দিকে এক পা এগোলেই ফেলে দেব আমি এটা মাটিতে।'

হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে গেল উ-সেন। প্রায় ফিস ফিস করে বলল, 'কি আছে ওর হাতে? ওর কসমেটিক কেসটা কেড়ে নেয়া হয়নি?'

ভীত চকিত দৃষ্টিতে এদিক ওদিক চাইল স্যুই থি। বলল, 'না। ওর হাতে একটা পাতলা কাচের বল দেখা যাচ্ছে, আর কিছুই নেই।'

'এই ছোট্ট বলের ভিতর এই ঘরের প্রত্যেককে খুন করার পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে ক্লোরিন গ্যাস আছে,' বলল মিসেস গুপ্ত দৃপ্ত ভঙ্গিতে। 'তুমিই দিয়েছিলে এটা আমাকে, উ-সেন।' উঠে দাঁড়াল সে। 'কেউ যদি বাধা দেয়ার চেষ্টা করে, এই ঘরের কেউ যদি একটু নড়াচড়াও করে, হাত থেকে ফেলে দেব আমি বলটা। এর ফলে আমিও মারা যাব ঠিকই, তোমরাও কেউ বাঁচবে না।'

চোখের পাতা পর্যন্ত সাবধানে ফেলছে এখন ঘরের প্রতিটা লোক।

ধীর পায়ে দরজার দিকে এগোল মিসেস গুপ্ত।

ছয়

'শোনো, ফ্যান সু।' পিছু ডাকল উ-সেন।

তিন পা এগিয়েই থেমে দাঁড়াল মিসেস গুপ্ত। ঘুরল।

'এত তাড়াহুড়ো করছ কেন? যেতে চাও যাও, আমি জানি এখন বাধা দিতে গেলে সত্যিই তুমি ফাটিয়ে দেবে ওটা, আমাদের হাতে ধরা পড়ার চেয়ে আত্মহত্যা করাটা তুমি শ্রেয় বিবেচনা করবে, এটাই স্বাভাবিক; এবং এ-ও ঠিক, মরতে আমরা কেউই চাই না; কাজেই আমি তোমার যাত্রাটা আরও নির্বিঘ্ন করে দিতে চাই।' হাসল উ-সেন। 'ডিনারের সময় হয়েছে, এই সময় তোমাকে শুধু মুখে চলে যেতে দিতে আমার খারাপই লাগছে, কিন্তু...'

'বাজে কথা বলে দেরি করাবার চেষ্টা করে কি লাভ হবে তোমার, উ-সেন?' কঠোর কণ্ঠে প্রশ্ন করল মিসেস গুপ্ত।

'লাভটা আমার নয়, লাভ তোমার। আমি চাই না তুমি আত্মহত্যা করো। সেজন্যে গাড়ির চাবিটা দিয়ে দিতে চাই তোমাকে।' স্যুই থির দিকে ফিরল উ-সেন। 'স্যুই, গাড়ির চাবি দিয়ে দাও ওকে।'

ব্যাগ থেকে চাবি বের করতে করতে স্যুই থি বলল, 'দিচ্ছি।' তিনটে চাবি সমেত একটা রিং বাড়িয়ে ধরল সে মিসেস গুপ্তের দিকে।

চতুর একটুকরো হাসি দেখা দিল মিসেস গুপ্তের ঠোঁটে। 'আমি কচি খুকি নই, উ-সেন। তোমার গাড়ির দরকার নেই আমার। ধন্যবাদ। ট্যাক্সি ডেকে চলে যাব আমি।'

'এই বৃষ্টির মধ্যে ট্যাক্সি পাওয়া মুশকিল হবে। কিন্তু সেটা আসল নয়। তোমাকে এভাবে বেরিয়ে যেতে দেখলে বাধা দেবে কার পার্কের দুজন প্রহরী। শুধু শুধু মারা পড়বে বেচারারা, সেই সাথে মারা পড়বে তুমিও। যদি ভাগ্য গুণে বেঁচে যাও, দালানের বাইরে ধরা পড়বে চারজন প্রহরীর হাতে। তার চাইতে আমি ওদের ফোন করে জানিয়ে দিচ্ছি, তুমি আমার গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাও, কেউ কিছু বলার সুযোগও পাবে না, প্রাণ নাশও হবে না কারও।' গলার স্বর পরিবর্তন করে বলল, 'গাড়িতে টাইম বম্ব বা ওই ধরনের কিছু ফিট করা আছে, এরকম অবাস্তব কিছু ভাবছ না তো আবার?' হাসল উ-সেন। 'বিদায়ের সময় বন্ধু হিসেবে ছাড়াছাড়ি হওয়াই ভাল, কি বলো?'

কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করল মিসেস গুপ্ত। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, ফোন করে দাও। চাবিটা নিয়ে যাচ্ছি আমি। তোমার গাড়িতে যাই, আর ট্যাক্সিই নিই, সিদ্ধান্ত নেব নিচে নেমে।'

'গুড। চাবির গোছাটা দিয়ে দাও, স্যুই।'

দুই পা এগিয়ে চাবিটা দিচ্ছে স্যুই থি। পাশের টেবিল থেকে টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিল উ-সেন। রানা লক্ষ করল রিসিভার তুলল বটে, কিন্তু উ-সেনের মুখটা ফিরানো আছে মিসেস গুপ্তের দিকে, সারা শরীর টান হয়ে আছে ওর প্রকাণ্ড একটা লাফ দেয়ার পূর্ব মুহূর্তে যেমন হয়, তেমনি।

চোখের নিমেষে ঘটে গেল কয়েকটা ঘটনা।

মিসেস গুপ্তের আঙুল স্পর্শ করার সাথে সাথে হঠাৎ শক্ত হয়ে গেল স্যুই থির হাতটা। হ্যাঁচকা টান দিল স্যুই থি। অস্ফুট একটুকরো অদ্ভুত আওয়াজ বেরোল মিসেস গুপ্তের মুখ থেকে। আঁতকে উঠেই মুহূর্তে পিছন দিকে বাঁকা হয়ে গেল মিসেস গুপ্তের শরীরটা। সেই সাথে হাত থেকে ছুটে কয়েক হাত

শূন্যে উঠে গেল কাচের বলটা। থমকে গেল সময়। রানার মনে হলো অনন্তকাল ধরে ঝুলছে ওটা শূন্যে। ককিয়ে উঠল কর্নেল শেখ, বিদঘুটে একটা আওয়াজ বেরোল ওর কণ্ঠ থেকে নিশ্চিত মৃত্যু টের পেয়ে। রিসিভার কানে লাগিয়ে কথা বলতে শুরু করেছিল উ-সেন—'হ্যালো, শোনো, ফ্যান সু যাচ্ছে নিচে…,' বলটা শূন্যে উঠতেই রিসিভারটা ফেলে দিয়ে বিদ্যুৎবেগে লাফ দিল। নিজের অজান্তেই বড় করে দম নিল রানা। সেকেন্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে চিন্তা করল, কতক্ষণ পর্যন্ত থাকবে বিষাক্ত গ্যাসের হত্যা করবার ক্ষমতা? প্রায় আড়াই মিনিট দম আটকে রাখতে পারবে সে, টেনে টুনে আরও আধ মিনিট হয়তো থাকতে পারা যাবে, তারপর? তিন মিনিটে কমে যাবে না এর কার্যকারিতা? তখনও কি মারা যাবে সে?

হুড়মুড় করে পড়ল উ-সেন মেঝেতে। হাঁটু গেড়ে বসে আছে সে। এক হাতে দেখতে পেল রানা কাচের বলটা। নির্ভুল ক্যাচ ধরেছে সে। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। লম্বা ঋজু শরীরটা আরও লম্বা দেখাচ্ছে। মুখে হাসি।

আশ্চর্য কৌশলে জ্যুজুৎসুর প্যাঁচ মেরে ঠেসে ধরেছে স্যুই থি মিসেস গুপ্তকে। উপুড় হয়ে পড়ে আছে মিসেস গুপ্ত, পিঠের উপর বসে বব ছাঁটা চুল টেনে শরীরটা বাঁকা করে ফেলেছে স্যুই থি। ব্যথায় কুঁচকে গেছে ওর মুখ, দাঁত বেরিয়ে এসেছে যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে।

রুমাল দিয়ে ঘাম মুছল জেনারেল এহতেশাম। আতঙ্ক কাটেনি এখনও চোখের দৃষ্টি থেকে। বলল, 'বড় বেশি ঝুঁকি নেন আপনি, মিস্টার উ-সেন।'

হা হা করে হেসে উঠল উ-সেন। বলল, 'ঝুঁকি আমি নিইনি, নিয়েছে ফ্যান সু।' কাচের বলটা হুয়াং-এর হাতে দিয়ে আবার বসল সে সোফায়। 'কসমেটিক কেসটা সরিয়ে ফেলো এখান থেকে, ডাক্তার। আর একজোড়া হ্যান্ডকাফের কথা বলেছিলাম, ও দুটো পরিয়ে দাও মিস্টার মাসুদ রানার হাতে।'

'শিরদাঁড়াটা ভেঙে দেব, উ-সেন?' প্রশ্ন করল স্যুই থি।

'না না, স্যুই। ছেড়ে দাও ওকে। দুএকটা কথা জানবার আছে।'

উঠে পড়ল স্যুই থি। ছাড়া পেয়ে পরাজিত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল মিসেস গুপ্ত। অভ্যস্ত হাতে একগুচ্ছ চুল সরাল কপাল থেকে। ভীত, সন্ত্রস্ত, দিশেহারা একটা বাচ্চা মেয়ের মত দেখাচ্ছে ওকে এখন। রানার উপর একবার উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে উ-সেনের দিকে ফিরল।

'এসো,' যথেষ্ট নম্র ভাবেই ডাকল ওকে উ-সেন। 'এই সোফাটায় এসে বসো, আমার পাশে।' রানার হাতে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে দিল একজন প্রহরী। ক্লিক শব্দটা পেয়ে রানার উদ্দেশে বলল, 'ফ্যান সুর কথা যদি সত্য হয়, আপনার শরীর থেকে লাইটিকের প্রভাব এতক্ষণে প্রায় দূর হয়ে যাওয়ার কথা। বলুন তো, মিস্টার মাসুদ রানা, সত্যিই কি তাই?'

প্রায় ত্রিশ ঘণ্টা পর প্রথম কথা বলবার সুযোগ পেল রানা। বলল, 'প্রায় দূর হয়ে এসেছে।' নিজের কণ্ঠস্বর নিজের কাছেই অপরিচিত মনে হলো রানার।

'বেশ। ভাল কথা। শুনে সুখী হলাম। এখন বলুন দেখি সরোজ গুপ্তকে কি

করেছেন আপনারা?'

'ইয়েন ফ্যাঙ খুন করেছে ওকে। কেন করেছে তা আপনারাই বলতে পারবেন।' বলল রানা।

'খুবই সহজ ব্যাপার,' বলল ডক্টর হুয়াং। 'যখন টের পেলাম যে আগের রাতে আপনি ডিনার খেয়েছেন ফ্যান সুর সাথে, আমাদের বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হলো না যে ওদের মাধ্যমেই আপনার রেঙ্গুন ছেড়ে পালাবার ব্যবস্থা হয়েছে। কাজেই ওদের দুজনকেও খতম করে দেয়ার হুকুম দিয়েছিলাম আমি ফ্যাঙকে।'

'ঠিকই করেছিল হুয়াং,' বলল উ-সেন। 'কিন্তু দেখা যাচ্ছে ওর প্ল্যান অনুযায়ী হয়নি সবকিছু। ইয়েন ফ্যাঙের কি হয়েছে?'

'আমি মেরে ফেলেছি ওকে।' মিন মিন করে বলল মিসেস গুপ্ত।

'আহ্-হা!' ক্ষোভ প্রকাশ পেল উ-সেনের কণ্ঠে। 'লোকটাকে পছন্দ করতাম আমি।' দুই সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল, 'আর ফাইলটা? ওটা কোথায়?'

'ওটা সরোজের চীফের ব্যাংককের ঠিকানায় পোস্ট করে দিয়েছি।'

মুচকে হাসল উ-সেন। 'তা তুমি করবে না। তবু নিশ্চিত হওয়া দরকার। ডাক্তার, তোমার লাই ডিটেক্টরটা লাগবে একটু।'

একটা ছোট যন্ত্র বের করল হুয়াং। দুটো সরু তারের একদিকে দুটো ক্লিপ, অন্যদিকে কাঠের হ্যান্ডেলওয়ালা ধাতু নির্মিত একটুকরো গোল রড। রডের গায়ে ছোট একটা বোতাম। ক্লিপ দুটো মিসেস গুপ্তের দুই হাতের কব্জিতে আটকে দেয়া হলো, হ্যান্ডেল ধরল উ-সেন। রানার দাড়ি গোঁফের পিছনে লাগল এবার হুয়াং।

'আবার বলো, ফাইলটা কোথায়?'

'পোস্ট করে দিয়েছি।'

'মিথ্যে কথা, আবার বলো।'

'পোস্ট করতে দিয়েছি।' একটু ইতস্তত করে বলল, 'এতক্ষণে পোস্ট করা হয়ে গেছে।'

'শেষেরটুকু মিথ্যে। কাকে দিয়েছ পোস্ট করতে?'

'আমার এক বান্ধবীকে।'

'মিথ্যে কথা।'

'ট্যাক্সি ড্রাইভারকে।'

'মিথ্যে কথা।'

'স্টেশনের কুলিকে। উ...উ...উ!'

চমকে উঠল রানা মিসেস গুপ্তের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শুনে। মুখটা বীভৎস আকার ধারণ করেছে কুঁচকে গিয়ে। পাঁচ সেকেন্ড পর চিৎকার বন্ধ হলো। দাড়ি গোঁফ উধাও হয়ে গেছে রানার ততক্ষণে।

'মিথ্যে কথা। এবার আশা করি সত্যি কথা বলবে। নইলে আবার দেব শক।'

'নানকিং হোটেলের রিসেপশনিস্টকে।'
'সত্যি কথা। কবে পোস্ট করবার কথা?'
'সাত দিন পর।'
'ফাইলের কথা তুমি আর কাউকে বলেছ?'
'না।'
'বেশ।' রানার দিকে ফিরল উ-সেন। 'মিস্টার মাসুদ রানা, আপনি খুব ধীরে ধীরে নেমে আসুন হুইল চেয়ার থেকে। খানিক হাঁটাহাঁটি করে শরীরের রক্ত চলাচলটা ঠিক করে নিন। কিন্তু সাবধান, কোন রকম কুমতলব থাকলে সেটা ত্যাগ করাই ভাল। এক পা এদিক ওদিক ফেলে যদি ওদের সন্দেহের উদ্রেক করেন, গুলি খাবেন। গুলি করার সময় আমার পরামর্শ নেবে না ওরা।' মিসেস গুপ্তের দিকে ফিরল সে আবার। 'মাসুদ রানার সাথে যুক্তি করে এখানে এসেছ তুমি?'
'না।'
'তাহলে কেন এসেছ?'
'আমার উদ্দেশ্য আগেই বলেছি আমি।'
'আবার বলো।'
'নিজের সুখ, সমৃদ্ধি আর নিরাপত্তার জন্যে।' এদিক ওদিক চাইল মিসেস গুপ্ত। 'তাছাড়া তোমার মৃত্যু সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়াও উদ্দেশ্য ছিল।'
'শেষেরটুকু মিথ্যে। আমার মৃত্যু সম্পর্কে কোন সন্দেহ ছিল না তোমার মনে। থাকলে এখানে আসবার সাহস হত না।' হাসল উ-সেন। 'মাসুদ রানার কাছে কোন অস্ত্র আছে?'
'না।'
'যে মেয়েটি গাড়ি আটকাবার চেষ্টা করেছিল আজ রেল স্টেশন থেকে আসবার সময়, সে কে?'
'জানি না।'
'সঠিক উত্তর এড়িয়ে যাচ্ছ, ফ্যান সু। ওকে চেনো তুমি।'
'নানকিং হোটেলে দেখেছিলাম গত পরশু রাতে এবং আজ সকালে।'
'তোমাদের সাথে ট্রেনে করে এসেছে সে মান্দালয়ে?'
'হ্যাঁ।'
'তোমার দলের লোক নয় সে?'
'না।'
'মাসুদ রানার দলের লোক?'
'হতে পারে।'
'এড়িয়ে যাচ্ছ।'
'খুব সম্ভব ও মাসুদ রানার লোক।'
'কি করে বুঝলে?'
'ওকেই উদ্ধার করবার জন্যে গাড়ি থামাবার চেষ্টা করেছিল মেয়েটি।'
'মাসুদ রানার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তোমার বা সরোজের কতদূর জানা ছিল?'

'আমাদের শুধু জানানো হয়েছিল যে একজন লোককে রেঙ্গুন থেকে ব্যাংকক পাচার করবার প্রয়োজন হতে পারে, যেন তৈরি থাকি।'

'ওর উদ্দেশ্য সম্পর্কে যদি কিছুই না জানবে, তাহলে চিনেও ওকে চেনো না বলেছিলে কেন?'

'সেজন্যে তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি আমি, উ-সেন।'

'ফাইলের কাগজ পত্র পড়েছ তুমি?'

'না।'

'মিথ্যে কথা।'

'সবটা পড়িনি, কোন কোন অংশ দেখেছি আমি।'

'ডাক্তার, এর হাত থেকে ক্লিপগুলো খুলে দাও।' রানার দিকে চেয়ে খানিকক্ষণ রানার হাঁটা লক্ষ্য করল উ-সেন। তারপর বলল, 'বেশ জোর পাচ্ছেন এখন পায়ে বোঝা যাচ্ছে। এবার আপনি এসে বসুন ফ্যান সুর সোফায়, ফ্যান সু সরে যাবে পাশেরটায়।'

এগোতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। সোফিয়াকে ছেঁচড়ে টেনে নিয়ে আসছে কার পার্কের দুই সশস্ত্র প্রহরী। সাদা ব্লাউজে গাঢ় রক্তের ছোপ, কপালের একধার কেটে গেছে—গাল বেয়ে রক্ত নামছে এখনও। কনুইয়ের কাছেও কেটে গেছে এক জায়গায়। পায়ের শব্দ শুনে দরজার দিকে ফিরল উ-সেন।

'গাড়িতেই পেয়েছ, নাকি ধাওয়া করতে হয়েছিল বাড়ি পর্যন্ত?' প্রশ্ন করল উ-সেন গার্ডদের।

'ভয়ানক জখম হয়ে গাড়িতেই পড়ে ছিল অজ্ঞান অবস্থায়।' জবাব দিল একজন।

'এখন জ্ঞান ফিরেছে?'

'না।'

'ঠিক আছে। শুইয়ে দাও হুইল চেয়ারটায়। ডাক্তার, তোমার ব্যাগ নিয়ে এসো—দেখো দেখি কদ্দূর কি করতে পারা যায়। যত শিগ্‌গিরি সম্ভব জ্ঞান ফিরে আসা দরকার।'

হুইল চেয়ারে শুইয়ে দেয়া হলো সোফিয়াকে। দরজায় গিয়ে দাঁড়াল প্রহরী দুজন পরবর্তী আদেশের প্রতীক্ষায়। এগিয়ে গেল হুয়াং। সামান্য একটু পরীক্ষা করে বলল, 'জখম তো খুবই সামান্য দেখতে পাচ্ছি, উ-সেন! এই জখমেই জ্ঞান হারাল?' একটু ইতস্তত করে বলল, 'অবশ্য শরীরের ভিতর কোন গুরুতর জখম হতে পারে।' সোজা হয়ে দাঁড়াল সে, রওনা হলো দরজার দিকে, 'পরীক্ষা না করে কিছুই বলা যায় না।'

'আসুন মিস্টার রানা, ততক্ষণে কাজ কিছুটা এগিয়ে রাখি। স্যুই ক্লিপ দুটো লাগিয়ে দাও ওর কব্জিতে। জেনারেল এহতেশাম, আপনি বেশ অস্থির হয়ে উঠেছেন বুঝতে পারছি। আপনার ভয়ের কিছুই নেই। মাসুদ রানা অত্যন্ত হুঁশিয়ার লোক, বোকার মত কিছু করে বসে মারা যাবেন না বলেই আমার বিশ্বাস। যদি এখন এখানে কেউ আহত বা নিহত হয়, সে হবে হয় মাসুদ রানা

নয় ফ্যান সু, কিংবা দুজনই—আমাদের তরফের কেউ নয়। এই বিরক্তিকর প্রশ্নোত্তরেরও সমাপ্তি টানব আমরা যত দ্রুত সম্ভব। অবস্থা সম্পর্কে পরিষ্কার একটা ধারণা করে নিতে চাই আমি বিচারের রায় দেয়ার আগে।' রানার দিকে ফিরল উ-সেন। 'মিথ্যে বলে লাভ নেই, মিস্টার রানা, মিছেমিছি শক খেয়ে কষ্ট পাবেন। প্রথমেই বলুন, ফাইলটা দেখেছেন আপনি?'

'দেখেছি।'

'ফাইলের বিষয়বস্তু সম্পর্কে কাউকে কিছু বলেছেন?'

'না।'

'ওটা দেখার পর আপনার মতামত কি? ''মুসলিম বাংলা'' প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব?'

'অসম্ভব।'

'কেন অসম্ভব?'

'আপনারা নিজেদের স্বার্থে কাজ করছেন, বাংলাদেশের স্বার্থে নয়।'

'ভারত-বিদ্বেষ সংক্রান্ত আপনার মতামত যা প্রকাশ করেছিলেন রেঙ্গুনে, সেসব আপনার সত্যিকার মতামত নয়?'

'না।'

'আমার ধারণা, বাংলাদেশের পক্ষে স্বীয় মর্যাদা বজায় রেখে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকা অসম্ভব। ভারতের পায়ের তলেই থাকতে হবে আপনাদের চিরদিন। আপনার মতামত কি?'

'সম্পূর্ণ উল্টো।'

'কি দিয়ে টিকবেন আপনারা? রিসোর্স কি আছে আপনাদের?'

'আমার দেশ সত্যিই সোনার বাংলা। রিসোর্সের লিস্ট দিয়ে লাভ নেই, সেসব সারা পৃথিবীর জানা আছে। আসল কথা এইসব রিসোর্স আমরা ঠিক মত ব্যবহার করতে পারব কিনা। আমার বিশ্বাস, পারব। প্রথম দিকে কষ্ট হবে, নুন আনতে পান্তা ফুরোবে, কিন্তু নিজের পায়ে দাঁড়াতে বাঙালী জাতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমরা নিজেদেরকে ছোট মনে করি না।'

'জনসংখ্যার দিক দিয়ে আপনারা খুবই বড় মানি, কিন্তু আর কোন্ দিক থেকে বড় শুনি?'

'সবদিক থেকে বড়। ভারতের জনসংখ্যা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি ছিল, আমাদের চেয়ে অনেক বেশি সমস্যায় পীড়িত ছিল ভারত সাতচল্লিশ সালে—আজকে দেখুন তার দিকে চেয়ে।'

'সেই একই দারিদ্র, একই দুর্দশা, একই ভিক্ষার থলি দেখতে পাচ্ছি।'

'দেখবার চোখ নেই বলে।'

'চোখ সত্যিই নেই, কিন্তু যুক্ত পাকিস্তানের জি.এন.পি. ভারতের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। ভারতের চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে গিয়েছিল পাকিস্তান, উন্নতিশীল দেশগুলোর প্রথম সারিতে লেখা হত পাকিস্তানের নাম, ভারতের নয়।'

'কারা লিখত? যারা এইডের ছুতোয় দাসত্বের শৃঙ্খলে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে

নিয়েছিল পাকিস্তানকে, তারা। কয়টা বেসিক ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হয়েছে পাকিস্তানে গত পঁচিশ বছরে? বেসিক ইন্ডাস্ট্রির কথা বললেই কর্জ দেয়ার উৎসাহে ভাটা আসত কেন? এখানে বেসিক ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হলে এইড দাতাদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে, সেজন্যে। এমন সব ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হয়েছিল পাকিস্তানে, যার মেশিন-পত্র থেকে শুরু করে কাঁচা মাল পর্যন্ত আমদানী করতে হত বিদেশ থেকে। ফলে ফাঁপা অর্থনীতির সৃষ্টি হয়েছিল পাকিস্তানে। জি.এন.পি. আর সত্যিকার স্ট্যাবিলিটি আলাদা জিনিস। যখন ঝড় উঠল, ভেঙে গেল তাসের ঘর। কিন্তু ভারতকে দেখুন, এখনও ওরা গরীব, স্বীকার করি, তবে কিছুদিন পর আর গরীব থাকবে না। সলিড ইকনমি তৈরি করে নিয়েছে ওরা। ওরা কষ্ট করেছে পঁচিশ বছর, আমাদের মত আলাদা ডাঁটের পোশাক পরিচ্ছদ পরেনি, ডাটসান মাযদা মার্সিডিস শেভইম্পালা চালায়নি, এইডের টাকা চুরি করে সুইস ব্যাংক ভরে ফেলেনি—গোটা দেশকে একসাথে টেনে তোলার জন্যে প্রস্তুতি নিয়েছে, পরিশ্রম করেছে। আজকে আলপিন থেকে নিয়ে অ্যারোপ্লেন পর্যন্ত ওরা নিজেরা তৈরি করছে। নিজের তৈরি গাড়িতে চড়ে হাওয়া খাচ্ছে ওরা। এককোটি শরণার্থীকে খাইয়েছে নয় মাস, যুদ্ধ চালিয়েছে, তবু খাড়া আছে মেরুদণ্ড, ভাঙেনি। নতুন নতুন ইন্ডাস্ট্রির, নতুন নতুন ফ্যাক্টরির সম্পূর্ণ মেশিন এবং সমস্ত পার্টস ওরা নিজেরা তৈরি করছে—ফিজিবিলিটি পরীক্ষার জন্যে এইড দাতাদের কাছে ধরনা দিতে হচ্ছে না ওদের। আসলে বেসিক ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করেছে ওরা। জনসংখ্যার চাপ আমাদের চেয়ে ওদের অনেক বেশি ছিল। ওরা যদি পারে, আমরা পারব না কেন?'

'বাহ্, চমৎকার বক্তৃতা,' টিটকারির ভঙ্গিতে বলে উঠল জেনারেল এহতেশাম।

'বক্তৃতা দিচ্ছে ভুট্টো সাহেব—কাজ করে দেখাব আমরা।'

'ভারতের মার্কেট হয়ে টিকে থাকবে তোমরা।'

'এটা আপনাদের উইশফুল থিংকিং। আপনারা আসলে তাই চান। কিন্তু একটা জাগ্রত জাতিকে কেউ কোনদিন দাবিয়ে রাখতে পারে না।'

'দ্রব্যমূল্য ঠেকাবেন কি করে?' প্রশ্ন করল উ-সেন।

'প্রোডাকশন দিয়ে। পরিশ্রম করতে পিছ পা হবে না বাঙালী। আমরা উঠবই।'

'বেশ বেশ, যখন উঠবেন তখন দেখা যাবে,' বলল উ-সেন। 'এখন আপাতত একটু সুস্থির হয়ে বসে আমার প্রশ্নের জবাব দিন। আপনার ইয়ট নিয়ে কোথায় গেছে একশো আরাকানী?'

'আকিয়াব।'

'ওই অস্ত্র আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্যেই নিয়ে এসেছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'ফ্যান সুর হাতে কি ইচ্ছে করেই ধরা দিয়েছিলেন?'

'না।'

'মিথ্যে কথা। ঠিক জবাব দিন।'

'কিছুটা অন্যমনস্কতা ছিল।'
'বাকিটা ইচ্ছাকৃত?'
চুপ করে থাকল রানা।
'জবাব দিন।'
'হ্যাঁ। কিন্তু ও আমাকে ইঞ্জেকশন দিয়ে কাবু করে ফেলুক, সেটা চাইনি।'
'আপনি জানতেন, ও আপনাকে এখানে নিয়ে আসবে?'
'জানতাম।'
'সেকথা ও জানত?'
'না। ওর ধারণা ছিল আমাকে বন্দী করে নিয়ে আসছে।'
'আপনাকে দেখা মাত্র গুলি করা হবে না, এ নিশ্চয়তা কোথায় পেলেন?'
'কর্নেল শেখ আমাকে জ্যান্ত ধরতে চাইবে, এটাই স্বাভাবিক।'
'তাহলে ট্রেনের মধ্যে আক্রমণ করেছিলেন কেন?' প্রশ্ন না করে থাকতে পারল না মিসেস গুপ্ত।
'স্বেচ্ছায় আসতে চাইছিলাম, সরোজ হয়েই—কিন্তু লাইটিকের প্রভাবে অসহায় অবস্থায় নয়।'
'এই মেয়েটা কে?' সোফিয়ার দিকে ইঙ্গিত করল উ-সেন। ওইদিকে চেয়েই চমকে উঠল রানা। সবার অলক্ষ্যে হুইল চেয়ারের গদির নিচে হাত চলে গেছে সোফিয়ার।
চট করে প্রহরী দুজনের দিকে চোখ পড়ল রানার। দমে গেল মনটা। প্রহরীর লক্ষ্য এড়াতে পারেনি সোফিয়া। একজন গুঁতো দিল অপরজনের পাঁজরে, ইশারা করল সোফিয়ার দিকে, হালকা অনিশ্চিত পায়ে হুইল চেয়ারের দিকে এগোল প্রহরীটা। অপরজন রানার দিকে পিস্তল তাক করে ধরে আছে। স্থির, নিষ্কম্প হাতে। ডক্টর হুয়াং-এর পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।
'চিনি না।' উত্তর দিল রানা উ-সেনের প্রশ্নের।
'মিথ্যে কথা। এই মেয়েটাই কি ছুরি মেরেছিল আমার লোকের পিঠে?'
'জানি না।'
'মিথ্যে কথা।'
তীব্র শক খেল রানা পর পর চারবার। দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করল সে।
'আপনার সহ্য ক্ষমতা অতুলনীয়,' বলল উ-সেন। 'কিন্তু আপনাকে সত্যি কথা বলতেই হবে, মিস্টার মাসুদ রানা। সত্যি কথাটা জানতেই হবে আমার। বলুন, কে এই মেয়েটা?'
চুপ করে থাকল রানা। আবার কয়েক সেকেন্ড বয়ে গেল বিদ্যুৎ প্রবাহ। টুঁ শব্দ বেরোল না রানার মুখ থেকে।
কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল উ-সেন, থমকে গেল একটা তীক্ষ্ণ নারী কণ্ঠ শুনে।
'সরে যাও, নইলে গুলি করব আমি।' প্রহরী বাধা দেয়ার আগেই ঝট করে উঠে বসেছে সোফিয়া।
'কি ব্যাপার?' প্রশ্ন করল উ-সেন। 'কি ব্যাপার, স্যুই?'

'হঠাৎ উঠে বসে তোমার বুকের দিকে একটা পিস্তল তাক করে ধরেছে মেয়েটা।'

'পিস্তল পেল কোথায়? সার্চ করা হয়নি ওকে?'

'হুইল চেয়ারের গদির নিচে থেকে বের করেছে পিস্তল। মিথ্যে কথা বলেছে ফ্যান সু, অস্ত্র লুকানো ছিল ওখানে।'

স্তব্ধ হয়ে গেছে ঘরের সবাই। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রহরী দুজন। একজন এগোতে গিয়েছিল, হাত তুলে থামিয়ে দিয়েছে ডক্টর হুয়াং। সবাই প্রতীক্ষা করছে উ-সেনের আদেশের জন্যে। হাসি দেখা দিল উ-সেনের মুখে।

'হাসাহাসি পরে হবে,' বার্মিজ ভাষায় বলল সোফিয়া। 'অস্ত্র ফেলে দিতে বলো তোমার লোকদের। নইলে গুলি করব আমি।'

বিস্তৃততর হলো উ-সেনের হাসি। বলল, 'প্লেন ক্র্যাশে একবার মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছি তো, তাই মরতে আর আমার ভয় হয় না। আমাকে ভয় দেখিয়ো না খুকি। ইচ্ছে হয় মারো। কিন্তু মনে রেখো, দু'দুটো পিস্তল ধরা আছে মাসুদ রানার দিকে—আমার সাথে সাথেই লুটিয়ে পড়বে মেঝেতে মাসুদ রানার লাশ। তোমার কি হবে বলতে পারি না, হয়তো বেঁচে যাবে, হয়তো মারা পড়বে আমার লোকের হাতে—কিন্তু যাকে সাহায্য করার জন্যে এত কষ্ট স্বীকার করে রেঙ্গুন থেকে এ পর্যন্ত এসেছ, তাকে জ্যান্ত পাবে না। বুঝতে পেরেছ কথাটা?' খানিকক্ষণ নিঃশব্দে হাসল উ-সেন। 'কই, গুলি করছ না যে? পারছ না? দশ পর্যন্ত গুনব আমি। এর মধ্যে যদি পিস্তলটা হাত থেকে ফেলে না দাও মাসুদ রানার লাশ দেখতে পাবে তুমি চোখের সামনে। পরমুহূর্তে পিস্তল দুটো ফিরবে তোমার দিকে। এক…দুই…'

'বাজে কথায় কান দিয়ো না সোফিয়া, গুলি করো!' চিৎকার করে উঠল রানা।

কিন্তু গুলি করতে পারল না সোফিয়া। গুনে চলেছে উ-সেন। আট পর্যন্ত আসতেই ফেলে দিল সে পিস্তল। নিচু হয়ে কুড়িয়ে নিল সেটা হুয়াং। এতক্ষণে ফোঁস করে একসাথে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল ঘরের সব ক'টা লোক।

অপরাধী দৃষ্টিতে একবার রানার দিকে চেয়ে চোখ নামিয়ে নিল সোফিয়া।

হা হা করে হাসল উ-সেন। বলল, 'লাই ডিটেকটর ছাড়াই আমি বলে দিতে পারি মাসুদ রানার প্রতি কেবল প্রবল আসক্তি নয়, রীতিমত সত্যিকার দুর্বলতা রয়েছে সোফিয়া নামে একটা মেয়ের। আপনাকে ভাগ্যবানই বলব মিস্টার মাসুদ রানা।' চিন্তান্বিত কণ্ঠে বলল, 'প্যাপনের মুখে শুনেছি নামটা। কে হতে পারে?' সরাসরি সোফিয়ার দিকে চাইল উ-সেন। 'এতক্ষণ জ্ঞান হারাবার ভান করে আমাদের কথা শুনেছ নিশ্চয়ই। তোমার পরিচয় জানতে চাইছিলাম আমি মাসুদ রানার কাছে। ও জানাতে চাইছিল না বলে ভয়ঙ্কর ইলেকট্রিক শক দিচ্ছিলাম। এবার বলো, তোমার পরিচয় জানাবে, না মাসুদ রানাকে শক দেব?'

'আমার নাম সোফিয়া মং লাই।'

বিস্ময় দেখা দিল উ-সেনের মুখে। কিন্তু সামলে নিল।

'গুড। ধন্যবাদ।' উঠে দাঁড়াল উ-সেন। 'বুঝলাম। আমাদের এখানকার অধিবেশন এইখানেই সমাপ্ত হচ্ছে। আর আমার কিছু জানবার নেই। আর কেউ কোন প্রশ্ন করবেন?'

'এদের ব্যাপারে কি বুঝলেন?' প্রশ্ন করল কর্নেল শেখ।

'বুঝলাম এরা তিনজন তিন উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়েছে আমাদের বিরুদ্ধে। আরও বুঝলাম, ভয়ের কিছুই নেই, আমাদের সম্পর্কে এরা যা জানতে পেরেছে, সেটা আর কাউকে জানাবার সুযোগ পায়নি। এখন শুধু ফাইলটা উদ্ধার করে আনলেই সমস্ত ব্যাপার আবার আমাদের সম্পূর্ণ আয়ত্তে চলে আসছে।' হুয়াং-এর দিকে ফিরল উ-সেন। 'ডাক্তার, ফাইলটা উদ্ধারের ব্যবস্থা করে ফেলো। স্যুই, ডিনারের সময় পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ, টেবিল সাজিয়ে ফেলো। তোমরা চারজন এদেরকে প্যাপনের সেলে ভরে দাও। ওদের খাওয়ারও ব্যবস্থা করবে—খালি পেটে হত্যা করা পাপ।' দরজার দিকে এগোল উ-সেন।

'মাসুদ রানাকে আমাদের হাতে তুলে দিচ্ছেন তো?' আবার প্রশ্ন করল কর্নেল শেখ।

'না। ওকে পাকিস্তান পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা আপনাদের আছে বলে আমি মনে করি না।'

'তাহলে? কি করবেন আপনি ওদের নিয়ে?'

'মেরে ফেলব।'

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল উ-সেন।

সাত

সোফিয়ার কপালে, কনুইয়ে সার্জিকাল টেপ লাগিয়ে দিল হুয়াং অভ্যস্ত হাতে জায়গাগুলো ভাল করে ডেটল দিয়ে ধুয়ে নিয়ে। তারপর হাতকড়া পরিয়ে দেয়া হলো। মিসেস গুপ্তের হাতেও হাত কড়া। ভয়ে পাংশু হয়ে গেছে ওর মুখ, সপ্রতিভ ভাবটা সম্পূর্ণ মুছে গেছে ওর চেহারা থেকে। পরিষ্কার টের পেয়েছে সে আসন্ন অবধারিত মৃত্যু। ব্লটিং পেপার দিয়ে কেউ যেন শুষে নিয়েছে ওর শরীর থেকে সমস্ত রক্ত।

গোটা কয়েক করিডর পেরিয়ে নিয়ে আসা হলো ওদের একটা বন্ধ ঘরের সামনে। দরজায় চাবি লাগাল একজন, বাকি তিনজন পিস্তল হাতে প্রস্তুত থাকল পিছনে। ধাক্কা দিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকানো হলো রানাকে, ওর পিঠের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল মিসেস গুপ্ত, তার উপর সোফিয়া।

দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা আবার।

ধড়মড় করে খাটের উপর উঠে বসল বার্মিজ পোশাক পরা একজন প্রৌঢ়।

আধ হাত লম্বা দাড়ি, শতকরা দশ ভাগ তার পাকা। চোখ দুটো ঈষৎ বাঁকা। মংগোলিয়ান। কিন্তু দীর্ঘদেহী। বয়স পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে। চোখে মুখে দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের ছাপ। ছোট হলেও চোখ দুটো তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল, বুদ্ধিদীপ্ত। চেহারার মধ্যে দলপতি সুলভ আভিজাত্য লক্ষ্য করল রানা। এই লোক আদেশ করতেই অভ্যস্ত, আদেশ পালিত হচ্ছে কিনা দেখার প্রয়োজন বোধ করে না, কারণ ও জানে, অক্ষরে অক্ষরে পালিত হবে ওর আদেশ, অমান্য করা হবে না। তড়াক করে একলাফে খাট ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে সোফিয়াকে দেখা মাত্রই। দুই পা এগিয়েই থমকে দাঁড়াতে হলো ওকে, কারণ ঝাঁপিয়ে পড়েছে সোফিয়া ওর বুকের উপর।

মিনিট দুয়েক দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে হু হু করে কাঁদল, দুজনই এক সাথে অনর্গল কথা বলে চলল আরাকানী ভাষায়, কেউ কারও কথা শুনছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। একবর্ণও বুঝতে পারছে না রানা ওদের কথা, কিন্তু অনুস্বর প্রধান ভাষাটা নেহায়েত মন্দ লাগছে না ওর কানে। মাঝে মাঝে বাংলার মত এক-আধটা শব্দ উচ্চারিত হচ্ছে, কিন্তু সেটার মানে বুঝে ওঠার আগেই আরও অসংখ্য বিচিত্র শব্দের তোড়ে গুলিয়ে যাচ্ছে সব।

সোফিয়ার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, মাঝে মাঝে পচাৎ পচাৎ করে চুমো খাচ্ছে ওর অশ্রু ভেজা গালে, সেইসাথে অনর্গল কথা বলছে লোকটা। মিনিট তিনেক পরে দুজনেই শান্ত হলো কিছুটা, হঠাৎ খেয়াল হলো, আশে পাশে আরও লোকজন আছে। হাতকড়া পরা হাত দুটো বের করে আনল সোফিয়া বাপের মাথা গলিয়ে, ফাঁস মুক্ত হয়েই দুই হাতে রানা ও মিসেস গুপ্তের হাত ধরে টেনে এনে খাটের উপর বসিয়ে দিল প্যাপন মং লাই। যেন পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে এমনি ভঙ্গিতে সোফিয়ার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'আমার মেয়ে।' তোশকের নিচ থেকে দুটো ইয়া মোটা চুরুট বের করে ধরিয়ে দিল জোর করে দুজনের হাতে। 'কিছু মনে কোরো না, ব্যাপারটা আগে শুনে নিই ওর কাছে।'

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল প্যাপন মং লাই। মেয়েকে ইঙ্গিত করল রানার পাশে বসতে। কথা শুরু করল সোফিয়া। এবার আর একটি কথাও বলছে না বৃদ্ধ, চুপচাপ শুনে যাচ্ছে, আর মাঝে মাঝে রানার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে অনর্থক হাসছে। বার কয়েক নিজের নাম শুনতে পেল রানা সোফিয়ার মুখে, সেটুকু ছাড়া বাকি সবকিছুই দুর্বোধ্য। কথা শেষ হতেই উঠে এসে রানার কাঁধে হাত রাখল প্যাপন মং লাই।

'আমাদের জন্যে আপনি যা করেছেন, সেজন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।' ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলল প্যাপন মং লাই। 'ভুল ইংরেজির জন্যে কিছু মনে করবেন না। আমি অশিক্ষিত মানুষ, যেটুকু বলতে পারছি তা ওর মায়ের কল্যাণে। যাই হোক, গেল তো সব ফেঁসে। এখন? এখন কি ভাবছেন?'

'দেখা যাক,' বলল রানা। 'যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।'

'তা ঠিকই, কিন্তু খুব একটা আশা দেখতে পাচ্ছি না আমি। সবচেয়ে

দুশ্চিন্তা হচ্ছে আমার লোকজনদের জন্যে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই অস্ত্রশস্ত্র সহ আমাদের এলাকায় পৌঁছে গেছে ওই একশো ছেলে, হয়তো কিভাবে ওগুলো ব্যবহার করতে হয় গোপনে তারও ট্রেনিং দিতে শুরু করে দিয়েছে সবাইকে—কিন্তু অর্ডার দেবে কে? আমার বা সোফিয়ার আদেশ ছাড়া যুদ্ধ করবে না কেউ। আমরা দুজনই মারা যাচ্ছি এখানে। ফলটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, ভয়ানক অত্যাচার হবে এবার আমার লোকের ওপর। মার খাবে কিন্তু প্রতি-আক্রমণ করবে না কেউ আমার আদেশ ছাড়া। অস্ত্র পাওয়া যাবে সবার কাছেই, কাজেই অত্যাচারের পরিমাণটা নিশ্চয়ই আঁচ করতে পারছেন?' বিষণ্ণ মুখে চুপ করে থাকল সে কিছুক্ষণ। 'এটা জানে বলেই আমাকে বন্দী করেছে উ-সেন। ওর জানা ছিল না যে সোফিয়া আমার একমাত্র মেয়ে, আমি মারা গেলে ও পাচ্ছে সর্দারি। ওর ধারণা ছিল আমাকে আটকে রাখলেই আদেশ দেয়ার লোকের অভাবে চুপ করে সমস্ত নির্যাতন সহ্য করবে আমার লোক। এখন যখন জেনে গেছে, আমার বা সোফিয়ার নিস্তার তো নেই-ই, ভয়ানক খারাবি আছে আমার বারো হাজার লোকের কপালে।'

'আপনি ওদের বিরুদ্ধে গেলেন কেন?' প্রশ্ন করল রানা। 'ওরা কি ক্ষতি করছিল আপনাদের?'

'কি ক্ষতি করছিল মানে?' খেপে উঠল প্যাপন সর্দার। 'আমার লোক ধরে নিয়ে যাচ্ছে ওরা, জোর জুলুম শুরু করেছে গেরিলা ট্রেনিং নেবার জন্যে, ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছে যুবতী মেয়েদের—আর আমি ওদের বিরুদ্ধে যাব না? আমার এলাকায় ট্রেনিং সেন্টার করেছে, বাংলাদেশ আর ভারতের এয়ার ফোর্স যখন বোম ফেলবে, কারা মারা যাবে? আমার লোক মারা যাবে না? শুধু শুধুই গিয়েছি আমি উ-সেনের মত হারামী লোকের পিছনে লাগতে? আমার লোককে যদি রক্ষা না করতে পারি, তাহলে কি দরকার আমার সর্দারি করার?'

'কাজেই দেখা যাচ্ছে, আপনার মারা যাওয়া চলবে না। তাহলে ভীষণ ক্ষতি হয়ে যাবে আপনার লোকদের। এখান থেকে বাঁচবার কোন উপায় চিন্তা করেছেন?'

'চিন্তা অনেক কিছুই করেছি, কিন্তু বাঁচবার চিন্তা করিনি, কারণ আমি জানি আমার ক্ষমতা নেই এদের হাত থেকে ছুটে বেরোবার। ভরসা ছিল, সোফিয়া হয়তো গোষ্ঠীকে রক্ষা করার কোন উপায় খুঁজে বের করতে পারবে, কিন্তু দেখছি, বাপকে উদ্ধার করার চিন্তাই ওর মধ্যে বেশি কাজ করেছে। ফলে লাভের মধ্যে শুধু একটাই হয়েছে, মরার আগে শেষ দেখা হয়ে গেল বাপ-বেটিতে।' সোফিয়ার থুতনি ছুঁয়ে চুমো খেল প্যাপন আঙুলের মাথায়। রানার দিকে ফিরল। 'তুমি কি ভাবছ? কোন পথ দেখতে পাচ্ছ বাঁচবার?'

'এখনও কিছুই দেখতে পাইনি। তবে আমি জানি কোন না কোন পথ আছেই, কোন না কোন সুযোগ পাবই আমরা। যদি সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারি তাহলে নিজেদের মুক্ত করতে পারব।'

'সুযোগ আসবেই?'

'হ্যাঁ, আসবেই। আমরা তাকে চিনে নিতে পারব কিনা সেটা আলাদা কথা। কিন্তু অন্তত একটা দুটো সুযোগ যে আসবে তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই।'

'তুমি আশাবাদী মানুষ। ভাল। আশাবাদী মানুষ আমি পছন্দ করি। ছাড়া পেয়েই প্রথম কি কাজ হবে আমাদের?'

হাসল রানা। চুরুটটা ধরাল। কড়া ধোঁয়া বুকের মধ্যে টেনেই কাশল কিছুক্ষণ। সোফিয়ার মতই রানার প্রতিটি কথা বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছে প্যাপন মং লাই। ধরেই নিয়েছে যেন ছাড়া পেয়ে গেছে। রানার উত্তরের প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করছে। রানা বলল, 'অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করব।'

'আমার দেশে যাবে? ওই শয়তানগুলোকে শায়েস্তা করবে না?'

'আমার একার কাজ নয় ওটা।'

'তোমার যত লোক দরকার আমি দেব। অস্ত্র আছে, লোক আছে, চেষ্টা করে দেখবে না একবার?'

'সেসব পরের কথা পরেই ভাবা যাবে। অবস্থার গতি-প্রকৃতি বুঝে চলতে হবে আমাদের। যেমন সুবিধা বুঝব তেমনি ব্যবস্থা নেব।'

'ঠিক।' মাথা নাড়ল বৃদ্ধ। 'বোঝা যাচ্ছে অতি-আশাবাদী নও তুমি। অর্থাৎ অসাবধান নও। এইটাই দরকার। যারা কেবল গাল-চালাকি করে তাদের আমি পছন্দ করি না। তোমার ওপর ভরসা আসছে আমার। কিন্তু এখন আর আলোচনা নয়, বাইরে পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।'

চাবি ঘোরানোর আওয়াজ পাওয়া গেল। ক্লিক করে খুলে গেল তালা। খাবার আনা হয়েছে ওদের জন্যে। মোটাসোটা এক খানসামার পিছনে চারজন পিস্তলধারী প্রহরী। মিসেস গুপ্তকে চিনতে পেরে সামান্য মাথা নেড়ে হাসল খানসামা। টেবিলে খাবার সাজিয়ে দিচ্ছে সে। প্রহরীদের আড়াল করে চাপা কণ্ঠে বলল মিসেস গুপ্ত, 'আমাকে মেরে ফেলা হবে, জোসেফ।'

'শুনেছি।' ফিসফিস করে জবাব দিল জোসেফ।

'কোন সাহায্য পাব না তোমার কাছে, জোসেফ?'

'সাহায্য করতে গিয়ে মরব নাকি?'

'তোমার ভাইঝির জন্যে দুঃখ করেছিলে তুমি একদিন। ওকেও খুন করেছিল...'

'আমাকে তো করেনি।' কথাটা বলেই সরে গেল জোসেফ। আস্তে করে বলল, 'দুঃখিত, ম্যাডাম।'

জোসেফ বেরিয়ে যেতেই আবার দরজা বন্ধ করে দিল প্রহরী। বন্ধ করবার আগে মুখটা বাড়িয়ে বলে গেল, 'দশ মিনিটের মধ্যে যে যা পারো খেয়ে নাও। ডিনার সেরেই নামবেন উ-সেন।'

মিসেস গুপ্ত খেল না কিছুই। একেবারে মুষড়ে পড়েছে মহিলা। রানা, সোফিয়া আর প্যাপন মং লাইয়ের আন্তরিক আলাপে অংশগ্রহণ করতে পারছে না, বাধো বাধো ঠেকছে রানা ও সোফিয়ার প্রতি ওর আচরণের কথা ভেবে। বার কয়েক চেষ্টা করল রানা ব্যাপারটা সহজ করবার, কিন্তু কিছুতেই সহজ

হতে পারল না সে।

নাড়ীভুঁড়ি জ্বলে যাচ্ছিল রানার খিদেয়। হাপুস হুপুস খেয়ে চলেছে ও, আর এরই মধ্যে যতটা সম্ভব হালকা কথাবার্তা দিয়ে সবাইকে খুশি রাখবার চেষ্টা করছে। যদি মারা যেতেই হয়, মুখ ভার করে মরতে চায় না ও। মনে মনে পরিষ্কার বুঝতে পারছে রানা, সব দিক থেকে সতর্ক হয়ে গেছে উ-সেন, এবার তার হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে, তবু মৃত্যুর কথা ভুলে খুশি থাকতে চায় সে। যখন সব আশা নিভে যায়, যখন করবার কিছুই থাকে না ভাগ্যকে মেনে নেয়া ছাড়া, তখনও মুখ ভার করবার কোন মানে হয় না।

'লাই ডিটেকটর ছাড়াই উ-সেন যে কথাটা বলল, সেটা কতদূর সত্যি?' প্রশ্ন করল রানা।

লজ্জা পেল সোফিয়া। মাথা নিচু করে হাসতে হাসতে বলল, 'দূর। বাজে কথা।'

'তাহলে গুলি করলে না কেন? ওইটাই উ-সেনকে হত্যা করার শেষ সুযোগ ছিল।'

'তোমাকে, মানে, আপনাকে মেরে ফেলত তাহলে ওরা।'

'এখন কি বাঁচিয়ে রাখবে মনে করছ?'

'না, মানে, তবু তো কিছুটা সময় পাওয়া গেল হাতে। বলুন তো, গুলি করতে বলছিলেন কেন তখন?'

'তোমার আঙুল দেখেই আমি বুঝতে পারতাম ঠিক কখন গুলিটা বেরোচ্ছে তোমার পিস্তল থেকে। আমি তৈরি ছিলাম লাফ দেয়ার জন্যে। ডিগবাজি খেয়ে পড়তাম প্রহরীর ঘাড়ে। তারপর কি হত বলা যায় না। হয়তো এতক্ষণে সব কয়জনকে খতম করে দিয়ে দেশে রওনা হওয়ার জন্যে মালপত্র গুছাতাম আমরা।'

'তাহলে তো দেখছি গুলি না করাটা ভুলই হয়েছে!'

'ভুল কি ঠিক বলা যায় না।' হাসল রানা। 'হয়তোর কথা বলছি আমি। হয়তো জখম হতাম, হয়তো মারাও পড়তে পারতাম। নিশ্চিত করে বলা যায় না। এখন যখন নিশ্চিত জানি কি হতে চলেছে, তখন তা জানতাম না। এইটুকুই লাভ হয়েছে।'

'এখন নিশ্চিত জানো?' প্রশ্ন করল মিসেস গুপ্ত।

'জানি।' উত্তর দিল রানা।

'কি হতে চলেছে?'

'এখন আর তৃতীয় সম্ভাবনাটা নেই। জখম হব না। হয় মরব, নয় বাঁচব। বাঁচবার ইচ্ছেই বেশি, কাজেই ওদিকেই চেষ্টাটা রাখব বেশি। এখন যা করে আল্লায়।'

হো হো করে হেসে উঠল প্যাপন মং লাই। তুমি তো দারুণ ছেলে হে! সত্যিকার পুরুষ মানুষ তুমি। সোফিয়া বোধহয় চান্স দেবে না, দিলে আমিই তোমার প্রেমে পড়ে যেতাম।'

'পড়ো না, মানা করছে কে তোমাকে?' কপট কোপ দৃষ্টি হানল সোফিয়া পিতার প্রতি।

'পড়বই তো। দেখিস। এখান থেকে বেরিয়ে নিই না আগে। তুই আর সুযোগ পাবি না তখন।'

'ওহ্-হো, ভুলে গিয়েছিলাম,' বলল রানা, 'গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাওয়ার পর তোমার অজ্ঞান হওয়ার প্ল্যানটা মাথায় এসেছিল, তাই না সোফিয়া? নাকি ইচ্ছে করেই ঘটিয়েছিলে অ্যাক্সিডেন্ট?'

'পাগল নাকি! ইচ্ছে করে অতবড় অ্যাক্সিডেন্ট করবার সাহস আছে বুঝি আমার? ভেবেছিলাম কোনমতে মার্সিডিসটা থামাতে পারলে তোমাকে উদ্ধার করে নিয়ে পালিয়ে যাব। হঠাৎ মোড় নিল বলে তাল সামলাতে না পেরে এমনিই অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে। আর স্টার্ট করতে পারলাম না গাড়িটা। চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল মার্সিডিস। তখনই প্ল্যানটা এল। আমি জানতাম, আমাকে ধরবার জন্যে প্রথমেই ওখানে লোক পাঠানো হবে। ঠিক পনেরো মিনিটের মধ্যেই দেখি গিয়ে হাজির হয়েছে। চুপচাপ মটকি মেরে পড়ে থাকলাম। কিছুই চিনি না আমি মান্দালয়ের, খুঁজে পেতাম না কিছুতেই এদের আড্ডা। কৌশলটা বেশ কাজে লেগে গেল।'

হঠাৎ কথা বলে উঠল মিসেস গুপ্ত বিরস বদনে।

'আপনারা বেশ হাসি খুশি আছেন কিন্তু।' রানার দিকে ফিরল সে। 'আমার সাংঘাতিক ভয় লাগছে, রানা। তোমার লাগছে না?'

'লাগছে। মরতে কার ভাল লাগে বলো?'

'কিন্তু নিজেকে এত ছোট লাগছে কেন? আমি জানি-তোমাদের তা লাগছে না। আমার লাগছে কেন?'

'আত্মপ্রেমের জন্যে।'

'তার মানে?'

'মানে খুবই সহজ।' একবিন্দু টিটকারি প্রকাশ পেল না রানার কণ্ঠে। 'তুমি আজ পর্যন্ত যা করেছ সব নিজের জন্যে। তোমার দোষ নেই। আসলে আত্মকে ত্যাগ করবার সুযোগ পাওনি তুমি কোনদিন। এই শিক্ষাটা পরিবেশ আর পারিপার্শ্বিকতা থেকে আসে। তোমার সুযোগ হয়নি এ শিক্ষা গ্রহণের। তুমি আত্মপ্রেমেই মগ্ন।'

'আর একটু পরিষ্কার করে বলবে?' গম্ভীর মিসেস গুপ্ত। 'তোমরা নিজেকে ভালবাস না?'

'বাসি। কিন্তু আমরা হাসতে পারছি, তুমি পারছ না। আমাদের চারজনের এখানে আসবার উদ্দেশ্য খতিয়ে দেখলেই সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে তোমার কাছে। আমি কেন এসেছি? দেশের শত্রুকে ধ্বংস করতে। প্যাপন মং লাই কেন এসেছেন? ওঁর লোকেদের সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা করতে গিয়ে, নিজের ব্যক্তিগত লাভের জন্যে নয়। সোফিয়া কেন এসেছে? দেশের লোকদের জন্যে তো বটেই, ওর বাবাকে, এবং সেই সাথে মাসুদ রানা নামের এক বিদেশী প্রায় অপরিচিত লোককে উদ্ধার করতে। কিন্তু তুমি? তুমি এসেছ

শুধু মাত্র নিজের জন্যে। তাই না?'

'হ্যাঁ। কেবল তাই নয়, যাকে বাঁচাবার জন্যে প্রায় অপরিচিতা একটি মেয়ে নিজের জীবন বিপন্ন করতে দ্বিধা করছে না, তাকে আমি ধরে নিয়ে এসেছি আমার ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে। বুঝতে পারছি এখন। ঠিকই বলেছ, আত্মপ্রেম। কিন্তু এর উর্ধ্বে উঠতে পারি না কেন?'

'এটা অভ্যাস। চেষ্টা করলে এই অভ্যাস ভাঙতে পারবে।'

'এই জন্যেই কি মরতেও গ্লানি বোধ করছি?'

'বোধহয়।'

'তোমাদের মত সহজ সরল মনে মরতে পারলে সুখী হতাম।'

মিসেস গুপ্তের ছলছলে চোখের দিকে চেয়ে কেমন যেন বেদনা বোধ করল রানা। বলল, 'আমরা মরবই এমন প্রতিজ্ঞা তো করিনি, ফ্যান সু।'

'আমি অন্তর থেকে অনুভব করছি, আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। উ-সেনকে আমি ভাল করেই চিনি। নিস্তার নেই আমাদের। আমি জানি কতখানি ভয়ঙ্কর লোক ও।'

'আমরাও ভয়ঙ্কর লোক, ফ্যান সু। একটু সুযোগ দিয়ে দেখুক না উ-সেন, এক লাফে ডিঙিয়ে যাব ওকে।'

হাসল মিসেস গুপ্ত। বলল, 'মনটা হালকা লাগছে অনেকটা। অসংখ্য ধন্যবাদ, রানা। যদি বাঁচি, আমার প্রথম কাজ হবে নিজেকে নিজের হাত থেকে উদ্ধার করা। আমি বাঁচতে চাই, রানা।'

এমনি সময় খুব কাছ থেকে হেলিকপ্টারের আওয়াজ শোনা গেল। সামান্য একটু কেঁপে উঠল যেন দালানটা। রানার চোখে প্রশ্ন দেখে বলল মিসেস গুপ্ত, 'ও কিছু না। ফিরে এল উ-সেনের হেলিকপ্টার। ছাতের ওপর ওটার ল্যান্ডিং গ্রাউন্ড।'

আট

হেলিকপ্টারের শব্দে ঘাড় কাত করে ভ্রূ কুঁচকে ছাতের দিকে চাইল কর্নেল শেখ। রোটর ব্লেডের কর্কশ শব্দটা থেমে যেতেই এক-টুকরো মুরগির রোস্ট বেঁধানো কাঁটা চামচ মুখে তুলল।

'ফিরে এল খবর নিয়ে,' বলল জেনারেল এহতেশাম।

'এক্ষুণি জানা যাবে সব,' বলল উ-সেন। 'সোজা এখানেই আসবে এখন লোইকা। ডাক্তার, তুমি কিছুই খাচ্ছ না যে? এত কম খেলে শরীর টিকবে কি করে?'

'রুচি নেই, উ-সেন,' জবাব দিল হুয়াং। 'এক সন্ধ্যার তুলনায় অতিরিক্ত উত্তেজনা হয়ে গেছে আজ। বেশি ঝুঁকি নেয়া হয়ে গেছে। মাথাটা ঘুরছে

তাই। ওই মাসুদ রানা লোকটা যতক্ষণ জ্যান্ত থাকবে ততক্ষণ বোধহয় রুচি ফিরবে না আমার। ভয়ঙ্কর লোক।'

'ঠিক বলেছ। এত দুর্দান্ত একজন লোককে হত্যা করতে আমার রীতিমত কষ্ট হচ্ছে। কী আশ্চর্য আত্মবিশ্বাস দেখেছ? এত ভয়ঙ্কর শত্রুর মুখোমুখি হইনি আমি আর। ওকে দেখে "মুসলিম বাংলার" ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দেহ এসে গেছে আমার মনে।'

'সন্দেহ কেন?' প্রশ্ন করল কর্নেল শেখ।

'আপনাদের কথা শুনে আমার মোটামুটি ধারণা হয়েছিল বাঙালী একটা আবেগপ্রবণ হুজুগে জাতি, যে কোন একটা হুজুগ তুলতে পারলেই বানের জলে ভেসে যাবে। অপরিণামদর্শী। অলস। চায়ের কাপে ঝড় তুলতেই কেবল ওস্তাদ। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন প্ল্যানিং নেই ওদের। কিন্তু এই ছেলেটিকে দেখে এবং এর কথা শুনে বুঝতে পারছি পরিষ্কার, আপনারা ভুল বুঝিয়েছিলেন আমাকে। বাঙালীদের সম্পর্কে ধারণা সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে আমার।'

'কি রকম?'

'একজন সাধারণ স্পাই...'

'ও সাধারণ নয়, মিস্টার উ-সেন,' বাধা দিয়ে বলল কর্নেল শেখ।

'যাই হোক, ওর কথা থেকে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি আমি, বাঙালীদের ভবিষ্যৎ মোটেই হতাশাব্যঞ্জক নয়। একবার কাজে যখন নেমেছি, এর শেষ দেখে ছাড়ব আমি—কিন্তু আমার ধারণা জন্মেছে, অত সহজ হবে না ব্যাপারটা। যে উৎসাহ নিয়ে ওরা দেশ গড়তে লেগেছে, ওদেরকে বিপথে চালনা করা সহজ হবে না।'

'বিপথ বলছেন কেন?' প্রশ্ন করল জেনারেল। 'আমরা ওদের ভুল ভেঙে দিয়ে পথে আনবার চেষ্টা করছি। ওদের ভালর জন্যেই...'

'ভাঁওতা দিয়ে আর ওদের ভোলানো যাবে বলে মনে হয় না। সত্যিই যদি ওরা প্রোডাকশনের দিকে জোর দেয়, তাহলে এই জাতিকে ঠেকিয়ে রাখবার ক্ষমতা পৃথিবীর কারও নেই। বন্যাটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেই আগামী কয়েক বছরে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে যাবে ওরা। সেই সাথে যদি গোটা কয়েক স্টীল মিল তৈরি করতে পারে, ন্যাচারাল গ্যাসকে সত্যি সত্যিই কাজে লাগাতে পারে, অজস্র মাছ ধরে ক্যানিং করে বিদেশে রপ্তানী করতে পারে, কাঁচা পাট বিদেশে রপ্তানী না করে নিজেদের মিলে হাজারো পদের ফিনিশড্ জুট প্রোডাক্ট তৈরি করে বিদেশে রপ্তানী করতে পারে, ভেঙে পড়া চা শিল্পকে আবার দাঁড় করিয়ে ফেলতে পারে, তাহলে রুখবে কে ওদের? জনসংখ্যা তখন ওদের একটা রিসোর্সে পরিণত হবে। কেন বাঙালীরা আপনাদের ইচ্ছের শিকার হবে বুঝতে পারছি না আমি। বাঙালীদের চরিত্রের দৃঢ়তা আর দুর্দমনীয় সাহসের নমুনা হিসেবে যদি মাসুদ রানাকে ধরা যায়, তাহলে আপনাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখতে পাচ্ছি। হাজার কয়েক ধর্মান্ধ ফ্যানাটিক, আর কিছু চিহ্নিত দালাল নিয়ে গোটা বাঙালী জাতির গায়ে একটা চিমটিও কাটতে পারবেন না

আপনারা।'

'আপনি কি আপনার সহযোগিতা উইথড্র করার কথা ভাবছেন?' সরাসরি প্রশ্ন করল জেনারেল।

'নো, মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড।' হাসল উ-সেন। 'আপনারা সফল হোন বা বিফল হোন, সেটা সম্পূর্ণ আপনাদের নিজস্ব ব্যাপার। যতদিন টাকার স্রোত আমার দিকে বইবে ততদিন আমি ঠিকই আছি আপনাদের সাথে। আপনারা পাস করুন বা ফেল করুন আমার কিছুই এসে যায় না।'

ঘরে ঢুকেই স্যাল্যুট করল হেলিকপ্টারের পাইলট।

'কি খবর লোইকো? এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে যে?' প্রশ্ন করল উ-সেন।

'সেই ইয়টটা আকিয়াবে নেই। বারাক নদী বেয়ে পলেতোয়া পর্যন্ত চলে গেছে। আমি নিজে চেক করেছি। ইয়ট খালি। একটা লোকও নেই। অস্ত্রশস্ত্র কিছুই নেই।'

'ট্রেনিং ক্যাম্পে খবর দিয়েছ?'

'ইয়েস, স্যার। কর্নেল আদিব আর মেজর উলফতকে জানিয়েছি সব ঘটনা। ওঁরা বলছেন, অবজার্ভেশন পোস্টের রিপোর্ট হচ্ছে, দারুণ উত্তেজনা আর চাঞ্চল্য দেখা যাচ্ছে আরাকানীদের মধ্যে। নিশ্চয়ই অস্ত্র পৌঁছে গেছে ওদের হাতে। এখনি আক্রমণ করে বসলে হয়তো সব অস্ত্র উদ্ধার করা যেতে পারে, দেরি করলে হাতে হাতে ছড়িয়ে পড়বে চারদিকে, তখন মহা মুশকিল হয়ে যাবে।'

'কথাটা ঠিকই বলেছে,' বলল জেনারেল এহতেশাম।

'ওঁরা প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছেন আপনার আদেশের জন্যে। সম্ভব হলে আজ রাতেই জানাতে বলেছেন আপনার অর্ডার। রাতের মধ্যেই কাজটা সেরে ফেলতে চান ওঁরা।'

চিন্তিত দেখাচ্ছে জেনারেলকে। উ-সেনের দিকে ফিরল। 'আপনি কি বলেন, মিস্টার উ-সেন?'

'আমার তো মনে হয় অত তাড়াহুড়োর কিছুই নেই। আমাদের আগের প্রোগ্রাম ঠিকই আছে। কাল সকালে যাচ্ছি আমরা ট্রেনিং ক্যাম্পে। ওখানে গিয়েই অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।'

'আজ রাতের মধ্যে অস্ত্র ছড়িয়ে পড়বে না চারদিকে?'

'কত আর ছড়াবে?' পুডিং শেষ করে কফির কাপ তুলে নিল উ-সেন। 'ওদের হাতে অস্ত্র থাকা না থাকা সমান কথা। প্যাপনের আদেশ ছাড়া একটা অস্ত্রও ব্যবহার করবে না ওরা। আর আধ ঘণ্টা পর কোনদিন কোন আদেশ দেয়ার ক্ষমতা থাকবে না প্যাপনের।'

'ওকেও শেষ করে দিচ্ছেন?'

'সবাইকে। এরা ভাঙবে কিন্তু মচকাবে না। কাজেই ভেঙে ফেলাই ভাল।'

'মাসুদ রানাকে আমাদের হাতে ছেড়ে দিলে বোধহয় ভাল হত।' বলল

কর্নেল শেখ।

'এক অনুরোধ বারবার করবেন না, কর্নেল। দ্বিতীয়বার সুযোগ পেলে আধমরা অবস্থায় ফেলে যাবে না ও আমাকে। আপনারাও নিস্তার পাবেন না। আমাদের সবার স্বার্থেই ওকে শেষ করে দেয়ার প্রয়োজন আছে।' হাসল উ-সেন। 'পুডিংটুকু শেষ করে নিন, চলুন দেখা যাক, হাতের নিশানা কেমন আছে। এককালে খুব ভাল নাইফ থ্রোয়ার ছিলাম আমি।'

টর্চার চেম্বারে নিয়ে আসা হলো ওদের চারজনকে।

বড় সড় একটা ঘর। ত্রিশ ফুট লম্বা, ত্রিশ ফুট চওড়া। ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা কাচের ঘর। এক ইঞ্চি পুরু কাচ। দশ ফুট লম্বা, দশ ফুট চওড়া, দশ ফুট উঁচু। কাচের ঘরটার মধ্যে কিচ্ছু নেই, একেবারে ফাঁকা। এক ফুট ব্যাসের একটা পাইপ ঘরের ছাত থেকে নেমে এসে ঢুকেছে কাচের ঘরে ছাত ফুঁড়ে, বাথরুমের শাওয়ারের মত অসংখ্য ফুটোওয়ালা একটা ঝাঁঝরি দেখা যাচ্ছে পাইপের এ মাথায়।

ঘরের চারপাশের দেয়ালের দিকে চেয়ে চক্ষুস্থির হয়ে গেল রানার। প্রাচীন ও মধ্য যুগে যত রকমের নির্যাতন যন্ত্র ছিল তার প্রায় সবই সংগ্রহ করেছে উ-সেন। বিচিত্র, বিদঘুটে সব যন্ত্র সাজানো রয়েছে দেয়ালের গায়ে, ঘরের ছাতে ফিট করা রয়েছে বিভিন্ন সাইজের পুলি, কিছু কিছু যন্ত্র যেগুলো দেয়ালে টাঙানো সম্ভব নয়, সেগুলো রাখা আছে মাটিতে। জাদুঘরের মত যত্নের সাথে ঝেড়ে মুছে চমৎকার করে সাজানো আছে সবকিছু। অনেক কিছুই চিনতে পারল রানা। কাঁটা বসানো লোহার নেকলেস রয়েছে, থাম্ব স্ক্রু রয়েছে কয়েক সাইজের, ছয় সের ওজনের স্কাল ক্যাপ আছে, স্ক্যাভেঞ্জার্স ডটার রয়েছে সাতটা, বিশ সেরী ফেটার রয়েছে দুটো, তিন সাইজের তিনটে আয়রন মেইডেন রয়েছে—ওর ভিতর ঢুকিয়ে ধীরে ধীরে চেপে মেরে ফেলা হত এক সময়ে অপরাধীকে। এছাড়া বুকের উপর কাঠের তক্তা ফেলে তার ওপর চাপিয়ে দেয়ার জন্যে কড়া লাগানো আধমনী লোহার ওজন রয়েছে বিশ ত্রিশটা। ঘরের এক কোণে রয়েছে একটা লায়ার র‍্যাক, এক এক করে শরীরের সমস্ত হাড় ভেঙে ফেলার যন্ত্র রয়েছে তার পাশেই। জ্যান্ত ভাজা করবার জন্যে ঘরের অন্য কোণে রয়েছে মধ্য যুগীয় চুলো, চারদিকে গজাল মারা মানুষ সমান লম্বা কাঠের পিপে রয়েছে একটা—এর ভিতর মানুষ ভরে মুখ আটকে গড়িয়ে দেয়া হত পিপেটা পাহাড়ের উপর থেকে, তীক্ষ্ণ গজালের খোঁচায় মোরব্বা-কাচা হয়ে মারা যেত অপরাধী। অপরাধ কবুল করাবার জন্যেও রয়েছে অসংখ্য যন্ত্রপাতি, সূচ, কাঁটা বসানো চেয়ার, নানান কিছু।

কেমন যেন থমথমে ভাব ঘরটায়। দমে গেছে হাসি খুশি প্যাপন মং লাইও। মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মিসেস গুপ্ত আর সোফিয়ার মুখ। রানার চোখে চোখ পড়তেই হাসবার চেষ্টা করল সোফিয়া, কান্নার মত দেখাল হাসিটা।

ভয় পেয়েছে রানাও। ভাবছে, স্যাডিস্ট নাকি লোকটা? নইলে এইসব যন্ত্র সংগ্রহ করবে কেন? ভয়ঙ্কর যন্ত্রণার মৃত্যু অপেক্ষা করছে ওদের জন্যে?

'ভয় পাবেন না। এসব আপনার উপর ব্যবহার করা হবে না, মিস্টার মাসুদ রানা।'

যেন রানার চিন্তার সূত্র ধরেই কথা বলে উঠল উ-সেন পিছন থেকে। নাটুকেপনা আছে লোকটার মধ্যে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল রানা ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে উ-সেন, ডক্টর হুয়াং, স্যুই থি, জেনারেল এহতেশাম আর কর্নেল শেখ।

'এককালে নির্যাতন দেখতে খুবই পছন্দ করতাম। চোখ নষ্ট হয়ে যাবার পর দেখতে পেতাম না, কিন্তু অন্তিম চিৎকার শুনতে ভালই লাগত। কিন্তু একবার একজন লোককে সন্দেহের ওপর ধরে নিয়ে এসে নির্যাতন করেছিলাম এখানে। কিছুতেই অপরাধ স্বীকার করাতে পারলাম না ওকে দিয়ে। নখের ভিতর সূচ দেয়া হলো, পায়ের বুড়ো আঙুলে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দেয়া হলো ছাত থেকে, শেষকালে একটা একটা করে ভেঙে ফেলা হলো শরীরের সব কটা হাড়—মরে গেল, কিন্তু একটি কথাও বলল না লোকটা। দুদিন পরে জানতে পারলাম, লোকটা কালা ও বোবা ছিল। ভুল সন্দেহ করে ধরা হয়েছিল ওকে। সেই থেকে নির্যাতনের ওপর অভক্তি এসে গেছে আমার, নেহায়েত বাধ্য না হলে ওসবের মধ্যে যাই না। এখন বেশির ভাগ সময়ই এই কাচের ঘরটা ব্যবহার করি—দেয়ালে টাঙানো যন্ত্রপাতি ভীতি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে রেখে দিয়েছি এখনও।' হাসল উ-সেন। 'আপনাদের কাছ থেকে আমার আর কিছু জানবার নেই, কাজেই নির্যাতনের প্রয়োজনই পড়ে না। অবশ্য ফ্যান সুর কথা একটু স্বতন্ত্র। আপনাদের মত বিনা-কষ্টের মৃত্যু লাভ করার যোগ্যতা ওর নেই। এদিকে এসো, ফ্যান সু, শেষ দেখা দেখে নিই তোমাকে।'

বোকার মত ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল মিসেস গুপ্ত। উ-সেনের ইঙ্গিত পেয়ে দুপাশ থেকে দুজন প্রহরী চেপে ধরল ওর দুই হাত, টেনে নিয়ে গেল উ-সেনের কাছে। দুই হাতে ছুঁয়ে দেখল উ-সেন ওর মুখ, নাক, কপাল, চিবুক।

'বাহ্, কী সুন্দর! আমি তৈরি করেছিলাম তোমাকে, আজ নিজের হাতেই নষ্ট করে দিচ্ছি। অথচ এই অপচয়ের কোন প্রয়োজন ছিল না, ফ্যান সু। তুমি যে এমন ভাবে বিশ্বাস ভঙ্গ করবে তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি।'

'ক্ষমা চাইছি আমি, উ-সেন।'

'আমার মধ্যে ওই জিনিসটার বড়ই অভাব, ফ্যান সু। বহু কষ্টে খানিকটা সংগ্রহ করে দিয়েছিলাম তোমাকে একবার। আর ক্ষমা আমার স্টকে নেই। দুঃখিত।' হঠাৎ ঝট করে ডান হাতটা উপরে উঠল উ-সেনের, ঝিক করে উঠল হাতে ধরা ছুরি। ঘ্যাচ ঘ্যাচ করে তিনবার বুলাল সে ছুরিটা মিসেস গুপ্তের দুই গালে, কপালে। তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার বেরোল ওর কণ্ঠ থেকে। ফিনকি দিয়ে

ছুটল রক্ত। একটা চেয়ারে বসে পড়ল উ-সেন। প্রহরীদের উদ্দেশে বলল, 'ডান হাতের বুড়ো আঙুলে রশি বেঁধে টেনে তুলে দাও একে মেঝে থেকে তিন হাত ওপরে। ওই শেষ মাথায়। কাপড় খুলে নিয়ো।'

টেনে নিয়ে গেল ওরা মিসেস গুপ্তকে। নালিশের ভঙ্গিতে রানার দিকে চাইল একবার মিসেস গুপ্ত। চিরে গিয়ে ফাঁক হয়ে আছে দুই গাল আর কপালের চামড়া। এদিক ওদিক চাইল রানা। দুটো মেশিন পিস্তল তৈরি আছে ঠিক তিন হাত পিছনে। হাত কড়া লাগানো অবস্থায় কিছুই করবার উপায় নেই। যেতে যেতে পিছু ফিরে আবার চাইল মিসেস গুপ্ত রানার দিকে। বলল, 'অনেক অন্যায় করেছি। পারলে মাফ করে দিয়ো আমাকে, রানা।'

চোখ সরিয়ে নিল রানা। কথা বলে উঠল উ-সেন। জোরে জোরে বলল যাতে শুনতে পায় মিসেস গুপ্ত।

'নাইফ থ্রোয়িং প্র্যাকটিস করব একটু। এক কালে খুবই ভাল হাত ছিল, অভ্যাস নেই বহুদিন, এখন কেমন আছে কে জানে। চোখে দেখতে পাই না তো, তাই নিশ্চিত হতে পারছি না। দশটা ছুরি ছুঁড়ব আমি ওর দিকে। তার পরেও যদি ওর মৃত্যু না হয়, মাফ করে দেব আমি ওকে।'

কাচের ঘরের পাশ দিয়ে চলে গেল ওরা মিসেস গুপ্তকে নিয়ে ঘরের শেষ প্রান্তে। বুড়ো আঙুলে দড়ি পরাচ্ছে। মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে প্যাপন মং লাই, সোফিয়া দাঁড়িয়ে আছে রক্তশূন্য মুখে বাপের গা ঘেঁসে।

'কিন্তু আপনাদের এ ধরনের মধ্যযুগীয় পন্থায় হত্যা করা হবে না, মিস্টার মাসুদ রানা। সর্বাধুনিক পন্থা ব্যবহার করব আমি আপনাদের বেলায়। ওই যে কাচের ঘরটা দেখতে পাচ্ছেন—ওটা একটা বহুগুণ সম্পন্ন টর্চার কাম ডেথ চেম্বার। কাচের ঘরটা সম্পূর্ণ এয়ার টাইট। ছাতের ওপর যে হোজ পাইপের মত দেখতে পাচ্ছেন, ওটা দিয়ে কয়েক রকমের কাজ করা যায়। এই যে সুইচ প্যানেল দেখছেন,' রানা চেয়ে দেখল দেয়ালের গায়ে একটা সুইচ বোর্ডে বিশ পঁচিশটা বিভিন্ন রঙের সুইচ দেখা যাচ্ছে, 'এর একেকটা টিপে দিলে একেক রকম ফল পাওয়া যায়। একটা টিপ দিলে ঝর ঝর করে বরফের মত ঠাণ্ডা পানি নামবে ঝর্ণা থেকে, আরেকটা টিপলে নামবে ফুটন্ত গরম পানি। কাচের ঘর কানায় কানায় ভরে গেলেও একফোঁটা পানি বাইরে আসবে না। একটা বোতাম টিপলে সমস্ত পানি শুষে নেবে পাইপটা। একটা টিপলে ঘরের সমস্ত বাতাস টেনে নেবে। একটাতে ভয়ঙ্কর গ্যাস নেমে আসবে ঝাঁঝরি দিয়ে। আরেকটায় আসবে শুধু গরম বাতাস। বুঝতে পারছেন? এর একেকটা সুইচে একেক রকম শাস্তির ব্যবস্থা আছে। কাউকে ইচ্ছে করলে দিনের পর দিন কষ্ট দেয়া যায়, ইচ্ছে করলে এক সেকেন্ডে মেরে ফেলা যায়। বিশ লক্ষ টাকা খরচ করেছি আমি এটা তৈরি করতে।' প্রহরীদের উদ্দেশে গলা উঁচু করে বলল উ-সেন, 'কই, হলো তোমাদের?'

'ইয়েস, স্যার।' উত্তর দিল একজন।

বুড়ো আঙুলে বাঁধা অবস্থায় ঝুলছে মিসেস গুপ্ত। ব্যথায় নীল হয়ে গেছে মুখটা। মনে হচ্ছে যেন ব্যথার মুখোশ পরিয়ে দিয়েছে কেউ ওকে। দশটা ছুরি ধরিয়ে দিল হুয়াং উ-সেনের হাতে।

'আপনাদের তিনজনের বিরুদ্ধে আমার কোন ক্ষোভ নেই,' যেন মজার একটা গল্প বলছে, এমনি আসরী ভঙ্গিতে কথা বলে চলল উ-সেন। 'আপনাদের দুর্ভাগ্য, প্রতিদ্বন্দ্বী আপনাদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। তাই মরতে হবে আপনাদের। তবে,' সাঁই করে একটা ছুরি ছুটে গেল ওর হাত থেকে। সোজা গিয়ে বিঁধল মিসেস গুপ্তের নগ্ন বাম উরুতে। কেঁপে উঠল শরীরটা, সেই সাথে ভেসে এল তীক্ষ্ণ আর্তনাদ। তেমনি কথা বলে চলেছে উ-সেন, 'খুব অল্প সময়ে যেন মৃত্যু হয় সেদিকে লক্ষ রাখব আমি। ভাবছি, কাচ-ঘরে আটকে ক্লোরিন গ্যাস দিয়ে মারব আপনাদের। পনেরো সেকেন্ডের মধ্যেই কয়েকটা খিঁচুনি আসবে সর্বশরীরে, তারপরেই সব শেষ হয়ে যাবে।'

দ্বিতীয় ছুরিটা হাত থেকে ছুটে যেতেই রীতিমত অবাক হলো রানা। ডান উরুতে গিয়ে বিঁধেছে সেটা। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো প্রথম ছুরিটা বাম উরুর ঠিক যেখানটায় লেগেছিল, দ্বিতীয় ছুরিটা ডান উরুর ঠিক সেই জায়গাটাতেই লেগেছে। পাকা হাত উ-সেনের, খেলাচ্ছে মিসেস গুপ্তকে। আরও নিঃসন্দেহ হলো সে যখন তৃতীয় ছুরিটা সোজা গিয়ে বাম বাহুতে প্রবেশ করল। কিছু একটা করা দরকার, কিন্তু একবিন্দু অসতর্ক হচ্ছে না দুজন প্রহরীর একজনও। অসহ্য হয়ে উঠেছে মিসেস গুপ্তের চিৎকার।

'আপনি চঞ্চল হয়ে উঠেছেন, মিস্টার মাসুদ রানা। প্যাপন, তুমিও অস্থির হয়ে উঠেছ বুঝতে পারছি। তোমাদের বিশ্বাস করি না আমি। পিস্তল ধরে থাকা অবস্থাতেও যা খুশি করে বসা সম্ভব তোমাদের দ্বারা। হুয়াং...' চতুর্থ ছুরিটা গিয়ে বিঁধল ডান বাহুতে। 'টেম্প্‌টেশন থেকে এদের মুক্ত করতে পারো? কিন্তু আমি চাই নৈপুণ্য দেখিয়ে ওদের মুগ্ধ করতে, দর্শক না থাকলে খেলার মজা থাকে না।'

সাথে সাথেই উত্তর এল, 'লাইটিক দেয়া যায়।'

আশার আলো জ্বলে উঠল রানার মনে। কান খাড়া করল উ-সেনের উত্তরটা শোনার জন্যে। খুশি হয়ে উঠল উ-সেন। বলল, 'তোমার তুলনা হয় না, ডাক্তার। ভাল সমাধান বের করেছ। তাই দাও।'

পঞ্চম ছুরিটা সোজা গিয়ে ঢুকল নাভিতে। ইতোমধ্যেই রক্তে ভিজে গেছে মেঝেটা, এবার কলকল ধারায় নামল দুই পা বেয়ে। দৃশ্যটা সহ্য করতে পারছে না রানা, মাঝে মাঝে পাগলামি চাপতে চাইছে মাথায়; ইচ্ছে হচ্ছে, যা থাকে কপালে, ঝাঁপিয়ে পড়বে উ-সেনের উপর।

কিন্তু তার সুযোগ হলো না। কাচের ঘরে নিয়ে আসা হলো ওদের। এক দৌড়ে গিয়ে নিয়ে এসেছে স্যুই থি মিসেস গুপ্তের কসমেটিক কেসের ভিতরের সেই ছোট্ট বাক্সটা। সবার অলক্ষ্যে বার দুই চোখ টিপল রানা সোফিয়া ও প্যাপন মং লাইকে উদ্দেশ্য করে। কিছু বুঝতে পারল কিনা বোঝা গেল না

ওদের মুখ দেখে।

রানাকেই প্রথম দেয়া হলো ইঞ্জেকশন। দশ সেকেন্ডের মধ্যেই এলিয়ে পড়ল রানার শরীর। টেনে নিয়ে দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসিয়ে দেয়া হলো ওকে। এবার সূচ ফুটানো হলো সোফিয়ার শিরদাঁড়ায়। উৎকণ্ঠিত রানা চোখের সামনে দেখতে পেল কিভাবে এলিয়ে পড়ছে সোফিয়া। ঠিক একই ভাবে এলিয়ে পড়ল প্যাপন মং লাই। বিরাট একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা। রানার পাশে সার বেঁধে বসানো হলো ওদের দুজনকে। এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে মিসেস গুপ্তকে। দুই স্তনে বিঁধে আছে দুটো ছুরি। অষ্টম ছুরিটা বিঁধল গিয়ে গলায় কণ্ঠার হাড় সংলগ্ন গোল গর্তটায়। নবম ছুরি সোজা গিয়ে ঢুকল হৃৎপিণ্ডে। দশম ছুরিটা শরীরের কোথাও লাগল না, ডান হাতের বুড়ো আঙুলের ঠিক এক ইঞ্চি উপরে কুচ করে রশিটা কেটে দিয়ে খটাং করে লাগল গিয়ে দেয়ালে। ধড়াস করে মেঝের উপর পড়ল মিসেস গুপ্ত—মৃত।

শব্দটা শুনেই উঠে দাঁড়াল উ-সেন মুখে একগাল হাসি নিয়ে। বলল, 'যদি এর পরেও বেঁচে থাকে, তাহলে মাফ করে দেব আমি ওকে। কেউ কোন কথা বলছে না কেন? ডাক্তার, রেজাল্টটা জানাবে না আমাকে?'

'ডেড।' পরীক্ষা না করেই উত্তর দিল হুয়াং।

'গুড। এইবার বাকি তিনজন। তাই না?' কাচের ঘরে এসে ঢুকল উ-সেন। 'ভয় নেই, মিস্টার মাসুদ রানা পনেরো সেকেন্ডের মধ্যে মৃত্যু ঘটবে আপনাদের।'

কাচের বলটা তুলে নিল উ-সেন মিসেস গুপ্তের ছোট্ট বাক্স থেকে। বলল, 'এই বলটা ফাটিয়ে দেব আমি এঘরের ভিতর। সাথে সাথেই বন্ধ করে দেয়া হবে এয়ার টাইট দরজাটা। যদি ভগবানে বিশ্বাস থাকে ডেকে নিন আধ মিনিটের ভিতর। ডাক্তার, ওদের হাতকড়া খুলে দাও। লাইটিকের পর আবার হাতকড়ার কি দরকার?'

চোখের তারা স্থির থাকছে না রানার। তবু লক্ষ করল, হুয়াং-এর মুখে কোন সন্দেহের ছায়া পড়ে কিনা। না। হাতকড়া খুলে দিয়েই সরে গেল সে দরজার কাছে। বড় করে দম নিল রানা।

'ভগবান আপনাদের মঙ্গল করুন।' দরজার ফাঁকটা ছোট করে এনেছে উ-সেন।

সাঁই করে ছুটে এল কাচের বলটা। ঝন ঝন করে ভেঙে গেল রানার মাথার ঠিক এক হাত উপরে, দেয়ালে লেগে।

খটাং করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। ক্লিক করে শব্দ হলো হ্যান্ডেল তোলার।

নয়

ক্লোরিন গ্যাসে মৃত্যু সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না রানার। দম বন্ধ করে পড়ে রইল সে ঝাড়া পনেরো সেকেন্ড। তারপর হঠাৎ প্রবল ভাবে কেঁপে উঠল ওর সর্বশরীর। বার দুয়েক কেঁপে উঠেই স্থির হয়ে গেল রানা। চোখ দুটো স্থির হয়ে চেয়ে রয়েছে ছাতের দিকে।

এতক্ষণ বুকটা ওঠা নামা করছিল, থেমে গেছে সেটাও। বাপ-বেটির অবস্থাও তথৈবচ।

আরও পনেরো সেকেন্ড পর নড়ে উঠল দর্শকরা। দুই একটা কথা বলল নিজেদের মধ্যে, তারপর রওনা হলো দরজার দিকে। একে একে বেরিয়ে গেল সব কজন। বন্ধ হয়ে গেল দরজা, ভারী বল্টু লেগে গেল বাইরে থেকে ঘটাং করে।

তড়াক করে উঠে দাঁড়াল রানা। উঠে বসল প্যাপন মং লাই এবং সোফিয়াও—সবাই দম বন্ধ করে রেখেছে। দরজাটার এপাশে কোন হ্যান্ডেল নেই। ধাক্কা দিয়ে দেখল রানা, বাইরে থেকে বন্ধ। এক ইঞ্চি পুরু কাচ কি লাথি দিয়ে ভাঙা যাবে? তাই চেষ্টা করে দেখতে হবে। এছাড়া আর কোন পথ নেই এখান থেকে বেরোবার।

দড়াম করে লাথি মারল রানা। খানিকটা বাতাস বেরিয়ে গেল মুখ থেকে। অভ্যাস বশে শ্বাস টানতে গিয়েও সামলে নিল সে। এখন এই ঘরে একবার শ্বাস নেয়া মানেই নিশ্চিত মৃত্যু। আবার লাথি মারল রানা দরজার গায়ে। একবিন্দুও চিড় ধরল না কাচের গায়ে। অনেক চাপ সহ্য করবার উপযোগী করে তৈরি করা হয়েছে এই কাচ, সহজে ভাঙবে না।

উঠে এল প্যাপন মং লাই। সোফিয়াও এল। তিনজন মিলে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে কাঁধ দিয়ে ধাক্কা দিল একসাথে। এবার কেঁপে উঠল দরজাটা। দ্বিগুণ উৎসাহে আবার ধাক্কা দিল তিনজন একসাথে। আবার একটু কেঁপে উঠল দরজাটা। তার বেশি কিছুই নয়।

এক মিনিট পার হয়ে গেছে। চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠেছে সোফিয়ার। আর বেশিক্ষণ দম আটকে রাখা সম্ভব হবে না ওর পক্ষে। কপালে এক আধটা শিরা দেখা দিতে শুরু করেছে।

দ্রুত চিন্তা চলছে রানার মাথায়। যে করে হোক বেরোতে হবে এখান থেকে আধ মিনিটের মধ্যে।

ঝটপট জুতো খুলে ফেলল রানা। স্টীলের পাত বসানো জুতোর একটা ধরিয়ে দিল প্যাপন মং লাইয়ের হাতে, অপরটা দিয়ে হাতুড়ির মত খটাখট মারতে শুরু করল কাচের গায়ে—ঠিক যেখানটায় হ্যান্ডেল দেখা যাচ্ছে তার

ছয় ইঞ্চি উপরে।

ছোট ছোট কাচের চিলতে উঠতে শুরু করল এবার। কামারের দোকানে যেভাবে দু'জন মিলে হাতুড়ি চালায় ঠিক তেমনি একবার রানা, একবার প্যাপন মং লাই জুতো মেরে চলল কাচের গায়ে দ্রুত বেগে। পনেরো সেকেন্ডের মধ্যেই হাত গলাবার মত ফাঁক হয়ে গেল এক ইঞ্চি পুরু কাচ। হাত গলিয়ে দিয়েই হ্যান্ডেলে চাপ দিল রানা। খুলে গেল দরজা।

ছুটল রানা সুইচ বোর্ডের দিকে। ইশারা করে নিষেধ করল যেন কেউ শ্বাস না নেয়। কাচ-ঘরের দরজা লাগিয়ে দিয়েছে ওরা বেরিয়েই, কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে গ্যাস নিশ্চয়ই বেরিয়ে এসেছে এই ঘরে।

একটার পর একটা সুইচ টিপতে শুরু করল রানা। প্রথমটাতে ঝর ঝর করে পানি পড়তে শুরু করল, দুই নম্বরে নামতে শুরু করল পাইপটা নিচের দিকে হাতীর শুঁড়ের মত। তৃতীয়টাতে যথাস্থানে ফিরে গেল পাইপটা। চতুর্থটাতে আবার পানি, পঞ্চমটাতে নেমে আসছে শুঁড়, ষষ্ঠতে আবার উঠে গেল সেটা। অনেকটা বুঝে ফেলেছে রানা। সপ্তম বোতাম টিপতেই ধোঁয়ার মত গ্যাস বেরোতে শুরু করল ঝাঁঝরি দিয়ে, তিন সেকেন্ড পর ওটা বন্ধ করে পাশেরটা টিপল রানা। অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ধোঁয়াটা।

এতক্ষণে ফিরল রানা বাপ-বেটির দিকে। দেখল, সোফিয়ার নাক-মুখ টিপে ধরে আছে প্যাপন মং লাই। ছটফট করছে সোফিয়া, চোখ দুটো বিস্ফারিত। গলায়, কপালে নীল শিরা দপ দপ করে লাফাচ্ছে। শ্বাস নেয়ার জন্যে রীতিমত কুস্তি করছে সে, প্রাণপণ শক্তিতে একহাতে চেপে ধরে আছে ওকে প্যাপন মং লাই, অন্য হাতে টিপে ধরে আছে নাক-মুখ, কিছুতেই শ্বাস নিতে দেবে না। প্যাপনের নিজের অবস্থাও কাহিল হয়ে এসেছে, টকটকে লাল হয়ে গেছে চোখ দুটো।

একছুটে গিয়ে কাচ-ঘরের দরজাটা খুলে দিল রানা। আর দম আটকে রাখা যাচ্ছে না। কতক্ষণ লাগবে এই হারামী গ্যাসের বের হতে? আর তো থাকতে পারছে না।

আরও পনেরো সেকেন্ড কাটল।

ছটফটানি কমে আসছে সোফিয়ার। আর কিছুক্ষণ নাক-মুখ টিপে ধরে রাখলে শ্বাস নেয়ার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে বেচারীর চিরতরে। ভুশ করে শ্বাস ছাড়ল রানা, সেই সাথে ইঙ্গিত করল প্যাপন মং লাইকে। তিনজনই ফুঁপিয়ে উঠল একসাথে। দুনিয়ার সব বাতাস একবারে টেনে নিতে চাইছে ওদের ফুসফুস। বার কয়েক শ্বাস নিয়েই ফুঁপিয়ে উঠল সোফিয়া। এত কষ্ট বোধহয় জীবনে পায়নি কখনও ও।

বেঁচে থাকার আনন্দে পাগলের মত হাসতে শুরু করল প্যাপন মং লাই, দুই হাতে রানাকে জড়িয়ে ধরে পচাং পচাং চুমো খেয়ে ফেলল দশ বারোটা। ধেই ধেই করে নাচল কিছুক্ষণ, তারপর জড়িয়ে ধরে আদর শুরু করল সোফিয়াকে।

প্রাণ ভরে শ্বাস নিল রানা। এক মিনিট পার হয়ে গেছে, তবু যখন মারা গেল না, তখন বুঝতে পারল বিষাক্ত গ্যাস বেরিয়ে গেছে, আর ভয়ের কিছু নেই। অন্তত গ্যাসের ভয় নেই আর। মিসেস গুপ্তের মৃতদেহের কাছে গিয়ে দাঁড়াল রানা। পিছু পিছু এল বাপ-বেটি। সংক্ষিপ্ত পরীক্ষা করে নিশ্চিত হলো রানা, মারা গেছে মিসেস গুপ্ত। অসহায় ভঙ্গিতে একরাশ রক্তের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। নিজেকে নিজের হাত থেকে উদ্ধার করা হলো না আর ওর। মনে মনে ক্ষমা করে দিল রানা ওকে।

ঘটাং করে বল্টু খোলার শব্দে চমকে উঠল তিনজন একসাথে। খুলে যাচ্ছে দরজাটা। বোতাম টিপে গ্যাস বের করে দিয়ে লাশগুলোর সৎকারের ব্যবস্থা করতে এসেছে কেউ।

দুই সেকেন্ডের মধ্যেই কয়েক লাফে পৌঁছে গেল রানা দরজার কাছে।

আক্রমণের জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিল না লোকটা। মেশিন পিস্তল বের করবার সুযোগ পেল না, কি ঘটছে টের পাওয়ার আগেই জ্ঞান হারাল নাকের উপর একটা প্রচণ্ড ঘুষি এবং ঘাড়ের উপর একটা তীব্র জুডো চপ খেয়ে। ওকে ছেড়ে দিয়ে দ্বিতীয় জনের দিকে ফিরল রানা। পালোয়ানী চেহারা লোকটার।

বিস্ফারিত দুই চোখে অবিশ্বাস নিয়ে চেয়ে ছিল দ্বিতীয় প্রহরী রানার দিকে। রানাকে ওর দিকে ফিরতে দেখে সংবিৎ ফিরে পেল। চট করে হাত চলে গেল কোমরে ঝুলানো মেশিন পিস্তলের বাঁটে।

কলার ধরে এক হ্যাঁচকা টানে ঘরের ভিতর নিয়ে এল রানা ওকে। ততক্ষণে বিস্ময় কাটিয়ে উঠে সামলে নিয়েছে দ্বিতীয় প্রহরী। একহাতে রানার কব্জি চেপে ধরল লোকটা, টান দিয়ে কলার থেকে ছাড়াবার চেষ্টা করছে রানার হাত। অপর হাতে চলে এসেছে মেশিন পিস্তল। দড়াম করে থুতনি বরাবর ঘুষি মারল রানা। টলে উঠল ঠিকই, কিন্তু কাবু হলো না লোকটা, পিছন দিকে একটা ঝটকা দিয়েই লাফ দিল সামনের দিকে। কলার ছেড়ে, বাম হাতে জুডো চপ মারল রানা মেশিন পিস্তল ধরা হাতে, কব্জি থেকে আট ইঞ্চি উপরে নরম পেশীর ভিতরের নার্ভ সেন্টার লক্ষ করে। ছিটকে হাত থেকে পড়ে গেল মেশিন পিস্তলটা, কিন্তু হুড়মুড় করে পড়ে গেল রানাও। রানার বুকের উপর পড়ল লোকটা। পড়েই দমাদম ঘুষি মারল কয়েকটা।

পা দুটো বাঁকিয়ে এনে লোকটার গলায় বাধিয়ে জোরে একটা চাপ দিল রানা। ডিগবাজি খেয়ে সরে গেল লোকটা রানার বুকের উপর থেকে। তড়াক করে উঠে দাঁড়াল দু'জনই। ঝাঁপিয়ে পড়ল পরস্পরের উপর। এক সেকেন্ডের মধ্যে দড়াম করে মেঝের উপর আছাড় মারল লোকটা রানাকে। রানা টের পেল, কেবল অত্যন্ত শক্তিশালীই নয়, জ্যুজুৎসুর এক্স্পার্ট লোকটা। রানার তুলনায় অনেক বেশি জ্ঞান রাখে সে আন্-আর্মড্ কম্ব্যাট সম্পর্কে। মেশিন পিস্তলের দিকে এক পা বাড়াতেই লাথি চালাল রানা ওর পায়ে। পড়ে গেল সেও। উড়ে গিয়ে পড়ল রানা ওর উপর। আধ মিনিটের মধ্যে ক্ষত বিক্ষত হয়ে

গেল দু'জনই, কিন্তু কেউ কাউকে কাবু করতে পারল না। খটাশ করে লাথি পড়ল লোকটার নাকের উপর। এতক্ষণে লক্ষ করল সে প্যাপন মং লাই এবং সোফিয়ার উপস্থিতি। নিশ্চিত পরাজয় টের পেয়ে লাফিয়ে উঠে দরজার দিকে ছুটল সে। দুই হাতে চুলের মুঠি ধরে ঝুলে পড়ল সোফিয়া। রানা উঠে দাঁড়াবার আগেই সোফিয়াকে ঝুলন্ত অবস্থাতেই ছেঁচড়ে টেনে নিয়ে চলে গেল সে সুইচ বোর্ডের কাছে। মেশিন পিস্তলের বাট দিয়ে মারল রানা লোকটার মাথার পিছনে। কিন্তু ততক্ষণে টিপে দিয়েছে সে অ্যালার্ম বেল। পরিষ্কার শুনতে পেল ওরা শব্দটা। ক্রিং ক্রিং বেজে চলেছে অ্যালার্ম। ঢলে পড়ে গেল দ্বিতীয় প্রহরীর জ্ঞানহীন দেহ।

অ্যালার্ম সুইচটা অফ করে দিল রানা।

'এইটা ধরো।' মেশিন পিস্তলটা সোফিয়ার হাতে ধরিয়ে দিয়ে প্রথম প্রহরীর মেশিন পিস্তল বের করে নিল রানা ওর কোমর থেকে। এগিয়ে ধরল প্যাপন মং লাইয়ের দিকে। 'আপনি ধরুন এইটা।'

মাথা নাড়ল বৃদ্ধ হাসি মুখে। বাম হাতে ধরা গোটা পাঁচেক ছুরি দেখাল। মিসেস গুপ্তের শরীর থেকে খুলে নিয়েছে। 'ওটা তুমি রাখো, ওসবের বিচ্ছিরি শব্দ আমার পছন্দ হয় না।' হঠাৎ গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করল, 'এবার? কিভাবে বেরোবে এখান থেকে? বিপদ টের পেয়ে গেছে সবাই।'

'আসুন আমার সাথে।' বলেই এগোল রানা। 'ওরা এখনও জানে না কি ধরনের বিপদ উপস্থিত হয়েছে। সেটা বুঝে ওঠার আগেই আমাদের সারতে হবে সব কাজ।' কয়েকটা করিডর পেরিয়ে একটা হলরুমে ঢুকল ওরা। 'এত বিরাট দালানে লিফট ছাড়াও অন্তত তিন চারটে সিঁড়ি থাকার কথা। লিফট ব্যবহার করব না আমরা। এদের কতজন লোক আছে এখানে?'

চলতে চলতেই উত্তর দিল প্যাপন মং লাই, 'পনেরো বিশজনের বেশি না।'

'আমরা যাকে সামনে পাব গুলি করব। কিন্তু কেউ নিচের তলার দিকে পালাবার চেষ্টা করলে পিছু ধাওয়া করব না। আমাদের চেষ্টা হবে যত দ্রুত সম্ভব ছাতে পৌঁছানো, উপর দিকে উঠবার চেষ্টা করব আমরা। বিচ্ছিন্ন ভাবে। তিনজন একসাথে যেন ধরা না পড়ি সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। সোফিয়া, তুমি এইখানে দাঁড়াও। এই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে শুরু করবে তিন মিনিট পর।'

'ওপরে কেন?'

'আহ্-হা! প্রশ্ন কোরো না সোফিয়া,' বকা দিল প্যাপন মং লাই। 'আদেশ পালন করো। সময় নেই হাতে।' রানার দিকে ফিরল, 'আমি যাব কোন্ দিকে?'

'চলুন এগোই।'

একটা অপেক্ষাকৃত সরু সিঁড়ির কাছাকাছি অন্ধকার ছায়ায় প্যাপন মং লাইকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে প্রকাণ্ড ড্রইংরুমে এসে ঢুকল রানা। ও জানে, মূল সিঁড়িটা এবং লিফটের দিকে নজর রাখতে পারবে সে এখান থেকে।

একমিনিটের মধ্যেই পায়ের শব্দ শুনতে পেল রানা।

'কি হলো, ডাক্তার, অ্যালার্ম বেল বাজাল কে?' উ-সেনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল উপর থেকে।

'বেল টেপা হয়েছে টর্চার চেম্বার থেকে,' হুয়াং-এর উত্তর শোনা গেল। 'আমি দেখছি, তুমি থাকো।'

'ঠিক আছে, আমি বরং নিচ তলার সবাইকে সাবধান করে দিই। কিন্তু···কি ঘটতে পারে টর্চার চেম্বারে···' কণ্ঠস্বরটা মিলিয়ে গেল।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে হুয়াং, হাতে পিস্তল। প্রহরীদের নাম ধরে ডাকল হুয়াং, কেউ কোন জবাব দিল না। হঠাৎ একটা আর্তনাদ শোনা গেল প্যাপন মং লাইয়ের এলাকা থেকে। মাঝ সিঁড়িতে থমকে দাঁড়াল হুয়াং।

পিছন দিকে জেনারেলের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল রানা। 'কিয়া বাত, শেখ? চিল্লাতা কওন?' লিফ্‌টের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল দু'জন। এইদিকেই আসছে। ঘরে ঢুকে পিস্তলধারী হুয়াংকে দেখে থমকে গেল।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল রানা।

মৃত রানাকে চোখের সামনে দেখেই চক্ষুস্থির হয়ে গেল ওদের। আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হয়ে গেল মেশিন পিস্তল দেখে। আতঙ্কে বিকৃত হয়ে গেছে চোখ মুখ।

বুম করে পিস্তলের আওয়াজ হলো। থ্রী পয়েন্ট ফাইভ লেন্সের চশমার ভিতর দিয়ে রানাকে দেখতে পেয়েছে হুয়াং। বিস্ময় কাটিয়ে উঠতে তিন সেকেন্ডের বেশি সময় লাগেনি ওর। মাঝ সিঁড়িতে দাঁড়িয়েই গুলি করেছে সে। লোকটার চিন্তার দ্রুততা সত্যিই বিস্ময়কর, কিন্তু হাতের টিপ তেমনি খারাপ। রানার দিকে তাক করে ছোঁড়া ছয়টা গুলি ইতোমধ্যেই মিস করেছে সে রেঙ্গুনে, সপ্তমটাও মিস হয়ে গেল। লক্ষ্যভ্রষ্ট গুলিটা সোজা গিয়ে ঢুকল জেনারেল এহতেশামের হৃৎপিণ্ডে।

ঝট্ করে ঘুরেই গুলি করল রানা। একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরোল ডক্টর হুয়াং-এর কণ্ঠ থেকে। কিন্তু আহত হলো না নিহত বুঝতে পারল না রানা। দপ করে নিভে গেল সমস্ত বাতি। খট খট করে কয়েক সিঁড়ি নামল হুয়াং-এর পিস্তলটা। ওটা থেমে যেতেই নিস্তব্ধ হয়ে গেল চারদিক। কর্নেল শেখের অবস্থান লক্ষ্য করে আবার একঝাঁক গুলি বর্ষণ করল রানা। কাচের দরজাটা চুর করে দিয়ে বেরিয়ে গেল গুলিগুলো। কর্নেল শেখ সরে গেছে। রানাও সরে গেল কয়েক পা।

নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া কিছুই শুনতে পাচ্ছে না রানা। আশপাশেই কোথাও রয়েছে কর্নেল শেখ, কিন্তু কোথায় আছে বোঝার উপায় নেই। আরও কয়েক পা সরে গিয়ে অন্ধকার হাতড়ে একটা চেয়ার পেল রানা। চেয়ারের পাশেই টেবিল, টেবিলের উপর অ্যাশট্রে। বাম হাতে তুলে নিল রানা অ্যাশট্রেটা।

এমনি সময়ে কড়কড় শব্দে গর্জে উঠল মেশিন পিস্তল সোফিয়ার এলাকা থেকে। আর্ত চিৎকার শুনতে পেল রানা পুরুষ কণ্ঠে। আবার চুপ।

অ্যাশট্রেটা ছুঁড়ে দিল রানা হাত দশেক দূরে। 'বুম' গুলি হলো রানার বাম পাশ থেকে। আগুনের হল্কা দেখেই গুলি করল রানা। 'উফ্' শুনতে পেল রানা, তারপরই দুড়দাড় পায়ের শব্দ। ভাগছে কর্নেল শেখ। পায়ের শব্দ লক্ষ্য করে ট্রিগারে চাপ দিল রানা। একটি গুলিও বেরোল না। গুলি শেষ। দেয়ালের গায়ে খড় খড় শব্দ হলো, তারপর উ-সেনের কণ্ঠস্বর ভেসে এল লাউড স্পীকারে।

'মিস্টার মাসুদ রানা! গ্যাস চেম্বার থেকে কিভাবে বাঁচলেন বুঝতে পারছি না। কিন্তু এইবার প্রস্তুত হয়ে যান মৃত্যুর জন্যে। কিছুতেই নিস্তার নাই আপনার। নেমে আসছি আমি এখুনি। অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাবেন না আপনি, কিন্তু আমি ঠিকই দেখতে পাব। আমার কাছে দিন আর রাতে, আলো আর অন্ধকারে কোন প্রভেদ নেই। নিন রক্ষা করুন নিজেকে।'

দপ করে একবার জ্বলে উঠেই নিভে গেল আবার সমস্ত বাতি। অন্ধকার আরও ঘন হয়ে এল উজ্জ্বল আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ায়। আবার শোনা গেল উ-সেনের গলা। এবার আর লাউড স্পীকারে নয়, নিজস্ব গমগমে কণ্ঠস্বরে বলল, 'আপনার বিশ হাত পিছনে আছি আমি, মিস্টার মাসুদ রানা। আমার হাতে রয়েছে দশটা থ্রোয়িং নাইফ। পালাবার উপায় নেই, বাঁচবার চেষ্টা বৃথা, তবু চেষ্টা করে দেখুন।'

কথাটা পুরোপুরি বিশ্বাস করল না রানা। কারণ হুয়াং যে সিঁড়ি দিয়ে নামছিল সেখানে আবছা একটা পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছে সে। আন্দাজের উপর নির্ভর করে মেশিন পিস্তলটা ছুঁড়ে মারল সে মাঝ সিঁড়ি বরাবর। ঠাশ করে লাগল ওটা গিয়ে কোন নরম বস্তুর গায়ে। লাথি খাওয়া কুকুরের মত কেঁউ করে উঠল স্যুই থি।

'স্যুই, তুমি এ সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়েছিলে কেন?' ধমকের সুরে বলল উ-সেন। 'লোইকা মারা গেছে। কাজেই ছাতে গিয়ে লাভ নেই। পিছন দিকের লিফ্টে করে সোজা কার পার্কে নেমে যাও।'

এক লাফে একটা সোফার আড়ালে গিয়ে বসে পড়ল রানা। বোঁ করে কানের এক ইঞ্চি দূর দিয়ে গিয়ে ঘ্যাচ করে সোফার গায়ে বিঁধল একটা ছুরি। চমকে উঠল রানা। হা হা করে হেসে উঠল উ-সেন রানার পিছন থেকে। ছুরিটা টান দিয়ে বের করে নিয়ে একলাফে সোফার ওপাশে চলে এল রানা।

'আমি ভেন্ট্রিলোকুইজ্‌ম্ জানি, মিস্টার মাসুদ রানা। ব্যাপারটা আপনার জানা ছিল না বলে প্রথম সুযোগে মারলাম না। সেটা ছাগল জবাই করার মত সহজ কাজ হত।'

কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে সাঁই করে ছুঁড়ল রানা ছুরিটা। আবার হেসে উঠল উ-সেন।

'সরে গেছি আমি ওখান থেকে। ঠিক যেখান থেকে আমার গলার আওয়াজ পাচ্ছেন, সেখানে আমি নেই। নিন, বাম হাতটা সামলান।'

অত্যন্ত দ্রুত সরিয়ে নিল রানা বাম হাতটা, তবু ঘ্যাঁচ করে খানিকটা চামড়া চিরে দিয়ে বেরিয়ে গেল ছুরিটা। 'উফ্' বলেই এক লাফে সরে গেল রানা পাঁচ হাত দূরে। একটা চেয়ারে পা বেধে পড়ে গেল মাটিতে। চেয়ার সহ উঠে দাঁড়াল সে চেয়ারের সীট দিয়ে বুকটা আড়াল করে।

'বাহ্!' প্রশংসা করল উ-সেন। 'আপনার রিফ্লেক্স তো দারুণ! এত দ্রুত রিঅ্যাক্ট করতে দেখিনি আমি আর কাউকে। নইলে ছুরিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হত না কিছুতেই। কিন্তু চেয়ার দিয়ে আড়াল করলে কি বাঁচতে পারবেন? ধরতে গেলে আমি আপনার চতুর্দিকেই আছি। এখন…'

রানা বুঝল, কথা বলতে বলতে হয় ডান দিক নয় বাম দিক দিয়ে ওর পিছনে চলে যাচ্ছে উ-সেন পরিষ্কার টার্গেট পাওয়ার জন্যে। রীতিমত ভয় পেয়েছে রানা। অশরীরী আত্মার মত মনে হচ্ছে উ-সেনকে। কোন্ দিক থেকে ছুটে আসবে মৃত্যুবাণ বুঝবার উপায় নেই। পাগলের মত ছুটল সে বাম দিক লক্ষ্য করে। ঘরের আসবাব কোথায় কি ছিল সব গুলিয়ে গেছে মাথার মধ্যে। শেয়ালের তাড়া খাওয়া মুরগীর অবস্থা হয়েছে ওর। একটা চেয়ারে হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল সে ডাইনিং টেবিলের উপর, টেবিল উল্টে হুড়মুড় করে মাটিতে। ঝনঝন করে কয়েকটা কাপ তস্তরী গ্লাস ছুরি কাঁটা চামচ পড়ল মাটিতে।

মেঝে হাতড়িয়ে একটা কাঁটা চামচ তুলে নিয়েই ছুঁড়ল রানা ডান দিকে, উ-সেনের সম্ভাব্য অবস্থান লক্ষ্য করে।

'চেষ্টা করলে আপনিও ভাল নাইফ থ্রোয়ার হতে পারতেন, মিস্টার মাসুদ রানা,' বলল উ-সেন। 'কাঁটা চামচটা এসে ঠিক আমার বাম হাতে লেগেছে।'

কণ্ঠস্বর ভেসে এল রানা যেদিকে চামচ ছুঁড়েছিল ঠিক সেদিক থেকেই। রানা বুঝল ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করছে উ-সেন মিথ্যে বলে। কিন্তু কোনটাকে যে সত্য বলে ধরবে তাও ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না সে। বুদ্ধির উপর নির্ভর না করে নিজের অবচেতন মনের নির্দেশ মেনে চলাই স্থির করল সে। এঁকে বেঁকে ছুটল সিঁড়ির দিকে।

বাম বগলের নিচে দিয়ে কোট ফুটো করে ঢুকল একটা ছুরি। মরণ চিৎকার দিল রানা গলা ফাটিয়ে। হুমড়ি খেয়ে পড়ল সিঁড়ির উপর। পাগলের মত খুঁজছে ডক্টর হুয়াং-এর পিস্তলটা।

পঞ্চম ধাপে পাওয়া গেল পিস্তলটা। কোন লক্ষ্যই নেই, কাজেই লক্ষ্যস্থির করার প্রশ্ন ওঠে না। চেয়ারটা সামনে বাগিয়ে ধরে যেদিক খুশি গুলি করল রানা পরপর পাঁচবার। শেষ গুলিটা বেরোবার সাথে সাথেই ডান দিক থেকে আওয়াজ এল, 'আ-উফ্!' সত্যিকার আর্তনাদ চিনতে ভুল হলো না রানার। একলাফে উঠে দাঁড়াল। প্রচণ্ড বেগে ছুঁড়ে মারল খালি পিস্তলটা শব্দের উৎস লক্ষ্য করে। ঠুস করে কাচ ভাঙার শব্দ পেয়েই আনন্দে লাফিয়ে উঠল রানার

হৃদয়। একটানে বগল তলা থেকে ছুরিটা বের ক'র নিয়ে মারল একই দিকে। খটাশ করে দেয়ালে গিয়ে লাগল ছুরিটা। সরে গেছে উ-সেন।

পাগলের মত অন্ধকারে খুঁজল রানা উ-সেনকে। কোথাও নেই। লিফটের কাছে কিসের শব্দ শুনে সেদিকে রওনা হতে যাচ্ছিল রানা, এমনি সময় দপ করে জ্বলে উঠল সব ক'টা বাতি একসাথে। প্রথম কয়েক সেকেন্ড কিচ্ছু দেখতে পেল না রানা। আলোটা সহ্য হয়ে আসতেই দেখতে পেল লিফটের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে উ-সেন। চশমা নেই চোখে। বুকের ডান দিকে লেগেছিল রানার পঞ্চম গুলিটা। লাল হয়ে গেছে সাদা শার্ট রক্তে ভিজে।

স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল রানা উ-সেনের রক্তে ভেজা শার্টের দিকে। নিজের বাম হাতের দিকে চাইল একবার। টপ টপ করে রক্ত ঝরছে। অদ্ভুত একটা উপলব্ধি এল ওর মধ্যে। কোনও প্রভেদ নেই! বিউটি কুইনের রক্তের সাথে ওর নিজের রক্তের রঙে কোন প্রভেদ নেই। লাল। গায়ের রঙ, জাতি, ধর্ম, পেশা, ইত্যাদির প্রভেদ থাকতে পারে; কিন্তু বিউটি কুইনের হত্যাকারী ইয়েন ফ্যাঙ, ইয়েন ফ্যাঙের হত্যাকারী মিসেস গুপ্ত, মিসেস গুপ্তের হত্যাকারী উ-সেন, সবার রক্তের রঙ লাল। ওর নিজেরও। তবু এই হানাহানি, ইচ্ছের লড়াই, স্বার্থের দ্বন্দ্ব, আর রক্তপাত! এ থেকে কি মুক্তি নেই মানুষের?

ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে লিফ্‌টের দরজা। একটা গমগমে কণ্ঠ শুনতে পেল রানা।

'মাসুদ রানা। তুমি মস্ত ক্ষতি করলে আমার। পৃথিবীর যেখানেই থাকো, যত সাবধানেই থাকো, বাঁচতে পারবে না তুমি আমার হাত থেকে। প্রস্তুত থেকো, আজ হোক, কাল হোক, দশবছর পরে হোক—প্রতিশোধ নেব আমি।'

বন্ধ হয়ে গেল লিফ্‌টের দরজা।

জেনারেল এহতেশাম এবং হুয়াং কির লাশ ডিঙিয়ে ছুটল রানা ছাতের দিকে।

দশ

'উঠে পড়ো। জলদি!'

প্যাপন মং লাই উঠে গেছে আগেই। কো-পাইলটের সীটে ঠেলে সোফিয়াকে তুলে দিয়ে ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল রানা। চালু হয়ে গেল ইঞ্জিন।

বৃষ্টি থেমে গেছে বেশ অনেকক্ষণ হলো। মিট মিট করছে অসংখ্য তারা। উত্তর দিগন্তে বিলীয়মান মেঘের গায়ে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে থেকে থেকে। পরিষ্কার আকাশ পেয়ে খুশি হলো রানা।

রোটর ব্রেক ছেড়ে দিয়ে পিচ কন্ট্রোলের থ্রটল ঘোরাতেই ঘুরতে শুরু করল মাথার উপর প্রকাণ্ড ফ্যানটা। এবার হুইল ব্রেক ছেড়ে পিচ লিভারটা উপরে টেনে আরও খানিক থ্রটল ঘুরাল রানা। রোটর স্পীড ইন্ডিকেটরে এখন লাল কাঁটাটা টু হানড্রেড আর.পি.এম. শো করছে।

দড়াম করে খুলে গেল ছাতের দরজা। স্টেনগান হাতে চারজন প্রহরী এসে দাঁড়িয়েছে ছাতে। শূন্যে উঠে গেছে হেলিকপ্টার। এখন গুলি করলে ওদেরই ঘাড়ের উপর এসে পড়বে কিনা ভেবে একটু ইতস্তত করল ওরা। কয়েক সেকেন্ড দেরি হয়ে গেল সিদ্ধান্ত নিতে।

থ্রটল ঘুরাল রানা আরও খানিকটা, সেই সাথে জয়স্টিকটা সামনে ঠেলে দিয়েই রাডার পেডালে রাখল ডান পা। কোনাকুনি ভাবে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে উঠে গেল হেলিকপ্টার। প্রহরী চারজন যখন গুলি করল তখন গুলি করা না করা সমান কথা। হাঁ করে চেয়ে রইল ওরা পশ্চিম আকাশে অপসৃয়মাণ লাল বাতির দিকে।

ঝাড়া তিনশো মাইল পশ্চিমে যেতে হবে। দুই ঘণ্টার ব্যাপার। ফুল-স্পীডে প্রকাণ্ড গংগা-ফড়িংটা উড়িয়ে দিয়ে পাশ ফিরে হাসল রানা সোফিয়ার দিকে চেয়ে।

'কয়টা মারলে?'

'দুটো। তুমি?'

'আমি একটা।'

'আমি ফার্স্ট!' পিছন থেকে বলে উঠল প্যাপন মং লাই। 'আমি মেরেছি তিনটে।' প্রকাণ্ড এক চুরুট বের করে এগিয়ে দিল রানার দিকে। নিজেও দাঁতের ফাঁকে কামড়ে ধরল একটা। 'অবশ্য লীডার না থাকলে এতক্ষণে স্বর্গের দুয়ারে পৌঁছে যেতাম। সমস্ত ক্রেডিট পাইলট সাহেবের। এখানে ধরানো যাবে তো?'

'খুব যাবে।'

চুরুট ধরিয়ে আরাম করে বসল রানা। ক্লান্তিতে ভেঙে আসতে চাইছে শরীরটা। চোখ দুটো বুজে আসতে চাইছে। হঠাৎ রানার হাতের দিকে চেয়েই আঁতকে উঠল সোফিয়া। কোটের হাতা বেয়ে টপ টপ করে রক্ত ঝরছে। কোট খুলে দেখা গেল ক্ষতটা অগভীর, কিন্তু রক্ত বন্ধ হয়নি এখনও। রুমাল দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দিল সোফিয়া, তারপর বলল, 'এখন চলেছি কোথায়?'

'তোমাদের নামিয়ে দিয়ে ইয়ট নিয়ে দেশে চলে যাব।'

'সে কি! কদিন থাকবে না আমাদের ওখানে?' চোখ কপালে তুলল প্যাপন মং লাই। 'আমি কোন কথা শুনব না, অন্তত দুটো মাস বেড়িয়ে যেতে হবে তোমাকে আমার ওখানে। এই দুই মাস উৎসব ঘোষণা করব আমি। নাচ-গান, হৈ-হুল্লোড়, খেলা-ধুলা, নৌকা বাইচ, খাওয়া-দাওয়া—বান ডেকে যাবে পুরো এলাকা জুড়ে। চলো না আগে, বারো হাজার লোকের অনুরোধ কি করে ফেল

তুমি দেখি। আমার সব কথা শোনার পর ওরা তোমাকে ছেড়ে দেবে মনে করেছ?'

হাসল রানা।

'এমন কোন জায়গা আছে, যেখানে ল্যান্ড করলে শত্রুর চোখে পড়ব না?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আছে,' বলল প্যাপন মং লাই। 'আমার বাড়ির উঠানেই নামতে পারবে।'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল সোফিয়া। 'ভূতের মন্দিরের ওপারেই ওদের আস্তানা। টের পেয়ে যেতে পারে। চিনতে পারবে ওরা এই হেলি...'

'আরে রাখ, টের পেয়ে যাবে! এখন ভূতের কারবার চলছে ওখানে। ওদের সাধ্য আছে ওখানে উঠে দেখবে আমাদের? প্রাণে ভয় নেই?'

'ভূতের মন্দিরটা কি জিনিস?' প্রশ্ন করল রানা।

'আমাদের ওখানে খুবই প্রাচীন একটা মন্দির আছে,' বলল সোফিয়া। 'সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের মাথায়। ভেঙে-চুরে গেছে এখন। কেউ ওর ধার কাছ দিয়েও যায় না। অসংখ্য বিষধর সাপ আছে ওই মন্দিরের আশপাশের জঙ্গলে। পাহাড়টায় ওঠাও খুব বিপজ্জনক—বিরাট সব ফাটল সৃষ্টি হয়েছে পাহাড়ের গায়ে। লোকে বলে ভূত আছে ওই মন্দিরে, ছোটকাল থেকে শুনছি...'

সোফিয়ার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে জোরের সাথে বলল প্যাপন মং লাই, 'আছেই তো। মাঝে বহু বছর ছিল না, ইদানীং আবার ফিরে এসেছে। রাতের বেলায় নানান রঙের আলো দেখা যায়!'

মৃদু হাসল রানা। বলল, 'ওরেব্বাবা! ওই পাহাড় থেকে অন্তত তিন মাইল দূরে নামতে চাই আমি। সাঙ্ঘাতিক ভূতের ভয় আমার। দূরে কোথাও নামার ব্যবস্থা আছে?'

রানার ভয় দেখে হো হো করে হাসল সর্দার। বলল, 'পাহাড় থেকে নামে না ওই ভূত।'

'তবু।'

'ঠিক আছে, দূরেই নামা যাবে। কিন্তু হাঁটতে হবে বাবা। আমার জঙ্গলে মোটর গাড়ি চলে না।'

'হাঁটব। প্রথমেই সোজা যাব আমরা অস্ত্রগুলো যেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সেখানে।'

'অস্ত্র দিয়ে কি হবে?' প্রশ্ন করল সর্দার।

'প্রয়োজন হলে আত্মরক্ষা করতে হবে।'

'আচ্ছা, লাইটিক ককটেল কোন কাজ করল না কেন আমাদের উপর?' হঠাৎ প্রশ্ন করল সোফিয়া।

'বুঝতে পারোনি?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা।

'একদম না।'
'তাহলে ঢলে পড়ার ভান করলে কেন?'
'তোমার দেখাদেখি।'
হো হো করে হাসল রানা। বলল, 'ভাগ্যিস করেছিলে! নইলে গ্যাসেই মরণ হত।'
'ধরল না কেন ওষুধ?'
'তুমি যখন আমাকে উল্টো ওষুধটা দিয়েছিলে, আমি আশা করেছিলাম দুই মিনিটে কেটে যাবে লাইটিকের প্রভাব। কিন্তু কাটেনি। বরং আরও বেড়েছিল প্রভাবটা। পরের বার যখন ইঞ্জেকশন দেয়ার জন্যে ওষুধ নিচ্ছিল মিসেস গুপ্ত শিশি থেকে, লক্ষ করলাম, লেবেল ছাড়া শিশি থেকে নিচ্ছে সে ওষুধ।'
'তার মানে ওইটেই লাইটিক? আর যেটাতে লাইটিক লেখা ছিল সেটা?'
'সেটা ছিল লাইটিকের প্রভাব কাটাবার ওষুধ। উল্টোপাল্টা শিশিতে রেখেছিল সে ওষুধ ধোঁকা দেয়ার জন্যে। সেই ধোঁকায় তোমার মতই বোকা বনেছে ডক্টর হুয়াংও।'
কত অল্পের উপর দিয়ে বেঁচে গেছে বুঝতে পেরে চোখ বড় বড় করে চেয়ে রইল সোফিয়া রানার দিকে। কত সামান্য একটা ভুলের সুযোগে উ-সেনের খপ্পর থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে এসেছে ওদের এই দুর্ধর্ষ লোকটা ভাবতেও শিউরে উঠল সোফিয়া। আশ্চর্য মানুষ! যেমন সাহসী, তেমনি ধূর্ত! কম্পিউটারের গতি এর চিন্তায়। নিশ্চিন্তে নির্ভর করা যায় এর ওপর।

'তোমার মাকে কোথায় পেয়েছেন তোমার বাবা?' সময় কাটাবার জন্যে প্রশ্ন করল রানা।
'পেয়েছেন নয়, পেয়েছিলেন। মা মারা গেছে সাত বছর আগে। খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচার করতে এসেছিলেন উনি। প্রোমের মিশনারী চার্চের নান্ ছিলেন। কোন্ ফাঁকে বাবার চোখে পড়ে গিয়েছিলেন টের পাননি। মনে ধরে গিয়েছিল বাবার, তাই একদিন কথা নেই বার্তা নেই জোর করে তুলে নিয়ে এলেন মাকে। হুলস্থূল বেধে গেল। থানা-পুলিস, সাহেব-সুবো ছুটে এল, কিন্তু মাকে ছুটিয়ে নিয়ে যেতে পারল না। বেঁকে বসলেন উনি—যাবেন না। বাবার কাছে নারী-ধর্ম শিখে ফেলেছেন উনি তিনদিনেই, খ্রীষ্ট-ধর্মের কথা ভুলেই গেছেন বেমালুম।'

পিছনের একটা সীটে শুয়ে চোখ বন্ধ করে একমনে চুরুট টানছিল প্যাপন মং লাই, হঠাৎ তড়াক করে লাফিয়ে উঠে এগিয়ে এল।
'আত্মরক্ষার প্রয়োজন হবে ভাবছ কেন?' ভুরু কুঁচকে গেছে সর্দারের।
'প্রয়োজন হবেই তা বলিনি। তবে হতে পারে। সম্ভাবনা আছে। হয়তো এতক্ষণে ওয়্যারলেসে আমাদের পলায়নের খবর পেয়ে গেছে ওরা। হঠাৎ

আক্রমণ করে বসা বিচিত্র নয়। কারণ ওরা জানে আপনি নিজ এলাকায় পৌঁছে গেলে ভয়ানক বিপদের সম্মুখীন হবে ওরা। এখন আপনারা সশস্ত্র।'

চিন্তিত মুখে মাথা নাড়তে থাকল বৃদ্ধ। গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেছে। সোফিয়ার দিকে ফিরল রানা।

'সোফিয়া, তোমার একশো লোককে ঠিক কি নির্দেশ দিয়েছিলে তুমি বলো তো? ট্রেনিং-এর কথা বলে দিয়েছিলে?'

'বলেছি। পৌঁছোনোর সাথে সাথে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে বলেছি অস্ত্রগুলো, কোন্‌টা টিপলে কি হয়, সবাইকে শিখিয়ে দিতে বলেছি যতদূর সম্ভব এবং যত দ্রুত সম্ভব। এতক্ষণে মোটামুটি সবাই শিখে গেছে কিভাবে চালাতে হয় ওগুলো। তাছাড়া কিছু ট্রেনিং পাওয়া সোলজারও আছে আমাদের মধ্যে।'

'ভেরি গুড। ঘণ্টা দুয়েক ঠেকিয়ে রাখতে পারলেই যথেষ্ট।'

'একটা যুদ্ধ যে হবেই সে ব্যাপারে তোমাকে নিঃসন্দেহ মনে হচ্ছে, মাসুদ রানা?' সোজা রানার চোখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল প্যাপন মং লাই।

'সেজন্যেই তো চলেছি আমি,' বলল রানা। 'আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে মান্দালয়েই। ওখানকার আর্মি হেড-কোয়ার্টার থেকে ঢাকায় খবর পাঠিয়ে দিলেই চলত, গেরিলা ক্যাম্পে আমার যাওয়ার কোন প্রয়োজনই ছিল না। কিন্তু যে কাজের জন্যে এত কষ্ট করলাম, এত বিপদের ঝুঁকি নিলাম, বার কয়েক মরতে মরতে বেঁচে গেলাম, সেটার শেষ পর্বটা নিজের চোখে দেখার আগ্রহে চলেছি আমি আসলে। হেড অফিসে একটা খবর পাঠানো ছাড়া আর কোন কাজ নেই আমার।'

'বাবার প্রশ্নটা কিন্তু এড়িয়ে গেলে তুমি, রানা।' বলল সোফিয়া। 'বাবা জিজ্ঞেস করছিল, আমাদের উপজাতির ওপর আক্রমণ আসছে, এ ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত কিনা।'

'প্রায় নিশ্চিত।'

'কেন?'

'কারণ সর্দার পৌঁছবার আগেই যদি আক্রমণ করে, তাহলে বিনা বাধায় অস্ত্র দখল করতে পারবে ওরা। কিন্তু এর চেয়েও বড় কারণ হচ্ছে, স্থানীয় অধিবাসীদের কাবু করে ওরা ওঁৎ পেতে থাকবে আমার জন্যে। আমাকে যদি কোন ভাবে ঠেকাতে পারে, তাহলে কোন খবর পৌঁছবে না ঢাকায়, ওরাও নিরাপদে ট্রেনিং ক্যাম্প চালু রাখতে পারবে—সব খবর আমার সাথে সাথে মাটি চাপা পড়ে যাবে। কি মনে হয়? চেষ্টার ত্রুটি করবে ওরা?'

শিঙা বাজছে।

একটা দুটো নয়, সারাটা জঙ্গল জুড়ে বাজছে শিঙা। জংলীদের বিপদ-সঙ্কেত। প্রতি দুইশো গজ অন্তর অন্তর শিঙা ফুঁকছে একজন করে। গোটা অঞ্চলকে সাবধান করে দেয়া হচ্ছে।

একলাফে হেলিকপ্টার থেকে নেমেই চিৎকার করে উঠল প্যাপন মং লাই বিচিত্র স্বরে। গজ বিশেক দূরের একটা গাছ থেকে নেমে ছুটে এল একজন আদিবাসী। দশ হাত তফাতে দাঁড়িয়ে কুর্নিশ করল, তারপর ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল প্রিয় সর্দারকে।

ওর হাত থেকে শিঙাটা নিয়েই অন্য এক ভঙ্গিতে ফুঁ দিল সর্দার। সঙ্গে সঙ্গে আশপাশের তিন চারটে শিঙা থেমে গেল। নিশ্চিত হওয়ার জন্যে কান পেতেছে ওরা। সর্দার ছাড়া আর কারও যুদ্ধের আদেশ ঘোষণার অধিকার নেই। কে বাজাল যুদ্ধের শিঙা? তবে কি উপজাতির মহা সঙ্কটের সময় ফিরে এসেছে সর্দার? নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে ভরসা হচ্ছে না ওদের।

আবার ফুঁ দিল সর্দার শিঙায়।

এবার সেই একই সুরে বেজে উঠল আশপাশের চার পাঁচটা শিঙা। দুই মিনিটের মধ্যে পাল্টে গেল সবার সুর। যুদ্ধের শিঙা বাজছে এখন সারাটা অঞ্চল জুড়ে। সবাই বেরিয়ে পড়বে এখন যে যার অস্ত্র নিয়ে।

'এখন কি করবে?' প্রশ্ন করল প্যাপন মং লাই রানাকে। 'আমি তো যুদ্ধ করব। তুমি?'

'আমি চেষ্টা করব যাতে আপনাদের যুদ্ধ না করতে হয়।'

'সেটা কি রকম?'

ইতোমধ্যেই ষাট সত্তর জন সশস্ত্র যুবক ঘিরে ফেলেছে ওদের। সবার হাতেই চাইনিজ স্টেন বা এস.এল. আর.।

'বলছি,' বলল রানা। 'তার আগে এদের জিজ্ঞেস করে আমাকে জানান কেন শিঙা ফুঁকছে, ঠিক কোন পজিশনে আছে শত্রুপক্ষ।'

জানা গেল, উত্তর এবং দক্ষিণ দিকে শত্রুর তৎপরতা দেখা যাচ্ছে। দুই দিক থেকে এগোচ্ছে হাজার ছয়েক সৈন্য। পুরো দুই ব্রিগেড। যতদূর মনে হয় ঘিরে ফেলবার চেষ্টা করবে ওরা। তাই দেখে ওরা সবাইকে সাবধান করে দিয়ে যতদূর সম্ভব পুবে সরে যাওয়ার কথা ভাবছিল। কিন্তু সর্দারের শিঙা শুনে গ্যাঁট হয়ে বসে গেছে সবাই পজিশন নিয়ে।

রানা বুঝল, ট্রেইন্‌ড্‌ আর্মির হাতে অনর্থক মারা পড়বে লোকগুলো। সবাইকে থামিয়ে দিয়ে এক মিনিট চুপচাপ ভাবল সে। তারপর ফিরল সর্দারের দিকে।

'পুবদিকে কি আছে?'

'জঙ্গল। মাইল তিনেক পর ছোট্ট একটা নদী, তারপর আবার পাহাড় আর জঙ্গল।'

'আপনার সব লোককে পুবে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিন। ওরা যতই এগোবে, এরা ততই পিছিয়ে যাবে। সেইসাথে আসমানের দিকে অনর্গল গুলি চালাতে বলবেন।'

'যুদ্ধ করব না?' বিস্মিত দৃষ্টিতে চাইল সর্দার রানার দিকে।

'না। একেবারে সামনা সামনি পড়ে না গেলে যুদ্ধ করবার দরকার নেই।'

'তাহলে তো আমাদের ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে শেষ করে দেবে ওরা,' বলল সোফিয়া।

'অত সময় পাবে না। ইয়টে ছিল, এমন কেউ আছে এখানে?'

একজন যুবকের দিকে চেয়ে সোফিয়া বলল, 'আছে। কেন?'

'ওকে জিজ্ঞেস করো, এগারো নম্বর বাক্সে একটা ওয়্যারলেস সেট ছিল, সেটা কোথায়।'

খানিকক্ষণ কথা বলল সোফিয়া যুবকটির সাথে। ছেলেটির উত্তর দেয়ার ভাব ভঙ্গি পছন্দ হলো না রানার। এত লজ্জার কি আছে? হঠাৎ একটা আশঙ্কার কথা মনে আসতেই ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকের ভিতরটা। নষ্ট করে ফেলেনি তো যন্ত্রটা? সোফিয়া ফিরল রানার দিকে।

'ওটা কি ধরনের অস্ত্র পরীক্ষা করতে গিয়ে...'

'বুঝেছি,' বলল রানা। সর্দারের দিকে ফিরল। 'আমি চললাম, আপনাকে যা বলেছি তাই করবেন।' আঙুল তুলে পাতার ফাঁক দিয়ে পশ্চিম দিকে দেখাল, 'ওই যে আলো দেখা যাচ্ছে, ওটা ভূতের মন্দির না?'

'হ্যাঁ,' বলেই চমকে উঠল সর্দার। বিস্মিত দৃষ্টিতে ওদিকে চেয়ে বলল, 'আজকে রীতিমত পাগলামি শুরু করেছে প্রেতাত্মাগুলো। ভয়ানক কিছু ঘটবে আজ।'

'ঘটাতে চাইছে। কিন্তু ঘটবে না।'

রওনা হতে যাচ্ছিল রানা, খপ করে ওর হাত চেপে ধরল সর্দার।

'কোথায় যাচ্ছ?'

'ভূতের মন্দিরে।' জবাব দিল রানা। 'দেরি হয়ে গেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, মাসুদ রানা!' আরও শক্ত করে ধরল সে রানার হাতটা।

হাসল রানা। 'দুটো আলো দুই দিকে ঘুরছে না?'

'হ্যাঁ।' উত্তর দিল সর্দার।

'বাম দিকের আলোটা দক্ষিণ দিকের সৈন্যদের এগোতে বলছে, ডানদিকের আলো এগোতে বলছে উত্তর দিকের সৈন্যদের।' সর্দারের হাতটা ছাড়িয়ে দিল রানা। 'ভূত নেই ওখানে, আছে জনাকয়েক শয়তানের বাচ্চা।'

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হাঁ হয়ে গেল প্যাপন মং লাইয়ের মুখটা।

'তুমি উল্টো সিগন্যাল দিয়ে ওদের ফিরিয়ে নিতে চাও?'

'হ্যাঁ। বেশি কথা বলার সময় নেই এখন। জায়গাটা ঘিরে ফেলবার আগেই পৌঁছতে হবে আমাকে পাহাড়ের কাছে। বড় জোর পনেরো মিনিট হাতে আছে আমাদের। আপনার নির্দেশ দিয়ে দিন জলদি, আমি চললাম।'

দৌড়াতে শুরু করল রানা। পিছনে পায়ের শব্দ শুনে চেয়ে দেখল সোফিয়া আসছে পিছন পিছন। একজনের হাত থেকে একটা স্টেনগান ছিনিয়ে

নিয়ে ছুটতে শুরু করেছে সেও।

মাঝ পথে পৌঁছতেই ফায়ারিং শুরু হলো। উত্তর দিকের দলটা শুরু করল আগে, পরক্ষণেই শুরু করল দক্ষিণের দল। মন্দিরের আলোয় ফায়ারিং-এর সিগন্যাল।

টপ টপ ঘাম ঝরছে রানার কপাল থেকে দেড় মাইল দৌড়েই। আরও দেড় মাইল যেতে হবে যত দ্রুত সম্ভব। প্রাণপণে ছুটল সে। পিছনে ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাসের শব্দ পাচ্ছে সোফিয়ার। ঝোপ ঝাড় বাঁচিয়ে দৌড়াতে হচ্ছে ওদের এঁকেবেঁকে। পশ্চিম আকাশে একটুকরো ম্লান চাঁদের আবছা আলোই ওদের একমাত্র সম্বল। ফায়ারিং শুরু হবার পনেরো মিনিটের মধ্যে পৌঁছল ওরা পাহাড়ের পায়ের কাছে। কার্বোলিক অ্যাসিডের গন্ধ পেল রানা। বুঝতে পারল সাপ তাড়াবার জন্যে এই উৎকট গন্ধের আশ্রয় নিয়েছে ভৃতেরা। একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে জিরিয়ে নিল রানা খানিকক্ষণ, সেই সাথে জরিপ করে নিল এলাকাটা।

'তুমি এলে কেন, সোফিয়া?' প্রশ্ন করল রানা চাপা কণ্ঠে। 'বিপদ হতে পারে।'

'তুমি তো ইচ্ছে করলেই আমাদের বিপদের মুখে ফেলে হেলিকপ্টারে করে চলে যেতে পারতে তোমার ইয়টে—তুমি এলে কেন?'

'এসব কষ্টের কাজ করে অভ্যেস আছে আমার। তোমার তা নেই। এই মন্দির দখল করতে খুনোখুনির প্রয়োজন পড়তে পারে। আমাদের প্রাণ যাবে না এমন কোন গ্যারান্টি নেই। তুমি বরং এখানেই অপেক্ষা করো...'

'বাজে কথা রাখো। আমি যাচ্ছি তোমার সঙ্গে।' ঘাড় বাঁকিয়ে উত্তর দিল সোফিয়া। 'তুমি যদি হাজার কয়েক নিরপরাধ জংলী মানুষের জন্যে নিজের জীবন বিপন্ন করতে পারো, আমি পারব না কেন। ওরা তো আমার লোক।'

পাহাড় ফেটে গিয়ে মাঝে মাঝে গভীর গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এছাড়া কিছু মানুষের তৈরি গর্তও রয়েছে পাহাড়ের গায়ে। সযত্নে সে সব গর্ত পরিহার করে উঠছে ওরা উপর দিকে ধীরে ধীরে; অতি সাবধানে। মানুষের অস্তিত্ব টের পেয়েছে রানা কয়েকটা গর্তে, গোটা কয়েক অ্যান্টি এয়ার ক্রাফ্ট্ গানের মুখও দেখতে পেয়েছে।

নিচে থেকে তুমুল গুলিবর্ষণের শব্দ আসছে। উভয় পক্ষ থেকেই গুলি হচ্ছে। উপর থেকে জঙ্গলের ভিতর কি হচ্ছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। শুধু দু'একটা আকাশের দিকে ছোঁড়া গুলি টুপটাপ পড়ছে ওদের আশপাশে।

মাথাটা একটু তুলেই আবার নামিয়ে ফেলল রানা। দুজন সেন্ট্রি দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরের দরজায়। চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি বুলাচ্ছে। ছটফট করছে ওরা জঙ্গলের ভিতর কি হচ্ছে কিচ্ছু বুঝতে পারছে না বলে। কনুই দিয়ে গুঁতো দিল রানা সোফিয়ার পাঁজরে। ওপাশ দিয়ে ঘুরে মন্দিরের পিছনে উঠতে হবে।

দু'পাশ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা দুজন দুই সেন্ট্রির ঘাড়ের উপর।
কোন রকম ঝুঁকি নেয়ার উপায় নেই, দ্রুততাই এখন ওদের একমাত্র অস্ত্র, কাজেই প্রথম সুযোগেই মারণাঘাত হানল রানা। কড়াৎ করে ভেঙে গেল প্রহরীর ঘাড়ের পিছনে সেভন্‌থ ভার্টেব্রা। সোফিয়া মেরেছিল স্টেনগানের বাট দিয়ে। বাম পাশে নড়াচড়া টের পেয়েই ঝট করে পাশ ফিরেছিল প্রহরীটা। আঘাতটা মাথার একপাশে লেগে পিছলে গিয়ে কাঁধের উপর পড়ল। 'ইয়াল্লা' বলেই খপ করে ধরে ফেলল সে স্টেনগানটা। একলাফে পৌঁছে গেল রানা। বাম হাতের আঙুলগুলো সোজা রেখে কব্জি ও কনিষ্ঠ আঙুলের মাঝের মাংসল জায়গাটা দিয়ে মারল রানা লোকটার শ্বাস নালীর উপর। দরজার চৌকাঠে ঠুকে গেল লোকটার মাথা, স্টেনগান ছেড়ে হাতটা উঠে এল গলার কাছে, শ্বাস নিতে পারছে না, বিস্ফারিত হয়ে গেছে দুই চোখ, চৌকাঠের গায়ে হেঁচড়ে বসে পড়ল সে পা ভাঁজ হয়ে যেতেই।
'ক্যয়া হুয়া, আলাউদ্দিন?' হাঁক ছাড়ল কেউ মন্দিরের ভিতর থেকে।
কণ্ঠস্বর চিনতে পারল রানা। মেজর উলফাতের কণ্ঠ। সেন্ট্রির কোমর থেকে রিভলভারটা বের করে নিয়ে ঢুকে পড়ল রানা মন্দিরের ভিতর। পাশে সোফিয়া।
'মাসুদ রানা! তুম কাঁহাসে আ গিয়া?' চোখ কপালে উঠল মেজর উলফাতের। সেই ভাবেই ঢলে পড়ল সে দুই চোখের মাঝখানে আরেকটা চোখ তৈরি হয়ে যাওয়ায়।

আলোর সিগন্যাল উল্টো করে দিয়ে সোফিয়াকে বাইরে পাহারায় থাকতে বলে ওয়্যারলেস সেটের সামনে গিয়ে বসল রানা। ঢাকা পাওয়া গেল এক মিনিটের মধ্যেই। প্রথমেই অবস্থানটা দিল রানা—অক্ষাংশ বাইশ ডিগ্রি সাত মিনিট, দ্রাঘিমাংশ বিরানব্বই ডিগ্রি পঁয়ত্রিশ মিনিট। বার কয়েক রিপিট করল যাতে কারও কোন ভুল না হয়। তারপর দিল সংক্ষিপ্ত মেসেজ। তিন হাত দূরে বোমা ফাটলেও ততটা চমকাবে না মেজর জেনারেল রাহাত খান, যতটা চমকে উঠবে এই সংক্ষিপ্ত মেসেজ পেয়ে। হুলস্থূল পড়ে যাবে, দৌড়াদৌড়ি হুড়োহুড়ি পড়ে যাবে আগামী পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঢাকার একটি বিশেষ মহলে। মুচকি হেসে অফ করে দিল রানা ওয়্যারলেস সেট।

সিগন্যাল দিয়ে বার কয়েক সামনে এবং বার কয়েক পিছনে নিল রানা উত্তর দক্ষিণ উভয় দলের সৈন্যদের। ঘণ্টা খানেক পার করল এই ভাবেই। মাঝে মাঝে ফায়ারিং-এর নির্দেশ দেয়, মাঝে মাঝে থেমে যেতে বলে। কেন কি ঘটছে বুঝতে পারল না ওরা বেশ কিছুক্ষণ। এইবার দুই দলকে একত্রিত হওয়ার সঙ্কেত দিল রানা। একত্র হওয়ার পর বেশ খানিকটা হৈ-চৈ শোনা গেল নিচে থেকে।
বিশ মিনিট আগে টেলিফোন এসেছিল ক্যাম্প থেকে। কর্নেল আদিবের

রাগান্বিত কণ্ঠস্বর শোনা গিয়েছিল: 'ইয়ে কিয়া শুরু কার দিয়া তুম, উলফাত?' জবাব না দিয়ে রেখে দিয়েছিল রানা রিসিভার। কিছু একটা গোলমাল হয়েছে টের পেয়ে নিশ্চয়ই স্পেশাল মেসেঞ্জার পাঠিয়েছে কর্নেল আদিব দুই দলের কম্যান্ডিং অফিসারদের কাছে—এইজন্যেই এই গোলমাল।

বিপদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন রানা। ছোট হোক বড় হোক একটা দল যে ভূতের মন্দিরে ওঠার চেষ্টা করবে তাতে কোন সন্দেহই নেই। রানা আশা করছে আর পাঁচ দশ মিনিটের মধ্যে সাহায্য এসে হাজির হবে। যদি না আসে? যদি দেরি হয়?

দেরি হলো না।

ভোর হয়ে আসছে। তিনটে কোম্পানী তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে উঠতে শুরু করল পাহাড় বেয়ে।

মাঝামাঝি আসতেই গুলি করল রানা। ছয়শো সৈন্যের বিরুদ্ধে ওদের আছে মোট পঁচাত্তরটা গুলি, আর টেবিলের ড্রয়ারে খুঁজে পাওয়া গোটা চারেক হ্যান্ড গ্রেনেড। এছাড়া আছে তিনটে রিভলভারে সতেরোটা গুলি।

তিন কোম্পানীর উপর স্টেনগানের তিনটে ম্যাগাজিন খালি করল রানা।

শুয়ে পড়ল সবাই। চোখের সামনে জনা তিরিশেক সঙ্গীকে গুলি খেতে দেখে দমে গেছে ওরা। কিন্তু উপরে ওঠা বন্ধ হলো না এতে, গতি শ্লথ হলো মাত্র। খানিক বাদে তিনটে গ্রেনেড ফেলল রানা। পুব দিকের সৈন্যরা অনেক বেশি উঠে পড়েছে দেখে চতুর্থ গ্রেনেডটা ওদের উপরই ফেলে রিভলভার নিয়ে তৈরি হলো এবার।

একটা মর্টার শেল পড়ল মন্দিরের পাশে। প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হলো। কানে আঙুল দিয়ে শুয়ে রইল ওরা।

হঠাৎ পুবের জঙ্গল থেকে গুলি শুরু হলো আবার। মাঝে আধঘণ্টা চুপ হয়ে গিয়েছিল আরাকানী দল, এবার একেবারে কাছে থেকে গুলি শুরু করল। সৈন্যরা পিছিয়ে আসায় এগিয়ে এসেছে ওরা। শুধু যে এগিয়ে এসেছে তাই নয়, বেপরোয়া হয়ে আক্রমণ চালিয়েছে হঠাৎ। খুব সম্ভব রানা ও সোফিয়ার বিপদ টের পেয়েই। এক এক করে তিনটে রিভলভারের গুলি শেষ করল রানা। ঘায়েল হলো আরও দশ জন।

এমনি সময় প্লেন আসতে শুরু করল। মিনিট পাঁচেক শেলিং এবং মেশিনগানিং হাতেই ছত্রভঙ্গ হতে শুরু করল 'মুসলিম বাংলা' গেরিলা ফৌজ। সড়সড় করে নামতে শুরু করল ওরা পাহাড়ের গা বেয়ে। নিচে জমায়েত হওয়া সৈন্যরা ব্যারাকের দিকে ভাগছে এখন। আন্দাজের উপর নির্ভর করে ট্রেনিং ক্যাম্পের উপর ফেলা হলো দুটো হাজার পাউন্ডের বোমা।

গোলাগুলি বন্ধ করে হাঁ করে প্লেনের তামাশা দেখছে জংলীরা। ছত্রীসেনা নামা শুরু হতেই খুশিতে লাফালাফি আরম্ভ করল। আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেছে ওরা। প্যারাস্যুটের সাহায্যে নেমে আসছে হাজার হাজার ছত্রীসেনা।

উঠে দাঁড়াল রানা। খুশির চোটে রানার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল

সোফিয়া। দুই হাতে জড়িয়ে ধরে চুমো খাচ্ছে পাগলের মত।

ঢাকার সাথে কন্ট্যাক্ট করল আবার রানা।

পরিষ্কার ভেসে এল মেজর জেনারেল রাহাত খানের কণ্ঠস্বর।

'আর ইউ অল রাইট, রানা?'

'ইয়েস, স্যার।'

'এখন কি অবস্থা ওখানকার? সারেন্ডার করেছে?'

'সাদা ফ্ল্যাগ তুলেছে দেখতে পাচ্ছি, স্যার। প্যারাট্রুপার নেমে পড়েছে। আধঘণ্টার মধ্যেই চুকে যাবে সব কিছু।'

'গুড।' পাঁচ সেকেন্ড বিরতি। 'তুমি ইয়ট নিয়ে আসবে, না প্লেনে আসবে?'

সোফিয়ার চোখে মিনতি দেখতে পেল রানা।

'ইয়টে আসব। দিন দশেক দেরি হবে, স্যার।'

'কেন?'

'বিশ্রাম দরকার, স্যার। সর্দার অনেক করে ধরেছে...'

'অলরাইট, ছুটি গ্র্যান্টেড—রাখলাম,' খানিক ইতস্তত করে আবার বললেন বৃদ্ধ, 'কংগ্র্যাচুলেশন্স।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার।'

অফ করে দিল রানা ট্রান্সমিটারটা। ফিরল সোফিয়ার দিকে।

'এত কিছু করার পর শুধু একটা কংগ্র্যাচুলেশন?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল সোফিয়া।

'সাংঘাতিক কট্টর বুড়ো। ওর মুখে এইটুকু শুনতে পাওয়াই সাত কপালের ভাগ্যি।'

কাছে এগিয়ে এল সোফিয়া। হাসল দুজন চোখে চোখে। রক্ত সরে যাচ্ছে সোফিয়ার মুখ থেকে আসন্ন আনন্দের সুখ কল্পনায়। ঠোঁটে মদির হাসি।

ধীরে ধীরে নেমে এল রানার তৃষিত ঠোঁট।

***